নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলাম ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন

গবেষক

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ–২০১৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ শফিকুল ইসলাম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলাম ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম। ইতোপূর্বে এম.ফিল কিংবা পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলাম ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন "** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক কর্মের গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণাপূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ঢামা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণা কর্মটি **"নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলাম ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন"** সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি ।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার গবেষণাকর্মের প্রধান উৎসাহদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক অমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমানকে। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণি। আমি তাঁর দীর্ঘ হায়াত-ই-তায়্যিবাহ্ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় আবব্বা জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার মাতুবব্বর ও পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা জনাবা সাকীনাহ বেগম, শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাওলানা মোঃ ইসমাঈল হোসেন ও শাশুরী জনাবা খাদীজা বেগম, বড় ভাই মাওলানা মোঃ খলীলুর রহমান, ছোট ভাই জাকারিয়া, নাসীর ও আঃ ছালাম, স্ত্রী আফীফা বেগমসহ পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের প্রতি। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাদের জুড়ি নেই। আমার জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও স্ত্রী তাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন আমার গবেষণাকর্মের স্বার্থে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার গবেষণা কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অনেকের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে জামালপুর মালঞ্চ আল-আমিন জমিরিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ খান, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা-মোরেলগঞ্জ বাগেরহাট এর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও শিক্ষকবৃন্দ,মোরেলগঞ্জ লতিফিয়া ফাযিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার গবেষণার কাজ চালাতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার হতে তথ্য, উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করেছি তন্মোধ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ও আমতলী মাদ্রাসার আলহাজ্ব এম. এ .খালেক কুতুবখানা অন্যতম। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে “পাদটীকা” উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। ঐসকল লেখকের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার এই অভিসন্দর্ভের সফল সমাপ্তির জন্য আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দেয়া ছুটির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত পর্বে যারা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আবুল বাসার, মাওলানা আঃ হামীদ এবং অক্ষর বিন্যাসে **Cambrian School & College (IT)** বিভাগের কন্টেন্ট ডেভেলপার মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া এবং আব্দুল হাকীম কল্যাণ ট্রাষ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক ডিপ্লোমা-ইন-সায়েন্স কম্পিউটার অপারেটর মুহাম্মাদ আল-আমীন অন্যতম। তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শব্দ সংকেত

আ.	=	অরবী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আব্দুল/আবুল
ইং	=	ইংরেজী
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃ.পূ	=	খৃষ্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর (পিএইচ.ডি)
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন.পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/ পূর্বের উক্তি
বাং	=	বাংলা
মাও.	=	মাওলানা
মৃ	=	মৃত, মৃত্যু
রহ.	=	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রেজি.	=	রেজিষ্টার্ড
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
স./সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	=	হিজরী
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
বি.দ্র.	=	বিস্তারিত/ বিশেষ দ্রষ্টব্য
লিঃ	=	লিমিটেড
A.H	=	After Hijrah (wnRix mb)
A.D	=	Anno Dommini
P.	=	Page.
Op.cit	=	Open Cito.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, From the same source.
Vol	=	Volume

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ সত্তা হিসেবে মানুষকে সামাজিক রীতি-নীতি,প্রথা,আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। এসব মেনে চলার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ,সম্প্রীতি,সৌহার্দ্য,বন্ধুত্ব এমনকি স্বার্থও রক্ষা পায়। এ মেনে চলা যেমন সামাজিক তেমন মানুষের প্রকৃতিগতও। মানুষ তার অন্তর তাড়না ও তাগিদে অন্য মানুষের সাথে মিলিত হয়,বন্ধুত্ব স্থাপন করে,সামাজিকতা রক্ষা করে, প্রতিবেশির সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখে। এজন্য সে একটা অন্তর্গত বাধ্যবাধকতাও অনুভব করে। তার মনে প্রশ্ন জাগে অন্যের সাথে তার আচরণ কেমন হবে, কী তার করা উচিৎ হবে, কী উচিৎ হবে না, কোন্ কাজে মঙ্গল হবে, কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর, কোনটা বাঞ্ছনীয় আর কোনটা অবাঞ্ছনীয়? এসবই নৈতিকতার প্রশ্ন। এসব বিষয়কে এড়িয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করতে পারে না। তাই সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস করার জন্য মানুষকে নৈতিকতাও অবলম্বন করে চলতে হয়।

কিন্তু মানুষ সবসময় নৈতিকতা মেনে চলে না। সে স্বেচ্ছায় নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে, নিয়ম-নীতিহীন ও দুষ্কর্মের প্রতি ধাবিত হয়। এটা যে সে অজ্ঞাতসারে করে তা নয়। বরং সে সজ্ঞানেই অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়; সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থকে পদদলিত করে। স্বীয় স্বার্থের কাছে সে অন্ধ হয়ে যায়। সমুদয় মূল্যবোধ ও বিবেকের বাণীকে সে জলাঞ্জলি দেয় নির্দ্বিধায়। সে হয়ে যায় তার কুপ্রবৃত্তির পুতুল। তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এ অবস্থায় কুপ্রবৃত্তির হুকুম তামিল করাই তার অন্যতম কাজ হয়ে যায়। কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি তার সুকুমারবৃত্তি,নীতিবোধ,ঔচিত্য-চেতনা,মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তা, দেশপ্রেম, মানবতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা, আদর্শ ও ত্যাগের মহিমা প্রভৃতি সদ্গুণাবলিকে ধক্ষংস করে দেয়। তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসকে বিকৃত করে দেয়। এও তার প্রকৃতিগত। মানব প্রকৃতিতে দু'ধরণের প্রবণতা রয়েছে: সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, হিতকর-ক্ষতিকর, সুন্দর-কুৎসিৎ, ক্ষমা-প্রতিশোধ, দয়া-নিষ্ঠুরতা, রাগ-বিরাগ, পরার্থতা বা স্বার্থপরতা–এ দ্বিবিধ উপাদানই মানব প্রকৃতিতে রয়েছে। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ও নৈতিক সংস্কারের জন্য মানব প্রকৃতির এ দ্বিবিধ উপাদানকে বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশে এমন কোন অঙ্গন নেই যা কম-বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত প্রবল। রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন, ব্যবসায়সহ সকল পেশায় নৈতিকতা ও নীতিবোধের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিও যেন অনুপস্থিত। এখানে চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকহিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে। বৈষয়িক উন্নতি সাধন বা বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সে উন্নতি বা উন্নতির চেষ্টা যদি হয় দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, ভাওতাবাজি, ঠগবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তবে তা ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত। আহার-বিহার ও বাসস্থানের চাকচিক্য বৃদ্ধি এবং বিলাসী জীবনভোগের জন্যে অন্যের অধিকার হরণ, ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ-নিপীড়ন, মিথ্যাভাষণ, সদগুণাবলির বিসর্জন মানুষকে কতটা অধঃপতিত করে তা উপলব্ধিও আজ মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে মানুষ আজ পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কে কত পশুবৃত্তি অর্জন করতে পারে, কে কত

হিংস্র হতে পারে, কে কত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কে কত বেশি পারঙ্গম হতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। মানুষ আজ বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্মম। দয়া-মায়া, প্রেম-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, ন্যায্যতা, সততা, দক্ষতা, নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা-মূল্যবোধ ইত্যাদি তার নিকট অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। পরিণামে আমদের সমাজে দুর্নীতি, দুষ্কর্ম, বলপ্রয়োগ, অপকৌশল ইত্যাদির চর্চা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান মিথ্যাচার আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের এক বড় প্রমাণ। মিথ্যা বলা, মিথ্যার চর্চা করা একটি খারাপ গুণ, একটি বদ কাজ একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনবান কি গরীব, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কি নিম্নতম কর্মচারী, শিক্ষক কি ছাত্র প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে মিথ্যার অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের শিক্ষা, উচ্চপদ, অর্থ-সম্পদ এই নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য আচরণটি বর্জন করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে না। এই মিথ্যাচারিতার কারণে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রচণ্ড অভাব আমাদের সমাজে। এখানে জনগণ রাজনৈতিক নেতাকে, রোগী তার চিকিৎসককে, ক্রেতা তার বিক্রেতাকে, অধীনস্ত ব্যক্তি তার বসকে, বা বস তার অধীনস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে না, পারে না একে অপরের ব্যাপারে নিঃশংসয় হতে। সততা এবং ন্যায়পরায়ণতার অভাবেই এমন চিত্র আমাদের সমাজে বিরাজ করছে।

নিঃসন্দেহে এ অবস্থা আমাদের দেশ ও জাতির জঘন্য অধঃপতন নির্দেশ করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশ ও জাতি আরো পশ্চাদপদতায় নিপতিত হবে। আমাদের দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরো পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই যত দ্রুত সম্ভব দেশ ও জাতিকে নৈতিক পদস্খলনের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে। এ জন্য সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে মানুষের মন-মানস বিকৃত হয়ে যায়। মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলে। তরুণ ও সম্ভাবনাময় প্রজন্মের মেধা ও মননে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ সমাজে নবপ্রজন্মের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা, চেতনা, চরিত্র, সংস্কৃতি স্বাভাবিক পন্থায় বিকশিত হয় না। ফলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যতা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও দূরদর্শিতায় যেমন অপূর্ণতা দৃষ্ট হয় তেমনি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবকল্যাণ প্রভৃতিতেও ঐকান্তিকতাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় প্রকটভাবে। অনুরূপ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ যে জনশক্তির জন্ম দেয় সে জনশক্তি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত জীবনে দুষ্কৃতি ও অপরাধকে প্রসারিত করে অবিরাম গতিতে।

আজকের বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি-দুষ্কৃতির যে সয়লাব তা এই বিকারগ্রস্ত জনশক্তির প্রতিনিয়ত অন্যায়-অপকর্মের বাঁধাহীন চর্চার ফসল। অন্যায়কারী তার কর্মটি যে অন্যায় তা জেনেই করে। এর পেছনে হয়তো তার কোন হীনস্বার্থ হাসিলের প্রয়াস থাকে। নৈতিক শক্তি ও সাহসের অপর্যাপ্ততা, অনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দুষ্কৃতিকারীকে অপরাধ ও অন্যায় করতে সাহস যোগায়। এভাবে অপরাধ, অপকর্ম নির্বিঘ্নে চলতে থাকার কারণে বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। এ অবক্ষয়ের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা নিরসন করা এবং সত্য সুন্দর শুভ তথা নৈতিকতা ও আদর্শের চর্চা করা।

আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি-দুষ্কৃতির যে বিস্তার তার মূল বীজ মানুষের হৃদয় ও মানসিকতায় গ্রথিত। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি মানুষের চিন্তা-চেতনা, মন ও মগজকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পশ্চাতে আত্মসুখ ও স্বার্থবাদিতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরসুখ বা সর্বসুখ

তার নিকট অর্থহীন। কেউ যদি স্বীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে পরসুখ নিশ্চিত করে সে তো খুবই উত্তম। আবার কেউ নিজের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত সুখ বিসর্জন দেয় নাই কিন্তু পরসুখ, স্বার্থ ও অধিকারের ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে নাই সেও উত্তম। কিন্তু কেউ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যদি অপরের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে, অন্যে সাথে মিথ্যা, প্রতারণা, ভাওতা, ফাঁকি ও কূটকৌশল অবলম্বন করে তাহলে তা হবে নিকৃষ্টতম কাজ। এই নিকৃষ্টতম কাজ এবং এই কাজের মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুব বেশি। অফিস আদালতের চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী-বণিক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকি গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এই নিকৃষ্টতমের সংখ্যা বিপুল। এরা নিজেদের অজান্তেই হয়তো পাশবিকতার চর্চায় প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে বেড়াচ্ছে। মমত্ব, বুদ্ধি-বিবেক এরা হারিয়ে ফেলেছে। শুভবোধ, শুভদৃষ্টি ও হৃদয়ানুভূতি এদের বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এরা পশুতুল্য। আল কুরআনে এমন প্রকৃতির মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুরআন বলছে,তাদের অন্তর রয়েছে, তারা তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তারা তার দ্বারা দেখেনা, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।

এই নিকৃষ্টতর মানুষদেরকে আবার মনুষ্যত্বের স্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই উপলব্ধিতে আবার তাকে বলীয়ান হতে হবে যে, আমি মানুষ। দর্শন, শ্রবণ, বিচার-বুদ্ধি, হৃদয়াবৃত্তি প্রভৃতিতে অন্য যে কোন প্রাণির চেয়ে আমার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এবং এ স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই উন্নততম। সর্বোপরি, এই নিকৃষ্টতম মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। তার বিবেকই হবে দুর্নীতি-দুষ্কর্ম নিরসনের মোক্ষম হাতিয়ার।

ইসলামী নীতিবিদ্যা কোন বিশেষ কালের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ইহা ইসলামী জীবনব্যবস্থারই একটি যুক্তিসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত। ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম হিসেবে সর্বকালীন উপযোগী জীবনব্যবস্থা। যেহেতু ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের স্বভাবধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে এটা যে কোন যুগের উপযোগী এবং জীবনের যেকোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের স্বাভাবিক ধর্ম। এই সর্বকালীন জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম থেকে অনুসৃত নীতিবিদ্যাও তাই সর্বকালীন। নীতিবিদ্যার কাজ হলো নৈতিকতার প্রকৃতি, মানদন্ড এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে পর্যালোচনা করা এবং এ সম্পর্কে গবেষণা করা। অন্যদিকে নীতিশিক্ষার মূল কাজ হলো নৈতিক চরিত্র গঠন করা এবং নৈতিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামের পরিধিভুক্ত। এজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আজ তোমাদের ধর্মব্যবস্থা সর্বাঙ্গ সুন্দর ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।” ইসলামের মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। “আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই।” এটাই হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। এই সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতিত কেউ মানুষের উপরে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। অতএব, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর সামনে মানুষের মাথা নত করার দরকার নেই। মুসলমান একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আমরা অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জলপথে। আর তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপরে তাদের বিশেষ

মর্যাদা দিয়েছি।" সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতপর আমি ইহাকে নীচাশয়দের মধ্যে নীচ করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়, সেখানে থাকবে শুধু সুখ আর সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা–যা সমাজকর্মেরও লক্ষ্য। ইসলাম মানবকল্যাণে বিশ্বাসী বিধায় অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মানব সেবাকে এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল কাজের মধ্যে সমাজসেবা শ্রেষ্ঠ কাজ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার ওপরে ছেড়ে দেয়নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায় বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে। ইসলামের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে পেশাদার সমাজকর্মের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। বস্তুত, ইসলামের জীবন দর্শন সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

যেহেতু একদিনে যেমন নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়নি তেমনি আকস্মিকভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। এ সংকট উত্তরণের জন্য দীর্ঘয়োদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,অন্ধকারের পরে আলো, অবক্ষয়ের পরে উত্তরণ,অন্ধত্ব-কুসংস্কারের পরে রেনেসাঁ বা জাগরণ ঘটেছে বারংবার। এ হিসেবে আমাদের অবক্ষয়ক্লিষ্ট দেশ ও জাতি নৈতিক প্রগতি ও উত্তরণের পথে ধাবিত হবে এটা আশা করা যায়। তবে এ উত্তরণ এমনিতেই হবে না। এ জন্য চেষ্টা তদবীর ও প্রয়াসের প্রয়োজন। দুর্নীতি-দুস্কৃতির পুরাতন দ্বার বন্ধ করে দিতে হবে এবং নতুন দ্বারের যেন উন্মোচন না ঘটে তাও কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। ইসলামী জীবন বিধানে প্রতিটি মানুষকে তাকওয়া তথা অল্লাহর শাস্তির ভয় সদা অন্তকরণে জাগ্রত রাখা ,পরকালী জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করা,ক্ষণস্থায়ী এ জগতে তার অবস্থান শুধু পরীক্ষা করে দেখা হবে যে কে কর্মে উত্তম ইত্যাদির শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব চর্চারও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর এ ধর্মবোধের প্রকৃত ভিত্তিই হলো নৈতিকতা। এজন্যে ইসলামে নৈতিকতার গুরত্ব ও প্রাধান্য বেশি। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষের নৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ও শোচনীয় ছিল। মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার, রাহাজানি, লুটতরাজ, জুলুম, সীমালঙ্ঘন, অন্যায়-অবিচার ও সমাজ গর্হিত অপরাধ ইত্যাদির চরম নৈতিক অধঃপতন বিরাজ করছিল। মহান আল্লাহ্ এ মানবজাতিকে নিশ্চিত ধক্ষংসের কবল হতে রক্ষা করার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করে ঘোষণা করেন, "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ রয়েছে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ মালয়েশিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। মালয়েশিয়ায় নৈতিক তথা ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুপথে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই আমাদের দেশে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পদক্ষেপ সফল হবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু কিভাবে সফল হওয়া যায় সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে বক্ষমান অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে–ইসলাম, নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, ইসলামে মানব মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্ব, ইবাদতের ধারণা এবং সৃষ্টিসেবা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা , নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু, নীতিবিদ্যার শ্রেণিবিভাগ, ইসলামী নীতিবিদ্যার স্বরূপ, ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস,
ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, ইসলামী নীতিবিদ্যা ও আধুনিক নীতিবিদ্যার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব তুলে ধরতে গিয়ে ইসলাম ও মানবজীবন, ইসলামী সমাজব্যবস্থা,মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের পার্থক্য, নৈতিক মুল্যবোধের গুরুত্ব , ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র, মন মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র এবং ইসলামী নৈতিকতার কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে- ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব পর্যালোচনা করতে গিয়েইসলামী নীতিবিদ্যার গতিশীলতা, নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইসলাম ও সামাজিক মূল্যবোধ, মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টন, সামগ্রিক জীবনবোধ, সাম্য ও গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- নৈতিক সংকটের ধারণা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ব্যাপ্তি ও কারণ তুলে ধরতে গিয়ে নৈতিক সমস্যা ও সংকট, মানবাচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, কতিপয় নৈতিক সমস্যা বা সংকট, (ক) দারিদ্র্য, (খ) যুদ্ধ, (গ) ন্যায়পরতা, (ঘ) সাম্য, (ঙ) আত্মহত্যা, (চ) শ্রেণী ও বর্ণ দ্বন্দ্ব, (ছ) পরিবার পরিকল্পনা, বাংলাদেশে নৈতিক সংকটের বিকাশ ও কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- বাংলাদেশে নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগনীতি আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি, যৌতুক প্রথা, খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল, ব্যভিচার ও যৌনতা, পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু ফ্লিম, ইভটিজিং, এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন, শিশু অপরাধ ও ইসলাম, দুর্নাম,গীবত ও চোগলখুরি, বেকারত্ব, আত্মহত্যা, সন্ত্রাস ,চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলাম ও মাদকাসক্তি নিরসনে ইসলামের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জী নামে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা উপস্থাপন করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র
অঙ্গীকারনামা
কৃতজ্ঞতাস্বীকার
শব্দসংকেত
ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম, নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্য

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা........০২
ইসলামে মানব মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্ব........০৭
ইবাদতের ধারণা........১৩
সৃষ্টিসেবা ও ইসলাম........১৬
ইসলামী নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্য........১৮
নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা ১৯
নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু........২৩
নীতিবিদ্যার শ্রেণিবিভাগ........২৫
ইসলামী নীতিবিদ্যার স্বরূপ........২৬
ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস........৩০
ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়........৩৫
ইসলামী নীতিবিদ্যা ও আধুনিক নীতিবিদ্যা........৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব

ইসলাম ও মানবজীবন........৪২
ইসলামী সমাজব্যবস্থা ৪৫
মূল্যবোধ ৪৭
নৈতিক মূল্যবোধ ৪৯
নৈতিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য ৫০
নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের পার্থক্য ৫১
নৈতিক মুল্যবোধের গুরুত্ব ৫২
ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র........৫৩
মন মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র ৫৩
ইসলামী নৈতিকতার কতিপয় দিক........৫৪

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব

ইসলামী নীতিবিদ্যার গতিশীলতা ৬৩
নৈতিক মূল্যবোধ..৬৪
নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ..৬৪
ইসলাম ও সামাজিক মূল্যবোধ..৬৭
মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি..৬৮
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ৬৯
সকলের জন্য সমান সুযোগ..৭০
সামাজিক দায়িত্ব..৭১
সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন..৭৩
সামগ্রিক জীবনবোধ..৭৪
সাম্য ও গণতন্ত্র..৭৪
সামাজিক ন্যায়বিচার..৭৭

চতুর্থ অধ্যায়
নৈতিক সংকটের ধারণা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ব্যাপ্তি ও কারণ

নৈতিক সমস্যা ও সংকট..৮০
মানবাচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি..৮৩
কতিপয় নৈতিক সমস্যা বা সংকট..৮৪
(ক) দারিদ্র্য..৮৪
(খ) যুদ্ধ..৮৬
(গ) ন্যায়পরতা..৮৮
(ঘ) সাম্য..৮৯
(ঙ) আত্মহত্যা..৯১
(চ) শ্রেণী ও বর্ণ দ্বন্দ্ব..৯৩
(ছ) পরিবার পরিকল্পনা..৯৫
বাংলাদেশে নৈতিক সংকটের বিকাশ ও কারণ..৯৬

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগনীতি

বাংলাদেশের নৈতিক সংকট.. ১০৯
নৈতিক সংকট বা ব্যাধির কয়েকটি দিক ১১০
১. দুর্নীতি ১১১
২. যৌতুক প্রথা..১২১
৩. খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল ১৩৭
৪.ব্যভিচার ও যৌনতা ১৫০

৫. পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু ফ্লিম......১৭১
৬. ইভটিজিং ১৯২
৭. এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন......২০১
৮.শিশু অপরাধ ও ইসলাম......২১৮
৯.দুর্নাম,গীবত ও চোগলখুরি ২৩২
১০. বেকারত......২৩৯
১১.আত্মহত্যা......২৪৫
১২.সন্ত্রাস ২৫০
১৩.চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলাম......২৬৮
১৪. নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা ২৭৮
১৪. মাদকাসক্তি......২৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার......৩০৯-৩৩১

গ্রন্থপঞ্জী ৩৩২-৩৪০

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম, নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্য

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা:

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম।"[১] মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহম্মদ (স.) এর মাধ্যমে যে জীবনবিধান অনুমোদন করেছেন তা-ই ইসলাম। "আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন" এবং "অন্য কোন দীন বা জীবনবিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"[২] মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ধারণা অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন। কিন্তু যাবতীয় কর্মকান্ডের পথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এই শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পারলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (স.) মানব জাতির জন্য এই ইসলাম প্রচার করেছেন। সর্বপেক্ষা জ্ঞানী আল্লাহ জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের মঙ্গলে সর্বকালের জন্য কোন বিধান হবে পরম কল্যাণময়। তিনি আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[৩] "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনকে।"[৪] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ এ বিশ্বজগৎকে সৃজন করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পর যুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল । আল্লাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সে জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৫:৩
২. আল-কুরআন, ৩:১৯
৩. আল-কুরআন, ৪:১৭ এবং ৪:১০৫
৪. আল-কুরআন, ১৬:৯০
৫. আল-কুরআন, ৩০:৩০

'ইসলাম-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি; সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হলো ইসলাম।[৬] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে সাম্যনীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ ও মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হলো মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে। "হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে অত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়,তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নাই ও তারা দুঃখিত হবে না।"[৭]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা।এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য দ্'টি-আল্লাহর একত্ব ও মহানবী (স.)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান। অর্থাৎ, মহানবী (স.)-এর তরীকায় আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান। "[৮]

মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ:) ছিলেন এ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নয়, হযরত আদম (আ:)-এর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শেষ প্রচারক এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ -ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি। এর নাম হয়েছে ইসলাম।

হযরত আদম (আ:)-এর পর যত নবী -রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। এ -প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যাহা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[৯]

---

৬. আল-কুরআন, ২ : ৩১
৭. আল-কুরআন, ২ : ১১২
৮. কে. আলী মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯, পৃ. ১
৯. আল কুরআন, ২ : ১৩৬

মুসলমানগণ শুধু তাই শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলদের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে।" মুসলমানমত্রই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এই মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে; মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তা-ই ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[১০]

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো। মানুষকে সবচেয়ে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা।[১১] প্রকৃতির সব কিছুর মতো মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হলো ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।[১২] যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। আল্লাহ বলেছেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি-স্থালে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি,তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর অনেককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[১২] এজন্যই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়।[১৩]

সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে অন্য কারো ইবাদত করবে না। আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[১৪] এভাবেই আল্লাহ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

---

১০. কে. আলী মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯, পৃ. ৫

১১. আল-কুরআন, ১:৫

১২. আল-কুরআন, ১৭:৭০

১৩. আল-কুরআন, ২:৩০

১৪. আল-কুরআন, ৪:৪৮

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য মানুষের শান্তি স্থাপন। ইসলাম শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে। যার মূলমন্ত্র হলো মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এই মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় । শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়। যারা যুদ্ধক্ষম নয় তাদের শস্য ও সম্পদ ধক্ষংস করা, তাদের ঘর - মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ । বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না । 'যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[১৫] "যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে।"[১৬] আঘাত করা যাবে না। "উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়।"[১৭] যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।"[১৮]

পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এ সকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।

সুতরাং ইসলাম যেমন একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে সৃষ্টজগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সজ্ঞায়িত করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের কোন বিভাজন নেই বরং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী- রাসূলের মাধ্যমে ঐশী বানী এলেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ জীবন বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।[১৯] মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ-কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয়নি। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্থ করেছে।

সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখন্ডতা,পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (স.) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবেই ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।

---

১৫. আল-কুরআন, ৮:৫৮
১৬. আল-কুরআন, ৯:৬
১৭. আল-কুরআন, ৮:৭২
১৮. আল-কুরআন, ৭৬:৮
১৯. মুজিবুর রহমান, "ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ- সৌদিআরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ১০৮

ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন । তাওহীদভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনো অধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলামই জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলাম শুধু সাধু-পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনীষীদের কথাই বলে না,বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে সাধারণ মানুষকেও নিয়ে যাদের জীবন আলোচিত হয় পাপ-পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে। বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাহিরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের অন্তর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে সম্পর্কে অবহিত।[২০] ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যে কোন যুগের উপযোগী, জীবনের যেকোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। সৈয়দ আমির আলী বলেছেন, “সর্বকালের ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিসমূহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সাথে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, মনুষ্য হৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি এসব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী। তিনি আরো বলেছেন, “ইসলাম শুধুমাত্র একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সার্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।”[২১] গিবের ভাষায়, বাস্তবিক ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থ অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী, এটা একটা পরিপূর্ণ সভ্যতা। ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তম সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।”[২২]

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এতে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশের কোন অবকাশ নাই। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, “হে মুমিনগণ যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ,আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয় তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিনামে প্রকৃষ্টতর।”[২৩]

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।”[২৪] যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মিমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়।

---

২০. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২৫

২১. Sayed Amir Ali, The spirit of Islam, Delhi-1947, P. 175

২২. উদ্বৃত: রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুঁঠির, বগুড়া, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১০

২৩. আল-কুরআন, ৪:৫৯

২৪. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬

আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”[২৫] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, আংশিক বর্জন করা এবং মধ্যপথ ধরে চলাও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী একজন কাফিরের কাজ বলে বিবেচিত এবং তার জন্য অপমানকর শাস্তির বিধান রয়েছে।”[২৬] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার শামিল বলে চিহ্নি করা হয়েছে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে-তবে কি তোমরা কিতাবের অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অনবিহিত নন।”[২৭]

ইসলামে মানব মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বঃ

“আমি তো আদম সন্তানকে মর্যদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।”[২৮]

মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় লাভ করে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দেখা যাবে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত। সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের সেবায় নিতান্ত ভৃত্যের মত নিয়োজিত রয়েছে। আল-কুরআনের বহু স্থানে বা আয়াতে মানব জাতিকে তার উচ্চ মর্যদা সম্পর্কে সচেতন করে সেরা সৃষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহক্ষান জানানো হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “তোমরা কি দেখনা আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।”[২৯]

বিশ্বলোকের বিশালতার তুলনায় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। বিশ্বলোকের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষই তার প্রাণ ও আত্মা এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক দিয়ে এক বিরাট ও বিশাল অসীম ও মহান সত্তা। মানুষ বলতে মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত সত্তাই বোঝায়। কেবল দেহটাই মানুষ নয়।” মানুষ এক মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। “আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।”

এটাই হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বর সবচেয়ে বড় সনদ। মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মান যেমন আল্লাহর নিকট,তেমনি তা বিশ্বলোকের সবকিছুর উপর। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে এক বিশেষ উন্নতমানে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে রূপ,আকার-আকৃতি গঠন প্রকৃতিও দিয়েছেন সবকিছু থেকে ভিন্নতর; সব কিছুর তুলনায় উন্নত ও উত্তম। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই তার “রূহ” তার দেহ সত্তায় ফুঁকে দিয়েছেন।

---

২৫. আল-কুরআন, ২:২০৮
২৬. আল-কুরআন, ৪:১৫০ – ৫১
২৭. আল-কুরআন, ২:৮৫
২৮. আল-কুরআন, ১৭:৭০
২৯. আল-কুরআন, ৩১:২০

আল্লাহ তা'য়ালর একনিষ্ঠ কর্মচারী ফিরিশতাদের দ্বারা সিজদাও করিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে যেমন দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি,তেমনি দিয়েছেন জ্ঞান-বিদ্যা-বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার শক্তি। এই মানুষ হলো সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকুলের গৌরবের অমূল্য অতুলনীয় একমাত্র ধন। এ-দুনিয়ার সবকিছু যা আছে ঊর্ধর্ক্ষলোকে, যা আছে ভুতলে, সবকিছুই মানুষের অধীন, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ সবকিছুকে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুকুল ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন। আর দৃশ্য-অদৃশ্য যত নিয়ামত,মানুষের জন্য কল্যাণকর যা কিছু সবই বিপুলভাবে তাকে দান করেছেন। সবকিছুই তার জন্য অনুগত ও অনুকুল।"[৩০]

আর সে নিজে কার জন্য? তার সমগ্র জবীন ও সত্তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! আমি তো তোমাকে কেবলমাত্র আমার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছুই সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। তোমার উপর আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত তা তুমি যেন কখনও ভুলে না যাও। যেসব জিনিস আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি, তাতে তুমি যেন এতটা মনোনিবেশ না করে বস, যাতে তোমাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার কথা ভুলে যেত পার। আমি তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। এটাকে তুমি খেলা মনে করো না। আমি তো তোমার রিযিক, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব তুমি হতাশায় ভারাক্রান্ত হবে না। হে মানুষ! তুমি আমাকে পেতে চাইবে,তবে তুমি আমাকে পাবে। আর যদি তুমি আমাকে পেয়েই যাও,তবে তুমি সবকিছুই পেয়ে গেলে, কিছুই অভাব বা অপূর্ণতা থাকবে না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে হারিয়ে ফেল, তাহলে তুমি হবে সর্বহারা। আমি যেন হই তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"[৩১]

একজন মুসলিম জানে যে, মৃত মানুষের শেষ পরিনতি নয়। মৃত্যুর পর আর একটি জগৎ আছে। মৃত্যু মানুষের অনন্ত যাত্রার একটি স্তর মাত্র। এ মহা যাত্রা হবে অনন্তকালের অসীমতার পানে। সেখানে তাকে সংবর্ধনা জানানো হবে এই বলে "যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং উহার দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।"[৩২]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার তুলনা পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আল-কুরআনের বহু আয়াতে মানুষের এই উচ্চমর্যদার কথা বলা হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) নবী করীম (স.)-এর নিকট প্রথম যে প্রত্যাদেশ বাণী নিয়ে আসেন সেখানে শুধু মানুষের মর্যাদার কথাই নয়, মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের কথাও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

৩০. মুহাম্মদ আবদুল রহীম, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, খায়রুল প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৮২

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. আল-কুরআন, ৩৯:৭৩

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে,যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন , শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা তারা জানতো না।"[৩৩]

বহু আয়াতে আল্লাহর কাছে মানুষের নৈকট্য ও মানুষের কাছে আল্লাহর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে,আমি তো নিকটেই। আহক্ষানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহক্ষানে সাড়া দেই।"[৩৪] "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।"[৩৫]

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি (আল্লাহ) উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা সংখ্যায় এর চাইতে কম হউক বা বেশি হউক-যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন।"[৩৬] "পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই,যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।"[৩৭]

উচ্চতর জগতে অর্থাৎ আত্মার জগতে মানুষের স্থান এতই উঁচু ও মহান যে আল্লাহর খুব কাছের ফিরিশতাদের মাথাও তাদের সম্মানে অবনমিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জমিনে তাঁরই খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের পদমর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষকে খিলাফতের এই উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন কারীমে বলেছেন, "স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি-তারা বললেন,"আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে কিনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। তারপর তিনি আদমকে শিখালেন যাবতীয় নাম এরপর তিনি সকল ফিরিশতাকে ডেকে বললেন, আমাকে এসবের নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তাঁরা বললেন, "আপনি মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার বাইরে কোন জ্ঞান আমাদের নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি বললেন, "হে আদাম, তাদেরকে এই সবের নাম বলে দাও। যখন সে একে একে সবগুলোর নাম বলে দিল তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর আর যা গোপন রাখ আমি তাও জানি।"[৩৮]

---

৩৩. আল-কুরআন, ৯৬: ১–৫
৩৪. আল-কুরআন, ২:১৮৬
৩৫. আল-কুরআন, ৫০:১৬
৩৬. আল-কুরআন, ৫৮:৭
৩৭. আল-কুরআন, ২:১১৫
৩৮. আল-কুরআন, ২:৩০ – ৩৩

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা সকল ফিরিশতাকে বললেন আদম (আ.)এর সম্মানে তাকে সিজদা করতে। কিন্তু ইবলিস মানুষকে সম্মান দেখানোর এ নির্দেশ মেনে নিতে পারেনি। মানুষ আল্লাহর মুখ্য সৃষ্টি। মানুষের সম্ভাবনা অসীম। মানুষের জন্যই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তার জন্যই এত আয়োজন। আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সমগ্র সৃষ্টিকে মানব-নিয়ন্ত্রিত করে দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুকে।"[৩৯] "তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, তিনিই নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন–তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু প্রার্থনা কর তা হতে; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, না-শোকর।"[৪০]

বিশ্বজগতে এই হচ্ছে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। এ সৃষ্টলোকে মানুষের চেয়েও বহু বড় ও ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি রয়েছে, তা সত্ত্বেও সৃষ্টিলোকের উপরে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার কারণ এই যে, মানব সত্ত্বার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর জ্ঞানের আলোকের একটা অংশ এবং মানব দেহে বিরাজ করছে সেই রূহ যা আল্লাহ তা'য়ালা নিজে তাঁর রূহ হতে আদমের দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। ইসলামের মতে, মানুষ অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী। তাই সে তার জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে। এজন্য তাকে অন্য কোন সৃষ্টির সামনে মাথা নোয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞানী লোকমানের উদ্ধৃতি টেনেছেন পবিত্র কুরআনে, "ইন্নাশ শিরকা লাজুলমুন আযীম"[৪১] অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক ভয়ানক অপরাধ। "শিরককে ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।" ইসলামের মতে আল্লাহ তা'য়ালা পরম আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্ত্বা এবং তিনিই সবকিছুর উৎস। নিছক প্রশংসাবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করা মানুষের কাম্য হওয়া উচিৎ নয়।

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে এমন এমন ঐশি গুণাবলি অর্জন করতে হয় যেন সে পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।

---

৩৯. আল-কুরআন, ২২:৬৫

৪০. আল-কুরআন, ১৪:৩২ – ৩৪

৪১. আল-কুরআন, ৩১:১৩

কেননা মানুষই মহান আল্লাহর একমাত্র সৃষ্ট জীব যে তার আপন শক্তির বিকাশ সাধন করে সচেতনভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। এই সক্ষমতার সাহায্যেই বিশ্বের অগণিত বস্তু ও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। মানুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা নয় বরং প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি বিস্ময়ের অন্যতম নিদর্শন এই মানুষ। প্রকৃতির প্রতিটি পরমাণু মানুষের দেহে স্থান পেয়েছে। মানুষ জগতের ক্ষুদ্ররূপ, মানুষ যেন একটি অণুজগত। সে যেসব শক্তি ও বৃত্তির অধিকারী সেগুলোর মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে চারিদিকের পরিবেশ তার বিকাশসাধন ও অগ্রগতির পক্ষে বেশ প্রতিকূল। কিন্তু এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে সে সক্ষম। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরোধিতা মানুষকে এমন এক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যার সাহায্যে সে সৃষ্টি করতে পারে এক কল্পজগৎ এবং সেই সূত্রে পেতে পারে অপরিমেয় আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। সুতরাং একমাত্র এ জগতের ও নিজের পরিবেশের জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ পারে তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে বিকশিত করতে।[৪২]

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সবরকম অধিকার ও কার্যক্রম কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপরে ন্যস্ত করা হয়নি বরং প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের উপরে তা আরোপ করা হয়েছে। ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেন।এ ব্যক্তি-মানস গঠনের লক্ষেই ইসলামে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সার্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে জ্ঞানার্জনের তাগিদই ছিল প্রথম ঐশিবাণী।

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা। ইসলামী নীতিতে সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতিতে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মানুষ মূলে এক পরিবারভুক্ত, সকলের উৎস যে এক,সকল মানুষের অন্তরে যে নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগসূত্র রয়েছে এবং তারা যে পরস্পর ভাই ভাই এ কথা ইসলামই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, “সমস্ত মানব এক জাতি।”

“হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।”[৪৩]

---

৪২. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৪২

৪৩. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

ইসলামের প্রতিটি বিধানই মানুষকে উচ্চতর আসনে উন্নীত করে। তাকে সৎভাবে জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত করে এবং তার আত্মসচেতনতাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সদুত্তরের মাধ্যমে মানুষকে সুখি ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপন, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার সত্ত্ব, সম্পদের বন্টন, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক, ন্যায়পরায়ণতা, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধ ও শান্তি, দারিদ্র্যের কল্যাণ বিধান, এতীম ও বিধবাদের মঙ্গল সাধন ইত্যাদি বিষয়ের সঠিক পথনির্দেশ রয়েছে ইসলামে।

তাই মানবতার জন্য ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে তা বিস্ময়কর। ইসলামের নির্দেশঃ "মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আহতদের উপরে কখনোই অবিচার করবে না; সর্বাবস্থায় নারী জাতির প্রতি সম্মান দেখাবে। ইসলামে মুসলমান-অমুসলমান প্রত্যেক নাগরিকই বিভিন্ন ধরণের মৌলিক অধিকার ভোগ করে। জীবন, সম্পত্তি ও মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত। ইসলাম মানব মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন আদর্শকে বিশ্বের বুকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। মানবাধিকারকে ইসলাম নিজস্ব পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সফলতার সাথে এ অধিকার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। মানব মর্যাদার প্রবক্তা ও সহায়ক হিসেবে ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই মানব জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি এবং হত্যার পরিবর্তে হত্যা ছাড়া নর-হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। "যদি কেউ একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয় যে সে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করেছে এবং কেউ একজন মানুষের জীবন রক্ষা করলে সমগ্র মানব জাতির জীবন রক্ষার সমতুল্য কাজ করল।"[৪৪]

আল্লাহ তা'য়ালা নরহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা যায় না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে কিসাসের দাবি করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৪৫]

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ইসলাম দাসপ্রথা ও দাসব্যবস্থা বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দাস ব্যবস্থাকে নবী (স.) পাপ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। দাসদেরকে শুধু মুক্ত করার জন্যই নয়, মর্যাদার সাথে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃত্ব করার অধিকারও দেন নবী স. নিজেই। যায়েদকে মুক্ত করে তাকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেন এবং নবীজী (স.) তাঁর চাচাত বোন যয়নাবের সাথে বিয়ে দেন। মহানবী (স.) তাকে সৈন্যবাহিনীর জেনারেলের দায়িত্ব দেন। মুক্তিলাভের পর হাবসী গোলাম বেলাল (রা.) কে মুয়াজ্জিনের উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

---

৪৪. আল-কুরআন, ৫:৩২

৪৫. আল-কুরআন, ২:১৭৮

ইবাদতের ধারণা:

ইবাদত হলো আল্লাহ তা'য়ালার শিখানো এবং মুহাম্মাদ (স.)-এর দেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাযথভাবে আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা। মুসলমান তার কাজ শুরু করে বিসমিলল্লাহ বলে। অর্থাৎ, শুরুটা তোমারি নামে হে প্রভূ। আবার সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই সে বলে আলহামদুলিল্লাহ, 'হে আল্লাহ তোমারি প্রশংসা'। জীবনের করুণতম মুহূর্তে ও সে আল্লাহকে ভোলে না—বলে, 'ইন্নালিল্লাহ'। আমরা সবাই আল্লাহরই মালিকানাভুক্ত।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সকল কাজই আল্লাহর জন্য, মুসলমানের যাবতীয় কাজ যা করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন রয়েছে তা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন-মুত্তাকীদের কর্মকান্ডের বিবৃতি দিয়েছেন এভাবে, "ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ, যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে আর আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে; আর পরকালে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে-এরাই এদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।"[৪৬]

আয়াতগুলি বিশ্লেষণ করলে ইসলামে ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় ঈমান ও আমলের তথা বিশ্বাস ও কর্মের মৌলিক নীতিসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঈমান ইসলামের তত্ত্বমূলক দিক এবং আমলের ব্যবহারিক দিক। বিশ্বাসবর্জিত কর্ম যেমন ইসলামের লক্ষ্য নয়, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও ইসলামের আদর্শ নয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ও সংযোগ ঘটেছে।

সমগ্র বিশ্বজগতের উপর মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। সমস্ত কিছুই আল্লাহর বিধান বা নিয়ম-নীতি ও নির্দেশ মেনে চলেছে। তাই কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নেই। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বিশ্বজগৎ এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না। মানব সমাজে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। আল-কুরআন মানুষের দুটি পরিচয় দিয়েছে: "আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি উহাকে নীচাশয়দিগের চাইতেও নীচ করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"[৪৭]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, মানুষের দুটি পরিচয় রয়েছে। প্রথমত, মানুষ পৃথিবীর সুন্দরতম সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত। দ্বিতীয়ত, মানুষ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম প্রাণির চেয়ে ও নিকৃষ্ট অর্থাৎ কিনা সে যখন আল্লাহর বিধান মোতাবেক তার জীবন পরিচালিত না করে নিজ খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তখন আল্লাহর চোখে সে নিকৃষ্ট জীব হিসেবে গণ্য হয়।

৪৬. আল-কুরআন, ২:১–৫

৪৭. আল-কুরআন, ৯৫: ৪–৬

মানুষ যাতে নিজের সৃষ্টির সেরা জীব এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। আল্লাহর কিতাব ও নবীর যথার্থ অনুসরণ করার অর্থই আনুগত্য, অন্য কথায় ইবাদত। এই ইবাদতের মাধ্যমেই জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। অন্যথায় অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে তার দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে তার জন্য অপেক্ষা করে ভয়াবহ শাস্তি।

প্রকৃতি জগতের জন্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি মেনে চলে তাঁরই বিধান, তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।"[৪৮]

আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে প্রকৃতির অন্যান্য সবকিছু থেকে কেবলমাত্র মানুষই ব্যতিক্রম। আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে আল্লাহর অনুসরণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা লঙ্ঘন ও করতে পারে। এজন্যই মানুষের রয়েছে জবাবদিহিতা এবং কর্ম অনুযায়ি জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের ব্যবস্থা।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ইনসান' শব্দের অর্থ মনুষ্যত্ববোধ বা অনুভূতি। মানুষের এ মনুষ্যত্ববোধ এবং তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি আছে বলেই সে সৃষ্টির সেরা জীব। তার এ সূক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েই সে বিচার করবে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করবে। তারপর সে বুদ্ধি ও বোধকে, মনুষ্যত্ব ও অনুভূতিকে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে কাজে লাগাবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন: "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন এবং মানুষকে এই উদ্দেশ্যে যে তারা আমার ইবাদত করবে।"[৪৯]

আল্লাহ তার ঈবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের রয়েছে পাঁচটি ফরয ইবাদত। কালিমা, নামাজ, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ। কালিমা অর্থ বুঝে মনে-প্রাণে জীবনে একবার উচ্চারণ করা ফরয। অন্য সময়ে তা উচ্চারণ করা ফরয নয় তবে সবসময় তা স্মরণে রাখা ও তার মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি। নামাজ দিনে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা ফরয। রোযা শুধু বছরের একমাস রাখা ফরয। যাকাত কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি-মালিকের উপরে ফরয। আর হজ্জ সামর্থ্যবান ধনীদের উপরে জীবনে একবার আদায় করা ফরয। এই ইবাদতের বাইরে দিন-রাতের ও জীবনের বাকি সময়টা মানুষ কী করে কাটাবে? আবার অন্যভাবে বললে বাকি সময় যদি নফল ইবাদতে কাটিয়ে দেয় তা হবে বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করা। মূলত ইসলাম এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করতে বলে: "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে রক্ষা কর অগ্নিযন্ত্রণা থেকে।"[৫০]

---

৪৮. আল-কুরআন, ৫৫:৫–৮

৪৯. আল-কুরআন, ৫১:৫৬

৫০. আল-কুরআন, ২:২০১

ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র তথা বিশ্ব, জীবনের সকল পর্যায়ে, দিক ও বিভাগে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার জন্য জীবনের সকল শ্রম, সাধনা, প্রয়াস ও সময়কে ব্যয় করাই প্রকৃত মুমিনের জীবনের লক্ষ্য এবং ইসলামে তা ইবাদত হিসেবে গন্য।

যে সমস্ত ইবাদত সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা হাক্কুলল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার আরযে সমস্ত ইবাদত বান্দা বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত তা হলো হাক্কুল ইবাদ। দুটি অধিকারের মধ্যে এমন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যে, দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই। বান্দার হককে উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা যায় না। দু ধরণের হক আদায় করাই আমাদের উপরে ফরয এবং কেউ যদি উভয় হকের কোন একটিতে আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং অন্য ধরণের হককে অগ্রাহ্য করে তবে তার পক্ষে ঈবাদতের পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সকল কিছু বাদ দিয়ে কেউ যদি শুধু আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় এবং এপথেই সিদ্ধি লাভ করতে চায় তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে অস্বীকার করল।

অথচ আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে নানা জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন।

সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধার মহিমান্বিত স্রষ্টার সকল গুণ ও শক্তির সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং তার নির্দেশমত হালাল-হারামের বিধান মেনে জীবন যাপন সর্বোপরি সবসময় তাঁর স্মরণ ও সব কাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই আল্লাহর হক। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক আচরণ করাই হলো হক্কুল ইবাদ। অতএব আল্‌াহর হুকুম পালন হচ্ছে হাক্কুল্লাহ এবং হাক্কুল ইবাদ এর সমষ্টি বা ইবাদত।

হাক্কুলল্লাহর দাবি একটাই আর হাক্কুল ইবাদ হলো সুবিস্তৃত, সীমা-সংখ্যাহীন। হাক্কুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতে পূর্ণতা আসে না। একমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে যদি আমরা সব রকমের মিথ্যা বলা, অশ্লীল ভাষার ব্যবহার, পরনিন্দা ইত্যাদি কু-চর্চা হতে ফিরে থাকি এবং সত্য কথা বলি, মার্জিত ভাষাতে কথা বলি, অন্যের সাথে ভাল আচরণ করি তাহলে তা অবশ্যই ইবাদত বলে গণ্য হবে। শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবৈধভাবে ব্যবহার করলে যেমন পাপ হয় বৈধ ও ইসলামসম্মত পন্থায় ব্যবহার করলে তেমনি নেকি ও সওয়াবের প্রত্যাশা করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, মিথ্যা বললে, অন্যের সাথে অসদাচরণ করলে যেমন-গোনাহ হয়, সত্য বললে, সদালাপ ও পরোপকার করলে তেমনি সওয়াব লাভ করা যায়।

পার্থিব জীবনে আমাদের কায়-কারবার,লেনদেন, বেচা-কেনা, সামাজিক আচরণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সঠিক ও সঙ্গতভাবে জীবন পরিচালনাও ইবাদত।বেচার কালে মাপে কম দেয়া, কেনার সময়ে বেশি নেয়া, মালে ভেজাল মিশানো, অতিরিক্ত মুনাফা খাওয়া, মজুতদারি করা, ফটকা কারবার, চোরা কারবার, কালো বাজারি, ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নেয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে এ সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চললে সততা, ঈমানাদারি ও আমানতদারিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করলে তার ঈবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, অধীনস্ত লোকজন, পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়ানুগ আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে তা যথাযথভাবে মেনে চললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে যেমন শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, হক্কুল ইবাদ হিসেবে তা যথার্থ ইবাদত হিসেবেও আল্লাহর নিকট গৃহীত হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে এর বরখেলাপ হলে তার দ্বারা ইসলামের শিক্ষা বা আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তোমরা আল্লাহর ঈবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথী, পথচারি এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[৫১]

বস্তুত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিচারপ্রার্থিকে ন্যায্য বিচার দিতে, রোগাক্রান্তকে সেবা-শুশ্রূষা করতে ও চিকিৎসা সাহায্য দিতে, মজলুমকে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিৎ কথা বলতে। এসব কিছু হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বা মানবতার সেবা। ইবাদতের অর্থ তাই ব্যাপক ও গভীর। আমাদের চিন্তা, কর্ম, আচরণ, দায়িত্ব ইত্যাদি সবকিছু যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ধিধানের উদ্দেশ্যেই ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ি পরিচালিত হয় তখনই তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীতটাকে বলা যায় নফসানিয়াত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইবাদত আমাদের দেহ।

সৃষ্টিসেবা ও ইসলামঃ

সৃষ্টিসেবায় আত্মনিয়োগ করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের উপরে। মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও পরস্পর পরস্পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া এবং দুঃখীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

---

৫১. আল-কুরআন, ৪:৩৬

পবিত্র কুরআন হাদিসে যেখানেই ইবাদত সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে সৃষ্টির সেবাকেও শামিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "সুতরাং দুর্ভোগ সেই নামাজীদের, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।"[৫২]

এখানে সুস্পষ্টভাবে ইবাদতের সাথে সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দানের মহিমা বিবৃত করেছেন আল্লাহ তায়ালা। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের উৎস সুস্পষ্ট। মুহাম্মাদ শহীদুলল্লাহর ভাষায়, "সৌরজগতের প্রতি লক্ষ্য কর দেখ, গ্রহ-উপগ্রহগুলো কি সুনিয়মে, কি সুশৃঙ্খলভাবে তাহাদের নিজ নিজ কক্ষে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীতে দেখ বৃষ্টি হইতেছে, নদী বহিতেছে, ফল পড়িতেছে, ফুল ঝরিতেছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ সমস্তই মধ্যাকর্ষণের ফল। জগতে যেমন মধ্যাকর্ষণ, মনোজগতেও সেইরূপ এক আকর্ষণ আাছে। সেই আকর্ষণের ফলে বন্ধুর প্রীতি, পতি-পত্নীর প্রেম, পিতা-মাতার বাৎসল্য, সন্তানের মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, দাতার দাক্ষিণ্য, সজ্জনের দয়া, কী মধুর আকর্ষণ! একই পদার্থের পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ। এই যে প্রাণের সহিত প্রাণের টান, তাহার অফুরন্ত উৎস প্রেমময় আল্লাহ তায়ালার অনন্ত করুণা। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন যে, "আল্লাহ তাআলার শত করুণার মধ্যে একটি মাত্র তিনি দানব, মানব, চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুকে দান করিয়াছেন। তাহার ফলে এই সমস্ত প্রাণি পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করে; তাহার ফলে বন্য পশু তাহার শাবককে ভালবাসে।" (বুখারি ও মুসলিম)। আর একবার আমাদের প্রিয়নবী স. মাতৃবক্ষে শিশুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "যেমন এই জননী তাহার সন্তানকে স্নেহ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অপেক্ষা বেশি তাহার সৃষ্টি জীবকে স্নেহ করেন। " (বুখারি ও মুসলিম)[৫৩]

ন্যায় ও সৎ ব্যবহারে মহানবী (স.) কখনো স্বধর্মী-বিধর্মী বিচার করতেন না। তাঁর চাচা আবু তালিব মুসলমান না হলেও এ নিয়ে তাদের মাঝে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। তাঁরা সর্বদা সৎ ভাবে জীবন যাপন করেছেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাওয়াত কবুল করেছেন। অনেক সময় তাঁর সুন্দর আচরণ ও ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই মুসলমান হয়েছেন। নবী করীম (স.) বলেছেন, "মানুষের জন্য ভালবাসবে নিজের জন্য তাই ভালবাস, তবেই তুমি মুসলমান হবে।" "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করেন না।" "সেই লোকদের মধ্যে ভাল যে অন্য লোকদের উপকার করে।" "পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, তবে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন।" সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার-পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহর প্রিয়ভাজন, যে তাঁর এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারী।[৫৪]

---

৫২. আল-কুরআন, ১০৭: ৫–৭

৫৩. উদ্বৃত: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ- রেঁনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা-১৯৬৩, পৃ. ১

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

মানবের প্রতি অত্যাচার-অবিচার, দরিদ্রের প্রতি নির্মম ব্যবহার, প্রজার রক্ত শোষণ এবং স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত রেখে কেবল 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বললে মুক্তি মেলে না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতকে সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে বিশ্বপ্রভূকে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। মানুষকে দুটি চোখ দেয়া হয়েছে, কথা বলার শক্তি দেয়া হয়েছে, সুপথ-কুপথ দুটি পথ দেখানো হয়েছে যাতে করে সে দায়িত্বের কঠিন পথপরিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়। দায়িত্বের সে কঠিন পথ-পরিক্রমা হচ্ছে, দাসমুক্তকরণ, অভাব-অনটনে জর্জরিত নিরন্ন ও নিঃস্বদের খাদ্য দান করা এবং ধৈর্য্য অবলম্বন ও পরোপকারে ব্রতী হওয়া। "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করার মাঝে, সালাত কায়েম করাতে ও যাকাত প্রদানে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করার মাঝে।[৫৫] "যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য্য রাত্রে-দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত ও হবে না।"[৫৬] মূলত দুর্গত জরাজীর্ণ মানবতার সেবা করার, আর্তের প্রতি দয়া করার, দারিদ্র্য-পীড়িত, বন্যাকবলিত, দুর্যোগের শিকার হতভাগা লোকজন, ক্ষুধার্ত ইয়াতীম, মিসকীন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার তাগিদ জানানো হয়েছে।

ইসলামী নীতিবিদ্যা ও এর বৈশিষ্ট্যঃ

নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি গুরুত্তপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। দর্শনের অর্ন্তগত মূল্যবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে এটি আলোচিত হয়ে আসছে। মূল্যবিদ্যার যে দিকটি মানবাচরণের ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। নীতিবিদ্যার সাথে বা নীতি নৈতিকতার সাথে ধর্মের কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।কেননা ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতা থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক ধর্মই আবশ্যিকভাবে নৈতিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে ব্যাপক অর্থে ধর্ম হচ্ছে জীবন বিধান। ধর্ম মানুষকে কল্যাণময় জীবনের নির্দেশনা দিয়ে থাকে ।প্রত্যেক ধর্মই কম-বেশী নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে ।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম। এই ধর্মের মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নৈতিক দিক-নির্দেশনা অনুসারে নীতিবিদ্যা বা নীতিতাত্ত্বিক আলোচনা হতে পারে। সে ধরনের নীতিবিদ্যাকে আমরা 'ইসলামী নীতিবিদ্যা' বলতে পারি। তবে ইসলামী নীতিবিদ্যার প্রাথমিক রূপরেখা জানার আগে আমাদেরকে প্রথমে পাশ্চাত্য দার্শনিকতত্ত্ব হিসেবে প্রচলিত নীতিবিদ্যার স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অবগত হতে হবে। এছাড়া ইসলামী নীতিবিদ্যার প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট করার জন্য পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার সাথে এর খানিকটা তুলনা করারও চেষ্টা করা হবে।

---

৫৫. আল-কুরআন, ২:১৭৭
৫৬. আল-কুরআন, ২:২৭৪

নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা:

সমাজে বসবাসকারী সুস্থ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, ন্যায়-অন্যায়, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি মান মূল্যায়নকারী বিদ্যাকে নীতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে দার্শনিক নীতিবিদ্যার পঠন পাঠন শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে।"[১] তবে তখন থেকে আজ অবধি এটি মূলত দর্শনের একটি শাখা হিসেবে দার্শনিক মূলত দর্শনের একটি শাখা হিসেবেই পঠিত বা চর্চিত হয়ে আসছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চাশ শতাব্দির দিকে সোফিষ্ট বলে পরিচিত একদল পেশাদার শিক্ষক নীতিবিদ্যক আলোচনার প্রাথমিক উদ্যেক্তা বলে মনে করা হয়।[২] সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত দার্শনিক প্রোটাগোরাস (protagoras) সর্বপ্রথম মানুষের আচরণ নিয়ে মূল্যায়নধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেন বলে মনে করা হয়।[৩]

তবে সক্রেটিসের হাতে নীতিবিদ্যা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

'নীতিবিদ্যা' শব্দটি ইংরেজি 'Ethics' শব্দের বাংলারূপ। 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Ethica' থেকে, এটি আবার 'Ethos' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে চরিত্র (character)।[৪] চরিত্রকে অভ্যাস ও রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত মনে করা হয়ে থাকে।[৫]

অন্যদিকে 'Ethics' বা নীতিবিদ্যার সমর্থক হিসেবে 'Moral Philosophy' কথাটি ব্যবহার করেন। [৬] ইংরেজী 'Moral' শব্দটি আবার ল্যাটিন শব্দ 'Mores' থেকে এসেছে-যার অর্থ হচ্ছে অভ্যাস বা রীতি-নীতি।[৭]

এসব শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করে নীতিবিদ্যার একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি বলেন, Ethics, then,we may say, discusses men's habits and customs, or in other words their characters. The principles on which they habitually act, and considers what it is that constitutes the rightness or wrongness of those principles, the good or evil of those habits.[৮]

নীতিবিদ্যাকে ম্যাকেঞ্জি আচরণের ভালোত্ব এবং যথার্থতা বিচারের বিদ্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ ভালোত্ব এবং যথার্থতাকে এক করে দেখতে চান না।[৯]

---

১. Rogers. R.A.P. A Short History of Ethics. Macmillan and Co. Limited. St. Marthin`s Street . London . 1948. P.31.
২. Ibid .P. 3.
৩. প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট নামক একদল পেশাদার দার্শনিক, (যাদের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে) তৎকালীন গ্রীসের দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যার পরিবর্তে মানুষকেই দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করায় প্রয়াস নেন। Ibid .P. 3.
৪. Mackenzie, John S. A. Manual of Ethics. Oxford University Press.Delhi, 1993 , P.1
৫. Ibid .P. 1.
৬. Ibid .P. 1.
৭. Ibid .P. 1. Morel এবং Ethics শব্দটির মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেকের মতে : Ethics is the philosophy of Morals, (Sanyal . B.S. , Ethics and Meta Ethics , Vikas Publications, Delhi, Bombay, Bangalore, 1970, P. 1
৮. Mackenzie, John S. op. cit. p. 1
৯. Little William. An Introduction to ethics. Allied Publishers Limited. Indian Edition. Culcuta. New Dilhi Mandras. Reprinted-1990. p.p 6-7.

ইংরেজী 'good' শব্দটি অর্থ ভাল। অন্যদিকে 'right' শব্দটি ভিন্ন অর্থবোধক। এর অর্থ সোজা, সঠিক, যথার্থ ও শুদ্ধ ইত্যাদি হতে পারে। ল্যাটিন শব্দ 'rectus' থেকে ইংরেজীতে 'right' শব্দটি এসেছে। যার অর্থ সোজা (straight)।[১০]

তবে ম্যাকেঞ্জি যেভাবে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় তিনি এই শব্দটিকে 'যথার্থতা ' নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[১১]

এই দিক থেকে ভালোত্ব এবং যথার্থতা শব্দ দুটি অনেকটা সম অর্থবোধক বা সহযোগী প্রত্যয় হিসেবে গৃহীত হলে অসুবিধার কিছু নেই বলে মনে হয়। মানুষের অভ্যাসগত বা চারিত্রক কর্মকান্ড, যা স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকে, তেমন কর্মের ভালত্ব বা যথার্থতা বিচারকেই ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যা বলে চিহ্নিত করেছেন।

নীতিবিদ্যাকে মানবাচারণের আদর্শনিষ্ঠ পর্যালোচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন উইলিয়াম লিলি। নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় তিনি বলেন, We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies−a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. [১২]

এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত conduct শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা জরুরী । conduct বলতে সাধারণ অর্থে আচার বোঝানো হয়। তবে এখানে conduct বলতে কেবল সেই মানবীয় আচরণের একটি সামগ্রিক নামকে নির্দেশ করা হয়েছে যা স্বেচ্ছায় করা হয়ে থাকে। লিলির ভাষায় æ....Conduct is a collective name for voluntary actions"[১৩]

তবে conduct বা আচরণ বলতে লিলি প্রমুখ লেখক নীতিবিদ্যাকে যেভাবে কেবলমাত্র মানবীয় আচরণের মূল্যায়ন যাচাইয়ের বিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমকালীন যুগে তা নীতিবিদ্যার সামগ্রিক প্রকৃতি ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। সমকালীন যুগে নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।[১৪]

উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দির শুরু থেকে নীতিবিদ্যার আলোচনায় পরনীতিবিদ্যা ও এই শতাব্দির শেষের দিক থেকে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার আবির্ভাব ঘটেছে। পরনীতিবিদ্যার নৈতিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন শব্দ, পদ, প্রত্যয় ইত্যাদির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তার সাথে নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।[১৫]

---

১০. Data. Abani Mohan, Problems of ethics, Chitagong. 1967. P. 4
১১. Mackenzie. op.cit. P. 2
১২. Op.cit. P.1-2
১৩. Ibid, P. 3
১৪. ওয়াহাব,শেখ আব্দুল, বিংশ শতাব্দির নীতিদর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬, পৃ. ৫, (ভূমিকা)।
১৫. Roger, N. Hancock, Twentieth Century Ethics, Columbia University Press, New York, 1947, P.2.

অন্যদিকে তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার, বিশেষ করে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার, মানদন্ডগুলো বিশেষ বিশেষ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করে বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নৈতিক সমস্যার সমাধান কিভাবে দেওয়া যায় তা-ই হচ্ছে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা বা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।[১৬] কেবলমাত্র মানুষই থাকছে না বা মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বা বিষয়বস্তু হিসেবে অবস্থান করছে না; বরং আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগতের বিষয়াদি এক কথায় সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।[১৭]

কেননা মানবাচরণকে চারপাশের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। তবে সে যাই হোক না কেন, মানুষ যার সাথেই আচরণ করুক না কেন মূলত মানবাচারণই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তবে এই আলোচনা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। অর্থ্যাৎ কোন বিশেষ আচরণের মান নির্ধারণ করা নয়, বরং সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য মানবাচারণের মান বিচারই হলে নীতিবিদ্যা।[১৮] তবে নৈতিক আদর্শ বা মূল্যবোধ সর্বজনীন হওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বেন্থাম, মিল, কান্ট, সিজউইক, ম্যুর, প্রিচার্ড, রস প্রমুখ নীতিদার্শনিক নৈতিক আদর্শের সর্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব দেন।[১৯] অন্যদিকে এয়ার, কার্নাপ, রাসেল, হেয়ার প্রমুখ নীতিদার্শনিক নৈতিকতাকে আপেক্ষিক বা ব্যক্তিসাপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।[২০] তবে নৈতিকতার সর্বজনীন মান নির্ধারণের চেষ্টাকেই নীতিবিদ্যার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। ড. গোলাম দস্তগীরের ভাষায়: "নৈতিক মূল্যবোধ যদি ব্যক্তিগত অভিরুচি বা অনুভূতির ব্যাপার হয়, তাহলে ন্যায়-অন্যায় , উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে মূল্যবোধ বিষয়নিষ্ঠা নয় তা গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা কঠিন। নৈতিকতার বাণী তাই শাশ্বত ও সর্বজনীন হওয়ার অত্যাবশ্যকীয়তার দাবী করে।" [২১]

---

১৬. আব্দুল খালেক, এ. এস.এম.প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, অন্যন্যা, ঢাকা, প্রথম সংস্কারণ, ২০০৩, পৃ.২২.

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৮. Mackenzie , Op.cit . P-2

১৯. দস্তগীর, গোলাম, ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতা, দর্শন ও প্রগতি, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (জুন-ডিসেম্বর), ১৯৯০, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, পৃ. ৫১

২০. উক্ত পৃ. ৫১

২১. উক্ত পৃ. ৫২

নীতিবিদ্যায় সর্বজনীন মান নির্ধারণই নয় বরং এটা চূড়ান্তভাবে কাম্য লক্ষ্য নির্ধারণেরও প্রয়াসী। মানবজীবনের আচরণসমূহের পরম মান নির্ধারণ নীতিবিদ্যার কাম্য।[২২] পরমমান বা পরম লক্ষ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Rogers বলেন, æAn ultimate end, however, is one that is desired for its own sake, quite apart from its in utility in helping towards the attainment of other ends.”[২৩]

তাই দেখা যায়, নীতিবিদ্যা কোন বিশেষ স্বার্থে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য কোন লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা না করে পরম লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টা করে যা নিজের জন্যেই নিজে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত।

নীতিবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নীতিবিদ্যার একটি সামগ্রিক সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি-নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী সুস্থ ও বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের নিজের ক্ষেত্রে, অন্যের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ-প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, যথার্থতা-অযথঅর্থতা ইত্যাদির সামগ্রিক এর পরম মান নির্ধারণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিজ্ঞান; এবং এই মান নির্ধারণের ভিত্তি ও এর সাথে জড়িত বিভিন্ন শব্দ, পদ বা প্রত্যয়ের অর্থ ও তাৎপর্য বিচারের একটি বিশেষ বিদ্যা (study)। নীতিবিদ্যার এই সংজ্ঞায় প্রচলিত আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার সাথে এর প্রায়োগিক দিকের পর্যালোচনাসহ সমকালীন পরানীতিবিদ্যাকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । নীতিবিদ্যার এই পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নীতিবিদ্যারযে বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায় , তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

এক: নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। [২৪] মানবেতর প্রাণির আচরণ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়।[২৫]

দুই: নীতিদ্যিা মানুষের সকল আচরণ নিয়ে আলোচনা করে না কেবলমাত্র ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে ।

তিন: নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে ।

চার: সমাজের সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির আচরণই কেবল নীতিবিধ্যার আলোচ্য বিষয়।[২৬]

---

২২. Ibid, P.2 / Rogers, R.A.P, Op.cit., P.3

২৩. Rogers, R.A. P., Op.cit., P.3

২৪. আলম, ড. রশীদুল, নীতিশাস্ত্র পরিচয়, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, নবম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ১

২৫. মনোবিজ্ঞান প্রাণি ও মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণ নিয়েই আলোচনা করে। এই দিক থেকে মনোবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষণীয়।

২৬. ইসলাম, ড. আমিনুল, নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃ. ৪১

পাঁচ: মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পরিবেশ প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত ঐচ্ছিক আচরণের মূল্যায়ণ করা হয় নীতিবিদ্যায়।

ছয়: নীতিবিদ্যা একটি মূল্যায়ণধর্মী বা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা।

সাত: আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল তাত্ত্বিকভাবে কিছু নৈতিক মানদণ্ডই নির্ধারণ করে না, সেই সাথে এই সকল মানদণ্ডকোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় কিভাবে মূল্যায়ণ করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করে।

আট: নীতিবিদ্যা নৈতিকতার ভিত্তি অনুসন্ধান করে থাকে এবং পরম কল্যাণের মানদন্ডে মানুষের ঐচ্ছিক আচরণকে বিচার করে।[২৭]

নয়: নৈতিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন শব্দ, পদ, প্রত্যয় বা বচনের ভাষাগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করাও নীতিবিদ্যার কাজ।

দশ: নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্তসমূহ সমাজভেদে গৃহীত হয়ে থাকে। প্রচলিত নীতিবিদ্যার অধিকাংশ আলোচনাই বিতর্কের শিকার, কোন স্থায়ী সমাধান এক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু:

নীতিবিদ্যার স্বরূপ আলোচনায় এর বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ঐচ্ছিক দিকের মূল্যায়ণ করে, তাই মানবাচরণই নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মনোবিজ্ঞানও আচরণ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনোবিজ্ঞানের সাথে নীতিবিদ্যার পার্থক্য হলো মনোবিজ্ঞান মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।[২৮] কিন্তু নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র মানুষের আচরণ নিয়েই আলোচনা করে। ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক, স্বয়ংক্রিয় সব ধরণের আচরণ নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক আচরণই নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মানুষের যে সমস্ত কাজ তার সচেতন ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় তা নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।[২৯]

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ হলেও যে কোন মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। নীতিবিদ্যা কেবল সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বা মানসিক প্রতিবন্ধীদের আচরণ নীতিবিদ্যার বা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে না।[৩০]

---

২৭. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৮. Hilgard, Ernest, R., Introduction to Phylosophy, Harcourt, Brance world, Ine., New York, Burlingame, 3rd edition, 1962, PP. 2–3

২৯. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩০. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

সমাজে বসবাস করে না এমন বর্বর মানুষের আচরণ নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।কেননা এই সকল মানুষ মানুষের নীতিবোধ পর্যাপ্তভাবে জাগ্রত নয়। এবং সাধারণত তাদের আচরণ সভ্য মানবসমাজের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু হলেও কেবলমাত্র সামাজিক আচরণই যে নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু এমন কথা বলা চলে না। সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত আচরণও নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু। যেমন এক ব্যক্তি দিনের পর দিন তার নিজের শরীরের অযত্ন করলো, এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় হলেও তার সাথে যেহেতু তার পরিবার পরিজনের দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক রয়েছে তাই তিনি তার নিজের শরীর বা অস্তিত্ব নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন কিনা তা নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু।

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে নীতিবিদ্যা ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু যেকোন ধরণের ভালো-মন্দ বিচারই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। যেমন উইলিয়াম লিলি উদাহরণ দিয়ে বলেন: কেউ হয়তো ভালো-মন্দ অথবা মন্দ ভাগ্যের কথা বলে থাকেন। কিন্তু এগুলো নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দের বিচার, কোন দ্রব্যের বা বিষয়ের ভাল-মন্দ যাচাই করা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। মদ পান করা মানুষের জন্য কাম্য বা ভালো কিনা তা আলোচনা করা নীতিবিদ্যার বিষয় কিন্তু কোন মদ ভালো অর্থাৎ উন্নতমানের তা যাচাই করা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়।[৩১]

অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নীতিবিদ্যাও কিছু স্বীকৃত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বিচারশক্তি, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি নীতিবিদ্যার স্বীকার্য সত্য রূপে পরিচিত। এই স্বীকার্য সত্য নিয়ে নীতিবিদ্যা আলোচনা করে থাকে।[৩২] নীতিবিদ্যা কেবল তাত্ত্বিকভাবে নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণ, নৈতিক নিয়মের ব্যাখ্যা দিয়েই সন্তুষ্ট নয়, বরং সমকালীন নীতিবিদ্যা এই সকল তাত্ত্বিক মানদন্ড বা নৈতিক নিয়মাবলি প্রয়োগ করে সমাজে বসবাসকারী মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিভিন্ন আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য মূল্যায়নের চেষ্টা করে।[৩৩]

এই দিক থেকে সমাজবদ্ধ মানুষের জৈবিক, বৈষয়িক, পারিবারিক, রাজনৈতিক সকল বিষয়ই নৈতিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মানুষ স্বভাবত ভালো কাজ করে, নাকি সমাজ জীবনে বিভিন্ন শিক্ষার দ্বারা মানুষ ভালো-মন্দ বোঝার উপযুক্ত হয়–এককথায় মানুষের নৈতিকতার ভিত্তি কি বা নৈতিকতার দার্শনিক ভিত্তি কি তা অনুসন্ধান করা নীতিবিদ্যার কাজ। তাছাড়া নীতিবিষয়ক বিভিন্ন শব্দ, পদ, প্রত্যয় বা বচনের অর্থ, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা যাচাই করা সমকালীন নীতিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়, যা পরা-নীতিবিদ্যা বলে পরিচিত।[৩৪]

---

৩১. Little, William, Op.cit, P-3

৩২. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩৩. আব্দুল খালেক, এ. এস. এম., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩৪. আব্দুল খালেক, এ. এস. এম., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

নীতিবিদ্যার শ্রেণিবিভাগঃ

নীতিবিদ্যার আলোচনা পুরোনো হলেও সমকালীন যুগে নীতিবিদ্যার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুতে ব্যাপক বিবর্তন ঘটেছে। তাই নীতিবিদ্যার শ্রেণিকরণ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নীতিবিদ্যাকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা এবং পরানীতিবিদ্যা।[৩৫] আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে আবার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

নীতিবিদ্যার যে শাখাটি মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের নৈতিক মান অর্থাৎ ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-দায়িত্ব ইত্যাদি বিচার করে তাকে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা বলা হয়। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার দুটি প্রকার রয়েছে। কোন আদর্শের মাপকাঠিতে যদি আচরণকে তাত্ত্বিকভাবে বিচার করা হয় বা সামগ্রিকভাবে মানবাচরণের তাত্ত্বিক মূল্যায়ণ করা হয় তাহলে সেই আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা কেবল তাত্ত্বিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা। অন্যদিকে কোন বিশেষ নৈতিক আদর্শকে আমরা কেন গ্রহণ করি বা আদর্শের সংঘাতের সময় আমরা কেন কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়ি–এই সকল নীতিবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান আমরা নীতিবিদ্যার যে শাখায় খুঁজে পাই তা হলো ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা।[৩৬] অর্থাৎ তাত্ত্বিক আদর্শসমূহ বা নৈতিক মানদন্ড বা নিয়মাবলি বাস্তবজীবনে বা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ বা সম্যাসমূহকে নৈতিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় নীতিবিদ্যার যে শাখাটিতে তাকে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা বলে।[৩৭]

আদর্শ নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নৈতিক শব্দ, পদ, প্রত্যয় বা বাক্যের অর্থ, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ এবং নৈতিকতার ভিত্তি অনুসন্ধান করা হয় নীতিবিদ্যার যে শাখাটিতে তাকে পরানীতিবিদ্যা বলা হয়।[৩৮]

পরানীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নয়, এটা কেবলই তাত্ত্বিক। একে দার্শনিক নীতিবিদ্যা অথবা নীতিদর্শন (Moral Philosophy) বলা হয়ে থাকে।[৩৯]

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৬. নন্দী, ড. সুধীর কুমার, নীতিবিদ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫

৩৭. প্রাগুক্ত, ১৮

৩৮. Roger. N. Hancock, Op.cit P–2

৩৯. Sanyal, B.S Ethics and Mataethics, Vikas......... Publications, Delhi, Bombay, Bengalore, 1970, Preface, P–5

ইসলামী নীতিবিদ্যারস্বরূপঃ

ইসলামী নীতিবিদ্যা হচ্ছে ইসলাম ধর্মভিত্তিক নীতিবিদ্যা। অর্থাৎ মানবাচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, কর্তব্য-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় কুরআন, হাদীসের ভিত্তিতে এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ধারণের প্রচেষ্টাই হলো ইসলামী নীতিবিদ্যা। আমরা জানি, ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কুরআন এবং হাদীস। সমগ্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা, চিন্তা ও ভাবধারা এই দুইটি পবিত্র ভিত্তির ওপরে (আবশ্যিকভাবেই) প্রতিষ্ঠিত। তবে অনেক বিষয় রয়েছে যার সরাসরি কোন নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। সেই সকল বিষয় যুক্তি তর্ক, অনুরূপতা ইত্যাদির মাধ্যমে যাচাই করে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামি মূল ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ করে কোন নৈতিক দিকনির্দেশনা খুঁজে বের করার প্রয়াসই হলো ইসলামী নীতিবিদ্যা।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, ইসলামি নীতিবিদ্যা স্বতন্ত্র নয়; বরং এই নীতিবিদ্যা ধর্মীয় নীতি-আদর্শ বা বিশ্বাস্য বিষয়গুলো থেকে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে এসেছে।[৪০]

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের নীতিমালার বাইরে কেবল মানব প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিবিদ্যাকে আমরা ইসলামী নীতিবিদ্যা বলতে পারি না। এমন হতে পারে যে, কোন স্বাধীনতত্ত্ব বা দার্শনিকতত্ত্ব ইসলামী নীতিতত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু তাকে ইসলামীতত্ত্ব বা ইসলামী নীতিতত্ত্ব বলা যাবে না। প্রসঙ্গত, 'ইসলাম সদৃশ' এবং 'ইসলামী' কথা দুটিকে একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। 'ইসলাম সদৃশ' হলো এমন কিছু যা ইসলামের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি কিন্তু ইসলাম সেই বিষয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করে না বা ইসলামও তদ্রূপ বিষয় অনুমোদন করে । যেমন, সত্যকথা বলা, ওজনে সঠিক দেয়া, দুর্গত মানুষকে সাহায্য করা, পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা এসবই সেই সকল নীতিতাত্ত্বিকগণও ভালো কাজ হিসেবে গণ্য করতে পারেন যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন। সাধারণভাবে এই নীতিগুলো সমাজে ভালো বলে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সকলে মুসলমান বিধায় এগুলো মানেন এমন নয়। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেকটি কাজ বা নীতিই ইসলাম কর্তৃক দৃঢ়ভাবে নির্দেশিত হয়েছে।[৪১]

---

৪০. আব্দুল হাকীম, ড. খলিফা, ইসলামী ভাবধারা, অনুবাদঃ আব্দুল হাই, সাইয়েদ, ৩য় সংস্করণ, আল-হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১২৫

৪১. পবিত্র কুরআন বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় দিকনির্দেশনাসহ (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) মানুষের উন্নত নৈতিক জীবনের সমুদয় গুণাবলি শিক্ষা দেয়। কুরআন এমন একটি ইসলামী কালচার প্রবর্তনের চেষ্টা করে যেখানে মানুষ সহনশীল, দয়ালু, দায়িত্বপূর্ণ ইত্যাদি সামাজিক নৈতিক গুণাবলীসহ সমুদয় চারিত্রিক সদগুণসহ জীবন-যাপন করতে পারে। Yahya Harun, The Moral Values of the Qur'an, Goodword Books, New Dilhi, First Published, 1999, Reprinted-2002, P. 7–8.

যারা ইসলাম অনুসরণ করে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করেন, এর পক্ষে সমর্থন দেন বা এর পক্ষে যুক্তিযুক্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যারা এই নীতিগুলোকে ইসলামী নীতি বলে পালন করেন বা গ্রহণ করেন, তাদের এই তত্ত্ব বা মতাদর্শ হলো ইসলামী তত্ত্ব বা ইসলামী নীতিতত্ত্ব। আর ইসলামের সাথে সঙ্গতির চিন্তা না করে বা ইসলামী নীতি আদর্শ -নির্দেশনা না জেনে অন্য যেকোন ভাবে উপর্যুক্ত নীতিগুলোকে গ্রহণ বা যুক্তিযুক্তকরণ হলো ইসলাম সদৃশ কাজ, ইসলামী কাজ নয়। এক্ষেত্রে কান্ট কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত 'কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করা ও কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা' নীতি দুটির পার্থক্যকরণ স্মরণ করা যেতে পারে।[৪২]

ইসলামী নীতিবিদ্যা ইসলাম ধর্মনির্ভর হলেও একে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। কেননা, ধর্মতত্ত্ব ঐ ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোকপাত করে। কিন্তু ইসলামী নীতিবিদ্যা কেবল নৈতিক বিষয়াবলীকে ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, কর্তব্য-দায়িত্ব ইত্যাদি নৈতিক বিষয়াবলীকে ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক উভয় দিক থেকে আলোচনা করে। এক কথায় ইসলামী নীতিবিদ্যা হলো নৈতিক বিষয়ে (ইসলাম) ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনার সমন্বয়ধর্মী এক নীতিবিদ্যা। ইসলামে যে জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা একটি পরিপূর্ণ নৈতিক জীবনের দিক নির্দেশনাপূর্ণ। কেননা, ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না।[৪৩]

তবে এই জীবনব্যবস্থাকে যৌক্তিকভাবে বিচার করার মাধ্যমে গড়ে ওঠে ইসলামী নীতিবিদ্যা। ইসলামী নীতিবিদ্যার মূলভিত্তি কুরআন হাদীস তথা ইসলামী ধর্ম-আদর্শ হলেও প্রজ্ঞা বা মননশীলতার ভূমিকাও এখানে কম নয়, এটা পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। প্রজ্ঞা-নিঃসৃত যুক্তির ছোঁয়া কোন বিষয়ে বা কোন গবেষণায় না থাকলে সেই বিষয়ে গবেষণা বা পঠন-পাঠনকে দর্শন বলে চিহ্নিত করা চলে না। নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা, অর্থাৎ দর্শন। দর্শনের একটি শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যায় অবশ্যই যুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করে যে, ইসলামী নীতি-আদর্শ সত্যিকারে প্রজ্ঞার বিচারে ব্যর্থ বা ভুল প্রমাণিত হতে পারে না। ইসলাম তার মূল ভিত্তি কুরআনের যথার্থতা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তবে তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না কেন? এটা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো হতো, তবে তারা অনেক অসংগতি পেত।[৪৪]

ইমাম গায্যালী, ইবনে খালদুন প্রমুখ দার্শনিক একমাত্র প্রত্যাদেশকে সবচেয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছেন। কুরআনের বাণীর মত হাদীসকেও প্রত্যাদেশ নিঃসৃত বলা চলে। কেননা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) যা বলতেন এবং নিজে যা মেনে চলতেন তার নীতি-আদর্শ-নির্দেশনা আল্লাহর নিকট থেকেই তিনি লাভ করতেন।

---

৪২. Kant, Immanuel, The Fundamental Principles of the Metaphysic, (Zorn's Translation) PP-12-13

৪৩. প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম হলো সেই ধর্ম যে ধর্ম আল্লাহর বাণী বা প্রত্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

৪৪. আল-কুরআন, ৫৩:৩–৪

কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান থেকে অনুসৃত বা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে প্রাপ্ত বিষয় সুনিশ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামী নীতিবিদ্যাকে এই দিক থেকে (বিশ্বাসীদের জন্য) একটি সুনিশ্চিত কল্যাণকর জীবনাদর্শ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে ইসলামী নীতিবিদ্যা যেহেতু প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের সমন্বয় সেহেতু কিছুটা সতর্কতামূলকভাবে একে অনুশীলন বা চর্চা করা দরকার। কেননা, মানব প্রজ্ঞা ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। প্রত্যাদেশ সুনিশ্চিত সত্য। কিন্তু এই সুনিশ্চিত বিষয়কে প্রজ্ঞা দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে বা সুনিশ্চিত সত্য থেকে অনুসিদ্ধান্ত অনুঃসৃত করার ক্ষেত্রে সতর্কমূলকভাবে প্রজ্ঞার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ইসলামী নীতিবিদ্যা মানুষকে নৈতিক দায়িত্বপূর্ণ সত্য সত্ত্বা হিসেবে চিহ্নিত করে। আল্লাহ রাবক্ষুল আলামীনের সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ ও জ্বীন জাতিকে তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[৪৫]

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার কারণে মানুষকে নৈতিক জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামী নীতিবিদ্যা মানুষের সেই সকল নৈতিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামে ধর্মীয় জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে দেখা হয় না। "বস্তুত ইসলাম ঈমান ও আমলের বিশ্বাস ও অনুশীলনের এক অপূর্ব সমন্বয়। ইসলামের এমন কোন বিধান নেই যা কর্মের দ্বারা সমর্থিত, অনুশীলিত ও বাস্তবায়িত নয়।[৪৬]

ইসলামী নীতিবিদ্যা ইসলাম ধর্ম থেকে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে পাওয়া। ইসলামী নীতিবিদ্যাও তাই একাধারে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে ইসলামী নীতিবিদ্যা নৈতিক নিয়ম এবং তার মানদন্ড বিষয়ে আলোকপাাত করে। অন্যদিকে প্রায়োগিক বিদ্যা হিসেবে ইসলামী নীতিবিদ্যা বিশেষ বিশেষ বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কী আচরণ করবে বা করা উচিৎ তারও দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী নীতিবিদ্যা যে নৈতিক আদর্শের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে তা মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামকে বলা হয় স্বভাবধর্ম। মানব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা মানুষ সহজে আত্মস্থ করতে পারে না এমন কঠোর বা কৃচ্ছ্রতা ইসলামী নীতিবিদ্যা প্রবর্তন করে না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সরল সহজ পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে বলেছেন।[৪৭] তিনিই আবার ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামই সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা।[৪৮] ইসলাম পালনে কোন জটিলতা নেই; বরং ইসলাম পরিপন্থী কাজ করলে ইহকাল ও পরকালে অনেক দূরাবস্থা দেখা দেয়। ইসলামী নীতিবিদ্যা মানুষকে নৈতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং ঘোষণা করে যে, নৈতিক জীবনই শান্তির জীবন। ইসলামী নীতিবিদ্যা কোন বিশেষ জাতির জন্য নিবেদিত নীতিবিদ্যা নয়। এটা অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই। ইসলাম ধর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে

---

৪৫. আল-কুরআন; ৫১:৫৬

৪৬. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪৭. আল-কুরআন, ১: ৫

৪৮. পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারায় কুরআনকে মুত্তাকীনদের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল-কুরআন, ২:২ এছাড়া ইসলামকে স্বভাবধর্ম বলা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, "ইসলামই সরল জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) আল-কুরআন, ৬৮:৪

কিছু নিয়ম-নীতি থাকলেও ইসলামী নীতিবিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেই সকল নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য নয়। ইসলামী নীতিবিদ্যা সমগ্র মানবের জন্য একটি কল্যাণকর জীবনাদর্শ নির্ধারণে প্রয়াসী। মুহাম্মাদ (স.) কে ইসলামী নৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বা নমুনা ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ রাবব্বুল আলামীন নবী মুহাম্মাদ (স.) কে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমাত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের নমুনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৪৯] এক্ষেত্রে কোন বিশেষ জাতি বা একান্তভাবে মুসলমানদের কথা বলা হয়নি।

ইসলামী নীতিবিদ্যা কোন বিশেষ কালের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ইহা ইসলামী জীবনব্যবস্থারই একটি যুক্তিসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত। ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম হিসেবে সর্বকালীন উপযোগী জীবনব্যবস্থা। বলা হয়ে থাকে যে, 'ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের স্বভাবধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে এটা যেকোন যুগের উপযোগী এবং জীবনের যেকোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের স্বাভাবিক ধর্ম।[৫০]

এই সর্বকালীন জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম থেকে অনুঃসৃত নীতিবিদ্যাও তাই সর্বকালীন। সৈয়দ আমীর আলীও অনুরূপ মত প্রদান করেন।[৫১] ইসলামী নীতিবিদ্যার সাথে ইসলামী নীতি-শিক্ষাকে আলাদা করে দেখা দরকার। নীতিবিদ্যার কাজ হলো নৈতিকতার প্রকৃতি, মানদন্ড এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে পর্যালোচনা করা এবং এ সম্পর্কে গবেষণা করা। অন্যদিকে নীতিশিক্ষার মূল কাজ হলো নৈতিক চরিত্র গঠন করা এবং নৈতিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়া।[৫২]

কুরআন-হাদীসে তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থার পরতে পরতে নীতিশিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও কম-বেশি নীতিশিক্ষার কথা রয়েছে। কেননা, ধর্ম আবশ্যিকভাবেই নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ।[৫৩] যেকোন ধর্মীয় নীতিবিদ্যা বা ধর্মভিত্তিক নীতিবিদ্যার আলোচনায় তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের নীতিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য অনেকটা কমে আসে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই তা একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

---

৪৯. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩:২১), সূরা ৬৮-ক্বালাম, আয়াত-৪; আল-হাদীস, মিশকাত, বুখারী, আবু দাউদ।

৫০. আলম, ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৫১. আমীর আলী, স্যার সৈয়দ, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১০

৫২. আব্দুল মতীন, দর্শন সাহিত্য সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩

৫৩. দস্তগীর, গোলামঃ ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতা, দর্শন ও প্রগতি, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর-১৯৯০, গোবিন্দচন্দ্র দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৬৪। Miah Dr. Abdul Jalil, Islam and Cosmological Science, Islamic Foundation Bangladesh, First Edition, Dhaka, 1986, P.58 . যাই হোক ইসলামী নীতিবিদ্যা হলো ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ নৈতিকতা বিষয়ক সমস্যার যৌক্তিক আলোচনা। ইসলাম ধর্মের নীতি শিক্ষার ওপর ইসলামী নীতিবিদ্যা মুখ্যভাবে নির্ভরশীল হলেও দু'টি বিষয়কে এক করে দেখা সঙ্গত নয়।

ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস:

দার্শনিক নীতিবিদ্যার উৎস একান্তভাবে মানব মনন হলেও ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস একান্তভাবে মানব মনন নয়। সামগ্রিকভাবে ইসলামী ভাবধারই হচ্ছে ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস। ইসলামী ভাবধারা বা জীবনাদর্শের ওপর ভিত্তি করে যে নীতিতাত্ত্বিক আলোচনা তাই ইসলামী নীতিবিদ্যা। এখন প্রশ্ন হলো ইসলামী ভাবধারার উৎস কী? ইসলামী ভাবধারার প্রধান উৎস কুরআন ও হাদীস। তার সাথে আরও কিছু বিষয় ইসলামী ভাবধারা গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে তা হল: ইজমা, কিয়াস তথা ইজতেহাদ,[৫৪] ইসলামের পথে সত্যিকারে আত্মনিয়োগকারী মুমিন ব্যক্তির জীবনাচরণ ইত্যাদি। পবিত্র কুরআন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, কর্তব্য-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। ভালো কাজের উৎসাহ দেয়া এমনকি তার জন্য দুনিয়ায় ও আখিরাতে পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। তদ্রূপ মন্দ কাজের কঠোর শাস্তির বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: "পৃথিবীতে আমি তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তাদের কেউ কেউ সৎকর্ম করে ও কেউ কেউ অন্যরূপ। ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা ঘিরে আছে।"[৫৫]

কুরআনে ভালো কাজের জন্য উৎসাহ এবং পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: "যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ভালো এবং আরো কিছু। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই হবে বিহিশতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। যারা মন্দকাজ কারে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহর থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। তাদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[৫৬]

কোন্ কাজ ভালো, কোন্ কাজ মন্দ তার পর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। পবিত্র কুরআন কেবল ভালো-মন্দ বা নৈতিক-অনৈতিক কাজের পার্থক্যই করে না ; বরং একই সাথে এমন কথাও ঘোষণা দেয় যে, ইসলাম যাকে ভালো বলেছে অর্থাৎ আল্লাহ যাকে মানুষের জন্য ভালো বা উপযোগী জীবনাচার বলে চিহ্নিত করেছেন তাই মানবজাতির জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র সরল-সহজ, উত্তম ও কাম্য জীবনাদর্শ।

---

৫৪. পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পর ইসলামী জীবনব্যবস্থা বা ইসলামী ভাবধারার প্রধান দুটি ভিত্তি হলো ইজমা ও কিয়াস।

৫৫. আল-কুরআন, ৭ : ১৬৮

৫৬. আল-কুরআন, ১০ : ২৬ – ২৭

আল্লাহ ভালো-মন্দ সব পথ নির্দেশ প্রদান করেছেন কুরআনের মাধ্যমে। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলাম।[৫৭] আল্লাহ কুরআনের সত্যতার বিষয়ে মানুষকেও সন্দেহমুক্ত হতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, "এই সেই গ্রন্থ (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশিকা।[৫৮]

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ ভাল-মন্দ কাজের বিবরণ প্রদান করেছেন। ভালো-মন্দের মানদন্ড প্রদান করেছেন। নৈতিকতা বিষয়ক কাজের নীতি নির্ধারণ করেছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করার নিষেধ করেন।" তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মত হয়ো না যে সূতা মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার সূতা কাটা নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তো এ দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন।[৫৯]

পবিত্র কুরআন এভাবে ভালো-মন্দের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের দিক-নির্দেশনা ও রয়েছে পবিত্র কুরআনে। পবিত্র কুরআনের এ সকল দিক-নির্দেশনা থেকে পার্থিব জীবনের সকল কর্ম বা আচরণের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন, তার যৌক্তিক ও বাস্তব উপযোগিতা যাচাই করা ইসলামী নীতিবিদ্যার কাজ। পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের মান বিচারে এভাবে কুরআনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী নীতিবিদ্যা।[৬০]

ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। মহানবী (স.) হচ্ছেন মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শের সর্বোত্তম বাস্তব উদাহরণ। পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ (স.) মূলত আল্লাহ নির্দেশিত জীবনব্যবস্থার পূর্ণতাদানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ উত্তম মানবজীবনের যে চূড়ান্ত রূপ মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন মুহাম্মাদ (স.) হলেন তার একমাত্র পরিপূর্ণ উদাহরণ।[৬১]

---

৫৭. আল-কুরআন, ১৬:৮৯

৫৮. আল-কুরআন, ২ : ২

৫৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০ – ৯২

৬০. Abdul Latif, Dr. Syed, Principles of Islamic Culture, Good word Books, New Delhi, First Published 1961, Published by Good Word Books, 2002, P.47.

৬১. আলম, ড. রশীদুল, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮

তাই নৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনাও মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনাচরণ। ইসলামী নীতিবিদ্যায় মুহাম্মাদ (স.) এর বাণী, জীবন-কর্ম তথা আদর্শকে এক কথায় হাদীসকে নৈতিক জীবনের বাস্তব মানদন্ড হিসেবে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনাচরণ নির্দেশনাবলীকে স্বয়ং আল্লাহ পাকেরই দিক-নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের খেয়াল-খুশিমত কিছুই বলেন না, তিনি তাই বলেন, যা ওহীরূপে প্রদত্ত হন।[৬২]

ইসলাম ধর্ম অনুসারে বিশ্বাস করা হয় যে, মুহাম্মাদ (স.) এর জীবন আদর্শ, আচার-আচরণই মানবজাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর একমাত্র পূণাঙ্গ পথনির্দেশ। একেই বলে হাদীস। যে কোন কর্ম বা আচরণের মান নির্ধারনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভালো না মন্দ তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাসূল (স.) এর আদর্শকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এমন বিশ্বাস করা যায় যে, রাসূল (স.) যা করেন বা করতে বলেন তা নিশ্চয়ই কুরআন এর শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলাও তেমনটা কামনা করেন। মুহাম্মাদ (স.) কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্য নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা হিসেবে দাঁড় করবেন বলে নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী জীবনেও তিনি ছিলেন সৎ চরিত্রবান, বিশ্বাসী এবং মানব কল্যাণের প্রতি আগ্রহী।[৬৩]

ইসলামী নীতিবিদ্যা রাসূল (স.) এর জীবনাদর্শ অর্থাৎ হাদীসকে নৈতিকতার উৎস মনে করলেও হাদীসের উৎস মনে করলেও হাদীসের বাস্তব কাযকারিতা বা সমাজে তার ফল কতটা শুভ তাও বিচার করে থাকে। তবে ইসলামী নীতিবিদ্যায় মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, রাসূল (স.) এর নীতি আদর্শ মানবজাতির জন্য, মানবসমাজের জন্য কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। কিন্তু কোথায় কিভাবে তা শুভ ফলদায়ক সে বিষয়ে গবেষণা করা ইসলামী নীতিবিদ্যার কাজ।

কুরআন হাদীসের পর ইসলামী নীতিবিদ্যার অন্যতম উৎস হচ্ছে 'ইজমা'। ইজমা অর্থ হলো ঐক্যমত্য।[৬৪] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমাদের সম্মুখে মীমাংসার জন্য কোন সমস্যা উপস্থিত হলে কুরআন অনুসারে তা সমাধান করবে, কুরআনে এর ইঙ্গিত খুঁজে না পেলে হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিবে, হাদীসেও খুঁজে পাওয়া না গেলে ইজমার ওপরে নির্ভর করবে।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (স.) এর মৃত্যুর মাধ্যমে আসমানী কিতাব এবং নবী-রাসূলের প্রেরণের প্রক্রিয়াটি আল্লাহ কর্তৃক সমাপ্ত হয়।

---

৬২. আল-কুরআন, সূরা নাজম।

৬৩. হোছাইন, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ তফাজ্জল, সম্পাদনায়-হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা, হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ১৯৯৯-২০০১

৬৪. ইজমা: ইজমা হচ্ছে ইসলামী কানূন বা বিধানের তৃতীয় উৎস। ইজমা শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐক্যমত ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ঐক্যমত। আলম, ড. রশীদুল, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯২

৬৫. ঢালী, ড. আব্দুল হাই, মুসলিম দর্শন-১৫

তাই নবী মুহাম্মাদ (স.) এর মৃত্যুর পরে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি যে কোন সমস্যা বা আচার আচরণের মান জানা মানবজাতির জন্য অসম্ভব হয়ে গেল। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি বর্ণনা রয়েছে সে সকল বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় বা নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক সমাধান না পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু-ই নয়। এসকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের অর্থাৎ কুরআন হাদীসের বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন কাজের মান বিচার করা যাবে। একেই বলে ইজমা। অধিকাংশ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বা কুরআন-হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ যে ফায়সালা প্রদান করবেন তা-ই ইসলাম সম্মত বলে ধরে নেয়া যাবে। ইজমার মাধ্যমে কোন কাজের নৈতিক মান বিচারের বিষয়টি সরাসরি দার্শনিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। অন্যভাবে বলা যায় ইজমা এক ধরনের ইসলামী দর্শন।[৬৬] তাই নৈতিকতার ক্ষেত্রে বা ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, দায়িত্ব-কর্তব্যের ক্ষেত্রে ইজমার সিদ্ধান্ত মূলত ইসলামী নীতিবিদ্যারই সিদ্ধান্ত। এখানে ইজমার ক্ষেত্রটি ইসলামী নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রটির চেয়ে বেশি প্রসারিত। অর্থাৎ ইজমা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইজমার মধ্যে যে অংশটি নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত সেই অংশটি ইসলামী নীতিবিদ্যার সাথে একাত্ম। তাই দেখা যায়, ইসলামী নীতিবিদ্যার একটি প্রধান উৎস হচ্ছে ইজমা এবং ইজমার একটি অংশ ইসলামী নীতিবিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইজমার পরে ইসলামী নীতিবিদ্যার উল্লেখযোগ্য উৎস হচ্ছে ‘কিয়াস’। কিয়াস অর্থ, সাদৃশ্যমূলক অনুমান। যদি কুরআন-হাদীসে সরাসরি কোন বিষয়ে নির্দেশনা না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে এমন যদি কোন ঘটনা পাওয়া যায় যে ঘটনা বা বিষয়ের সাথে পরিস্থিতির সাদৃশ্য রয়েছে তাহলে এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অবস্থা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দুনিয়ার জীবনের সকল বিষয়েরই পর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তবে সেই দিক-নির্দেশনা কখনও বা কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে আবার কোন বিষয় সম্পর্কে পরোক্ষভাবে, যৌক্তিক পরিণতি বা আবশ্যিকতা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ হয়তো কোন কাজের ভাল-মন্দ বিষয়ে বণী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে কোন বাণী নাযিল করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ সেই ধরণের হতে পারে। সেই সকল ক্ষেত্রে সকল মানবজাতির কথা বলে ইসলামে সরাসরি নির্দেশ না থাকলেও বণী ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন তাকেই আমরা আমাদের বিধান বলে মানতে পারি। এমনটি করাই হলো কিয়াস। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি নৈতিক বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন দিক নির্দেশনা দ্বারা ইসলামী নীতিবিদ্যা বা ইসলামভিত্তিক নৈতিক আলোচনা গড়ে উঠতে পারে।

---

৬৬. ইজমা হচ্ছে ইসলামী কানূন বা বিধানের তৃতীয় উৎস। ইজমা শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐক্যমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আলেমদের মধ্যে এক্যমত। আলম. ড. রশীদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯২

ইসলামী নীতিবিদ্যার আরেকটি উৎস হচ্ছে 'ইজতিহাদ'। ইজতিহাদ অর্থ গবেষণা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে গবেষণা করার প্রতি মানুষকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা ভালো তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।[৬৭]

এখানে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বোধশক্তিসম্পন্ন বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুঝে শুনে ভালো বা কল্যাণকর যা তা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যারা গভীর মনোযোগ বা আন্তরিকতাসহ কোন বিষয় গবেষণা করে বা সত্য উদঘাটনের জন্য বুঝতে চেষ্টা করে এবং বিচার বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত ভালো বা কল্যাণকর মনে হয় এমন কিছুকে গ্রহণ করে তারাই সফলকাম, তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই দেখা যায় আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ভালো-মন্দ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট বক্তব্য বা সুনির্দিষ্ট বাণী প্রদান করলেও বাকী বিষয়গুলোকে মানুষের বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত বিচার ক্ষমতা দিয়ে যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ করে ভালো-মন্দের পার্থক্য করে যা ভালো বা কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে বলেছেন।

অন্যদিকে হাদিসেও মানুষকে গবেষণা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: "গবেষণা ভুল হলে ও পূণ্য মিলবে। আর সঠিক হলে দ্বিগুণ পূণ্য মিলবে।"[৬৮]

অর্থাৎ ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি গবেষণা বা ইজতিহাদ করা হয় মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে যদি তার ফল সঠিক নাও হয় তাহলেও তার জন্য সওয়াব হবে বা পুরস্কার মিলবে। আর সফল হলে দুটি সওয়াব, একটি গবেষণা করার আর অন্যটি সত্য উদঘাটন ও সম্প্রসারণের জন্য। ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ, ন্যায়-অন্যায়, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নে কুরআন-হাদীস থেকে বা ইজমা ও কিয়াস থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে বা নৈতিক ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে ইসলামী নীতিবিদ্যা গড়ে উঠতে পারে। তবে সেই স্বাধীন গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এই মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

কোন মু'মিন ব্যক্তির জীবনাচারও ইসলামী নীতিবিদ্যার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলমান ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাপন ইসলামী নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার মান নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন মুসলমানের জন্য তাই অন্য কোন মানবরচিত বিধানের দরকার হয় না। [৬৯]

---

৬৭. আল-কুরআন, ৩৯:১৭

৬৮. আল-হাদীস, বুখারী, ইসমাইলুল বুখারী, সহীহ বুখারী।

৬৯. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ঃ

পাশ্চাত্য বা সাধারণ নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচি ও ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচির মধ্যে বিষয়গত তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ নীতিবিদ্যা বা দার্শনিক নীতিবিদ্যার মত ইসলামী নীতিবিদ্যাও পার্থিব জীবনের মানবাচরণকে নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করে। তবে অন্যান্য নীতিতত্ত্বে পার্থিব জীবন সম্পর্কে বা এই জীবনের নৈতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরণের মত পাওয়া যায় তা থেকে ইসলামী নীতিবিদ্যার মত একটু বিশেষ প্রকৃতির।

ইসলামের মতে মানবজীবন একটি সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। পার্থিব জীবনেরও পূর্বে এর শুরু আবার অপার্থিব মরণোত্তর অনন্ত জীবনে তা চলে যাবে বলে স্বীকার করা হয়। এই হিসাবে ইসলামী নীতিবিদ্যা মানবজীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করে। তা হল, এক, বিশুদ্ধ রূহের জীবন, দুই, পার্থিব জীবন; এবং তিন, পরকালীন অনন্ত জীবন।[৭০] ইসলাম ধর্ম অনুসারে আল্লাহ রাবক্ষুল আলামীন সকল আত্মাকেই একই সাথে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ এই সকল আত্মাকে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে ‘আলমে আরওয়াহ’ বা রূহের জগতে সংরক্ষণ করেন। সেই জগতের সকল রূহই আল্লাহর প্রভূত্ব স্বীকার করে।[৭১] এরপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানব-মানবীর বিশেষ মিলনের মধ্য দিয়েই মাতৃগর্ভে সেই আত্মাকে প্রেরণ করেন এবং বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় তাকে সেখানে লালন করে পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তানরূপে দুনিয়ায় পাঠান। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মাতৃগর্ভে সন্তান মায়ের শরীর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ হবার পরে আল্লাহর অনুগ্রহে মাতৃদুগ্ধ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন খাবার খেয়ে দুনিয়ার আলো বাতাসে মানব শিশুর দেহ বিকশিত হয়। আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে তাকে দৈহিক শক্তির সাথে সাথে মানসিক শক্তি তথা বিচার-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা দান করেন, ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা প্রদান করেন।

একপর্যায়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ ঘোষণা করেন, “প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”[৭২]

কিন্তু এই মৃত্যুই মানুষের জীবন পরিক্রমার পরিসমাপ্তি নয়। এটা পার্থিব জীবনের সমাপ্তি এবং মরণোত্তর অনন্ত জীবনের সূচনাকারী একটি ঘটনা।ইসলামী নীতিবিদ্যার কাজ হচ্ছে এই তিন জীবনের মধ্যবর্তী জীবন বা মধ্যবর্তী স্তর নিয়ে। কেননা, বিশুদ্ধ আত্মার জীবনে মানুষের কর্ম নির্বাচনের বা কর্ম করার সামর্থ্য থাকে না। আর মরণোত্তর জীবনে মানুষের কোন কাজই হিসেবের মধ্যে নয়। কারণ সেই জীবন হবে বিচারের জীবন। একমাত্র পার্থিব জীবনই হল মানুষের কর্মের মূল্যায়নের সময়। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের কর্ম ও আচরণের নৈতিক মান বিচার

---

৭০. ইউনূস, আ.খ.ম, মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৩৫–৩৬

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৭২. আল-কুরআন, ৩:১৮৫

করা হবে। এই জীবনে ভাল কাজ করলে মরণোত্তর জীবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সেখানে ভালো থাকা যাবে। আবার এই পার্থিব জীবনে মন্দকাজ বা পাপকাজ করলে মরণোত্তর জীবনে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড, আচরণ নিয়েই ইসলামী নীতিবিদ্যা আলোচনা করে থাকে। পার্থিব জীবনে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।[৭৩]

আর এ স্বাধীনতা হচ্ছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। বহু বিকল্প উপায়ের মধ্য হতে মানুষ যেকোন একটাকে বেছে নিতে পারে। ইচ্ছা কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করে তার সাথে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো-মন্দ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার কাছে সতর্ককারী পাঠানো হয়নি।[৭৪] আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য বোঝানোর জন্য, ভালো-মন্দ বোঝানোর জন্য, সরল পথ দেখানোর জন্য বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ভালো কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ হতে ফিরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এসবের পর আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে ভালো কাজ, ভালো আচরণ দাবি করেন। তাই পার্থিব জীবন হলো ভালো-মন্দ কাজের স্থান। এই জীবনই তাই ইসলামী নীতিবিদ্যার ক্ষেত্র। এই জীবনের কর্ম আচরণই নৈতিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে ইসলামী নীতিবিদ্যা।

পার্থিব জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত ও চলতে পারি না। বিশ্বজগতের সব কিছুকেই আল্লাহ রাবক্ষুল আলামীন মানুষের উপকারের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তাআলা জগতের অন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালা বলেন, "তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা থেকে জন্মান খাদ্যশস্য, যায়তুন, খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তারই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।[৭৫] কেবল পার্থিব জীবনের জন্যই নয় পারলৌকিক জীবনের জন্যও আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য রেখেছেন এমন সব উপহার যা কোন চোখ অবলোকন করেনি, কোন কান তা শোনেনি।[৭৬]

---

৭৩. ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে মুসলিম দর্শনে বিশেষ করে ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে স্বীকার করে নিতে হয়। ইমাম গাযযালী প্রথম দার্শনিক শরীয়াত এবং দার্শনিক যুক্তি সহকারে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে প্রমাণের প্রয়াস নিয়েছেন।

৭৪. শাহ্জাহান, মুহাম্মাদ, আল-গাযযালীর দর্শন, প্রকাশক, ফারহাত তাসনীম, রাজশাহী, জুন-২০০০, পৃ. ৭০-৭১

৭৫. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪

৭৬. আল-কুরআন, ১৬:১০ – ১৮

এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনে মানুষের থেকে ভাল কাজ চেয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে মানুষ কতটুকু কম-বেশি করল তার উপরে ভিত্তি করেই মানুষকে মূল্যায়ন করবেন আল্লাহ রাবব্বুল আলামীন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। আল্লাহ নির্দেশিত জীবনবিধান তথা ইসলাম অনুসারে ভালো-মন্দের দিক-নির্দেশনা বা তার তাত্ত্বিক রূপরেখা প্রণয়ন করাই ইসলামী নীতিবিদ্যার মূল কাজ।

ইসলামী নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু তাই মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকান্ড বা আচরণ। অপার্থিব জীবন বা ঐ জাতীয় জীবনের কর্মকান্ড ইসলামী নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত নয়।

ইসলামী নীতিবিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের নৈতিক মান বিচার করে। অনৈচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক আচরণ নৈতিক বিচারে আনার নয় বলে সাধারণ নীতিবিদ্যার মত ইসলামী নীতিবিদ্যাও মনে করে। ইসলামী নীতিবিদ্যা নৈতিক বিচারের স্বীকার্য সত্য হিসেবে ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। ইসলামী ভাবধারা অনুসারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে।[৭৭] আল্লাহ মানুষকে এই ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষকে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা অর্থাৎ কর্মক্ষমতার স্বাধীনতা না দেয়া হলেও কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে, চেষ্টার ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। তাই মানুষের প্রত্যেকটি স্বাধীন কর্ম ও আচরণ দায়িত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মকে নৈতিক দায়ের পর্যায়ে ফেলা যায়।

ইসলামী নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের নৈতিক মান বিচার করতে গিয়ে নৈতিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন শব্দ ও ধারণার তাৎপর্য এবং তার ভিত্তি সম্পর্কেও আলোকপাত করে। এদিক থেকে ইসলামী নীতিবিদ্যা প্রচলিত পরা-নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তুকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়াই সব ধরণের নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আলোচনার পূর্বে ক্রিয়া কাকে বলে, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সাথে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য কি, ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া, কামনা, বাসনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, আচরণ, চরিত্র ইত্যাদি বিষয় তথা ক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব নিয়েও ইসলামী নীতিবিদ্যা আলোচনা করতে পারে। ইসলাম অনুসারে এগুলোকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং তার নৈতিক তাৎপর্য খুঁজে বের করা হলো ইসলামী নীতিবিদ্যার দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

নৈতিক অবধারণ এবং ঘটনা সম্পর্কিত অবধারণের প্রকৃতি ও পার্থক্য নির্দেশ, নৈতিক অবধারণের কর্তা, বিষয়বস্তু, যৌক্তিকতা ইত্যাদি নির্ধারণের কাজও ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

নীতিবিদ্যার আদর্শনিষ্ঠ শাখার প্রধান কাজ হলো নৈতিকতার মানদন্ড নির্ণয় করা।[৭৮] ভালো-মন্দের মানদন্ড বা মাপকাঠি কী, কি রকম আচরণকে ভালো এবং কি রকম আচরণকে মন্দ

---

৭৭. Averroes, Tahafutal Tahafut, Translated (from the Arabic) by Simon Van Den Bergh, Printed at the University Press, Oxford, Published by Messrs, Luzac and Co London, 1955, P- 361

৭৮. আল-কুরআন-৬৫:৭; সূরা ৯০:৮-১০; ১৬:১৫, ২১:৪৭, ২২:১০, ১০:৪৪, ইত্যাদি বাণীতে ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।

বলা হবে তার মানদন্ড নির্ধারণ করা অন্যান্য নীতিবিদ্যার মত ইসলামী নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ। আমরা জানি, নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য নীতিবিদ্যার মত ইসলামী নীতিবিদ্যা ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক, সমাজে ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ, নৈতিক প্রগতি, সমাজের মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক প্রথা-প্রচলন, ইত্যাদির সাথে সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বা ব্যক্তির জীবনে এসবের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা চলে। এগুলোর ইসলামভিত্তিক নৈতিক পর্যালোচনা ইসলামী নীতিবিদ্যার কাজ।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে কেবল তত্ত্ব প্রদান নয়, বরং তত্ত্বের প্রয়োগ বা ব্যবহারিক জীবনে এর ফল বা প্রায়োগিক তাৎপর্য কি, বিশেষ আচরণের মান বিচারের ক্ষেত্রে কি নীতি অবলম্বন করা যায় তা নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা নামক নীতিবিদ্যার একটি সাম্প্রতিক শাখা।[৮০] ইসলামী নীতিবিদ্যার আলোচনায় এই প্রায়োগিক দিকগুলোও অন্তর্ভূক্ত। ব্যক্তিজীবনের বহুমুখি কর্মকান্ডের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে ইসলামভিত্তিক নৈতিক সমাধান দেওয়া সম্ভব। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই জীবন বিধানবিধান অনুসারে ব্যবসা-বানিজ্য,আয়-ব্যয়,পরিবার-সমাজের বিভিন্ন বিষয়াদি রাষ্ট্র পরিচালনা, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সর্বাবিধ বিষয় ইসলামের বিধানভুক্ত।[৮১] ইসলামী বিধান ধারা মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ কর্ম তথা ব্যবহারিক জীবনের বহুমুখী কর্মকান্ডের নৈতিক সমাধানদেওয়া সম্ভব। ইসলামী নীতিবিদ্যা তাই প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার বিষয়াবলিকেও তার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ নীতিবিদ্যায় (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) যে সকল আলোচনার ক্ষেত্র বিদ্যমান ইসলামী নীতিবিদ্যায়ও তার সব আলোচনা অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখ্য যে, নীতিবিদ্যা ও নীতিশিক্ষা এক বিষয় নয়। নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানবাচরণের একটি পদ্ধতিত্ত্ব (methodology)।[৮২] অন্যদিকে নীতিশিক্ষা হচ্ছে নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে নির্দেশনা।[৮৩] প্রথমটি আলোচনা সাপেক্ষ বা পর্যালোচনাধর্মী, দ্বিতীয়টি শিক্ষণীয়। নীতিবিদ্যার কাজ মানবাচরণ নিয়ে পর্যালোচনা করা, মূল্যায়ণ করা। অন্যদিকে নীতিশিক্ষার কাজ হলো নৈতিক বা ভালো আচরণ শিক্ষা দেয়া। ইসলামী নীতিবিদ্যা ইসলাম অনুসরণে মানবাচরণের পদ্ধতিতত্ত্ব কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামী নীতিশিক্ষার সাথে এটা মূলত সম্পর্কিত হলেও ইসলামী নীতিশিক্ষাকে বিচারমূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাত্ত্বিকরূপ প্রদান করাই হলো ইসলামী নীতিবিদ্যা। ইসলামের প্রধান ভিত্তি কুরআনে মানবাচরণের যথার্থতা সম্পর্কে ব্যাপক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও দেয়া হয়েছে নৈতিক শিক্ষামূলক দিক-নির্দেশনা।[৮৪] তাছাড়া হাদিসের মাধ্যমেও নীতিশিক্ষা পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান বলা যায়। কিন্তু ইসলামী নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা একটি দার্শনিক আকার সমৃদ্ধ (Philosophical Framework) বিষয় বা দার্শনিকিকরণ।

---

৭৯. আব্দুল খালেক, এ. এস. এম. *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃ.২১

৮০. Lillie, William, *An introduction to Ethics*, Allied Publishers Limited, First Indian Edition 1967, Reprinted 1990, PP-1-2.

৮১. আব্দুল খালেক, এ. এস. এম., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৮২. Maqsood, Ruqaiyyah Waris, *Living Islam*: Treading the Path of the Ideal, Goodword Books, New Delhi, First Published, 1998, Reprinted, 2002, P.7.

৮৩. পদ্ধতি (method) অর্থ কোন কিছু করার উপায় বা প্রক্রিয়া। আর এই উপায় বা প্রক্রিয়া কেমন হবে তার দার্শনিক আলোচনা হলো পদ্ধতিতত্ত্ব। খান, খালিদ আহসান, *বিজ্ঞানের দর্শন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১২

৮৪. আব্দুল মতীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

ইসলামী নীতিবিদ্যা ও আধুনিক নীতিবিদ্যা:

উপরোক্ত আলোচনায় নীতিবিদ্যার যে রূপরেখা প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে লক্ষণীয় যে, এটা একটি ধর্মনির্ভর নীতিবিদ্যা। সাধারণ নীতিবিদ্যা বলতে আমরা দার্শনিক নীতিবিদ্যা তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবিদ্যাকে বুঝি। যাই হোক সে উভয় নীতিবিদ্যার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

সাদৃশ্য:

এক: ইসলামী নীতিবিদ্যা এবং পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা উভয়ের লক্ষ্য মোটামুটিভাবে অভিন্ন।

দুই: উভয়েরই বিষয়বস্তু অভিন্ন অর্থাৎ পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ইসলামী নীতিবিদ্যাও সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে বা করার সামর্থ্য রাখে।

তিন: উভয়ের সাথে দর্শনের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ উভয় নীতিবিদ্যাই যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

চার: উভয় নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক দিক এবং প্রায়োগিক দিক রয়েছে।

বৈসাদৃশ্য: ইসলামী নীতিবিদ্যা ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার মধ্যে উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলো থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

এক: ইসলামী নীতিবিদ্যা একাধারে ধর্মভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক (দার্শনিক); পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা একান্তভাবে দার্শনিক বা যুক্তিনির্ভর।

দুই: ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় ইসলামী নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্তসমূহ অকাট্য, কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্তসমূহ কম-বেশি বিতর্কিত।

তিন: ইসলামী নীতিবিদ্যার ধারণাসমূহ সমাজভেদে পৃথক হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার প্রায়োগিকতা সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

চার: ইসলামী নীতিবিদ্যায় পাপ এবং মন্দ, পুণ্য এবং ভালোকে এক করে ভাবা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় পাপ-পুণ্যের ধারণা অপ্রাসঙ্গিক।

পাঁচ: ইসলামী নীতিবিদ্যা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয় দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা মূলত ইহলৌকিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়।

ছয়: নৈতিকার স্বীকার্য সত্য হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরত্ব মেনে নেওয়া ইসলামী নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে তা আবশ্যক নয়।

একথা স্বীকার্য যে, নীতিবিদ্যার সাথে বা নৈতিকতার সাথে ধর্মের কোন অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।[৮৫] নীতিবিদ্যা একটি স্ব শাসিত বিষয়।[৮৬] কিন্তু ধর্মে নৈতিকতার কথা নেই বা ধর্ম বিশ্বাসী হলে নৈতিক হওয়া যাবে না কিংবা ধর্মীয় নীতি আদর্শ মেনে নিলে নীতিবিদ্যা সম্ভব হবে না-এমন কথা মেনে নেয়া যায় না। বরং ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পৃথিবীর প্রচলিত সব কটি ধর্মই নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।[৮৭] ইসলাম ধর্মে নৈতিকতার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরও মানুষের নৈতিক আচরণের মান বিচার তথা ভালো-মন্দের মান নির্ধারণের জন্য মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা গবেষণা করারও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাই ইসলামী নীতিবিদ্যা অসম্ভব হতে পারে না; বরং এই নীতির্বিদ্যার আলোচনা ও অনুশীলন সকল মানুষের জন্য পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সর্বোত্তম কল্যাণের বার্তা বাহক।

---

৮৫. দস্তগীর, গোলাম, ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতা, দর্শন ও প্রগতি, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ. ৬৪

৮৬. উবায়দুর রহমান, আ. ফ. ম., নীতিবিদ্যা, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. ২৯

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব

ইসলাম ও মানব জীবন:

ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি আররি 'সলম' শব্দমূল হতে। 'সলম' মানে শান্তি, উৎসর্গ, আত্মসমর্পণ। এ আত্মসমর্পণ কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহর ইচ্ছা ও আদর্শের কাছে। ইসলামি মতে, পরম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের নিজেকে বিলিয়ে দেয়া এবং সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপক কল্যাণের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, কোন একটি মহান আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন এবং সেই লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ না করলে কখনও প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না। শান্তির ইচ্ছা ও অন্বেষা মানব প্রকৃতিরই এক সহজাত আবেদন। আর এ দিক থেকে মানুষমাত্রই ইসলাম বা শান্তি চায়। সুখ, শান্তি, আনন্দ, কল্যাণ–এ সবই একই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। তবে যদিও সবাই শান্তি চায়, তবু একথা মানতেই হবে যে, বৃহত্তর সমাজকে বাদ দিয়ে কেবল ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি কোনো মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। ফলে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে সামাজিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতির ব্যাপারটি। ইসলামি মতে, ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের আপামর জনগণের বস্তুগত চাহিদা ও মানবিক মর্যাদা সুরক্ষায় প্রয়াসী হওয়া প্রতিটি সচেতন মানুষের তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। অন্য কথায়, ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বিবাদমান বৃত্তি ও শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান এবং ব্যক্তির সংকীর্ণ চাহিদা ও দাবির সঙ্গে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির যথার্থ সমন্বয় সাধনের মধ্যেই প্রকৃত শান্তি। আর ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য এই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মনে প্রাণে কাজ করার অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টাই প্রকৃত ইসলাম।[১]

ইসলাম অনুসারে মানুষ সৃষ্টির সেরা[২] এবং মানবজীবন কিছু মহৎ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এসব আদর্শ অনুসারে কাজ করা এবং এগুলো রূপায়নের প্রচেষ্টাই একজন প্রকৃত মুসলমানের ধর্মকর্ম। তবে একাজ খুব সহজ নয়, কারণ সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহ্‌র পার্থিব প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মধ্যে যেমন আছে প্রজ্ঞা ও বিবেক জাতীয় কিছু, তেমনি আছে কাম-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি বেশ কিছু জৈব প্রবৃত্তি বা রিপু। যে ব্যক্তির জীবন যুক্তি-বিচার দ্বারা চালিত, যিনি অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে হার মানেন না, তিনিই যথার্থ মানবিক মর্যাদার অধিকারী, তিনিই প্রকৃতপক্ষে মানুষ। তিনি যুক্তিহীন প্রবৃত্তি প্রবণতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে সমর্পণ করেন তাঁর সেই উচ্চতর অহমের (ego) কাছে যাকে কিনা কুরআন বর্ণনা করেছে দিব্য বা স্বর্গীয় বলে। উল্লেখ্য যে, কোরআন অনুসারে আল্লাহ্‌ আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন তার নিজের আদলে এবং তাঁর (আদমের) অন্তরাত্মায় প্রতিস্থাপন করেছেন তার নিজের জাত (spirit)। তাই যদি হয়, তাহলে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ মানে কোনো বহিঃশক্তির কাছে নয়, বরং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মানুষের নিজের সেই স্বভাবের কাছে আত্মনিবেদন, যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে অভিষিক্ত করেছেন।

---

১. ডক্টর আমিনুল ইসলাম, নীতিবিজ্ঞান ও মানব জীবন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২,পৃ.১৬৩

২. আল-কুরআন, ৯৫:৪

কুরআন বলে, "যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করেন আর আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন, তাঁরা সব রকমের ভয়-ভীতি ও দুঃখ-ক্লেশ হতে মুক্ত।[৩] সুতরাং প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিৎ অন্ধ প্রবৃত্তিকে উচ্চতর মানবিক গুণাবলিতে বদলে দিয়ে তার গোটা ব্যক্তিত্বকে সংযত, সংহত এবং আদর্শনিষ্ঠ করা ও নিজেকে আল্লাহর কাছে সর্বতোভাবে সমর্পণ করা। যথার্থ ধর্মের মূল কাজটাই হলো ধার্মিক ব্যক্তিকে এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মের ও কিছু কিছু নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান আছে; কিন্তু সেগুলো মুখ্য নয়, বরং চূড়ান্ত নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক উপাদান মাত্র। ইসলামে বিশ্বাস কোনো বিশেষ ধর্মানুশাসনের (dogma) প্রতি নিছক সম্মতি নয়, বরং সৎকাজের প্রতি আকর্ষণ। এ প্রসঙ্গে কোরআন

বলে, আচার-আচরণ ও প্রথা-প্রচলনের দিক থেকে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় বিভিন্ন পথে চলে বটে, কিন্তু এগুলো ধর্মের বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার হলো ভাল কাজ করা। মুসলমানদের যখন নামাজ আদায়ের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাতে বলা হয় তখন তাদের স্পষ্ট করে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে,এটাই ধার্মিকতার একমাত্র লক্ষণ বা উপাদান নয়। কারণ, "পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকই আল্লাহ্‌র। যে দিকেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তার মুখ ফেরাবে, সে দিকেই আল্লাহ্‌ হাজির থাকবেন।"[৪]

মোট কথা, ইসলাম কেবল কিছু ব্যাপক নীতি জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এমন একটি সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা কায়েমের ওপর জোর দিয়েছে, যা কিনা মুসলমানগণ তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে রূপায়ন করতে সক্ষম। এ বিবেচনায়ই ইসলামকে অভিহিত করা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (complete code of life) হিসেবে। ইসলাম জীবনের বাস্তবতার ওপর জোর দেয় এবং সদগুণ (virtue), প্রজ্ঞা (reason) ও সদাচরণের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক ও সফল করার পরামর্শ দেয়। ইসলামী মতে, যে বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম ও আচরণের কোন যোগ নেই, যা নিতান্তই তত্ত্বকথা, তা আধ্যাত্মিক বিচারে মূল্যহীন।

জার্মান দার্শনিক নীটশে (১৮৪৪-১৯০০) দু'রকম ধর্মের কথা বলেছিলেন। এসব ধর্মের কিছু জীবনমুখী এবং ইতিবাচক আর বাদবাকিগুলো জীবনবিমুখ ও নেতিবাচক। এটাই যদি ধর্মের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি হয়ে থাকে, তাহলে একথা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, ইসলাম জীবনবিমুখ কোন নেতিবাচক ধর্ম নয়, বরং পুরোপুরি জীবনকেন্দ্রিক ও ইতিবাচক। কারণ, ইসলামি মতে, মানবজীবনকে সঠিকভাবে যাপন ও উপভোগ করা যায় এমন কিছু সংযম ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের মাধ্যমে, যেগুলো কিনা পুরোপুরি স্বাভাবিক ও যৌক্তিক, এবং যেগুলোকে

---

৩. আল-কুরআন, ২:১১২

৪. আল-কুরআন, ২:১১৫

খোদ আল্লাহ্‌ তায়ালা অনুমোদন ও আরোপ করেছেন।[৫] ইসলাম মুসলমানদের সবরকমের উগ্রতা পরিহারের এবং জীবনের সর্বত্র মধ্যপথ অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছে। উদাহরণত, ইসলাম মানুষকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ, পার্থিব ও পারলৌকিক কাজকর্মের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপের পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, পার্থিব জীবন কোনো অবাস্তব স্বপ্নবিলাস নয়, বরং পারলৌকিক জীবনেরই প্রারম্ভিক প্রস্তুতিপর্বস্বরূপ। সুতরাং আমরা যদি পরলোক বা আখেরাতে ভাল স্থান পেতে চাই, তাহলে এ জগতেই আমাদের খুঁজতে হবে কল্যাণের পথ। যাপন করতে হবে সৎ ও মহৎ জীবন।

অনুরূপভাবে অধ্যাত্ম (spirit) ও জড়বস্তু (matter) এ দু'য়ের মধ্যেও তীক্ষ্ণ ধরাবাঁধা ভেদরেখা টানার প্রয়োজন নেই। কারণ, এরা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একই বৃহৎ সত্তার দুটি দিকমাত্র।[৬] বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আবুল হাশিমের মতে, "আজকাল বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, প্রকৃত ইসলাম ঠিক তাই। একটি বৈজ্ঞানিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কার্যকর রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে। ইসলাম মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে, তার সঙ্গে একটি নৈতিক জীবনাদর্শ জড়িত। উদারনীতির নামে ইসলাম মানুষকে কোনো একপেশে কিংবা উগ্রজীবনাচরণ অনুশীলনের পরামর্শ দেয় না; ইসলাম মানবজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে চায় কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে।[৭] কোরআনে তাই মানুষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে: "যারা পৃথিবীতে অনিষ্ট করে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করে।"[৮] ঠিক একথারই প্রতিধক্ষনি শোনা যায় একটি হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে, "একজন প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণ নিছক শাস্ত্রানুগত্য নয় বরং বাস্তব কর্ম ও আচরণ। মানুষের গুণাগুণের বিচার ও মূল্যায়ন করা হয় তাদের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক আচার-আচরণের আলোকে।

ইসলামি মতে, এ জগত একটি উদ্দেশ্যের রাজত্ব। জগত সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ্‌র যে মূল উদ্দেশ্য কার্যকর, সেটি হলো ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে সুন্দর ও সুষমামন্ডিত করা। মানুষের যেসব কর্ম ও আচরণ পরম স্রস্টা আল্লাহর এ উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক সেগুলো যথোচিত, এবং যেগুলো এর প্রতিকূল সেগুলো অনুচিত। এটি কোরআনের একটি প্রধান নৈতিক শিক্ষা। এটিই মুসলমানদের ওপর কলেমার নৈতিক প্রভাব। কলেমার নৈতিক ব্যঞ্জনা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এজন্যই এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও অনুশীলন করে অতীতে একসময় মুসলমানরা সব মহলের স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিল একটি মহান জাতি হিসেবে। আবুল হাশিমের ভাষায়, " আইন যেখানে ব্যর্থ হলো, গণসতর্কতা ও নিন্দা

---

৫. K.A Hakim, Islamic Ideology, third edition, 4th impression (Lahore 1980) introduction.

৬. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স (ঢাকা ১৯৯৯) পৃ. ৩৬১-৩৬২।

৭. Abul Hashim, The Creed of Islam. The Revolationary carrector of Kalima, IFB, Dhaka, 1987, P.11

৮. আল-কুরআন , ২: ২৭

যেখানে ব্যর্থ হলো এবং অনিন্ডিত অতীন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষ যেখানে ব্যর্থ হলো, সেখানেই সফল হলো কলেমা।"[৯] কলেমার এই মূল্য ও কার্যকারিতা কোনো সাময়িক ব্যাপার নয়; কলেমার আবেদন চিরন্তন ও শাশ্বত। তাই অতীতের আরবের মরুভূমিতে কলেমা যেমন সাফল্যের সঙ্গে অনুপ্রাণিত করেছিল বেদুঈন আরবদেরকে এবং সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল তাদের নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধকে, ভবিষ্যতেও সেই কলেমা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষকে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থাঃ

ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য হলো মানুষকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও ন্যায়নীতির দিক নিদর্শনা দেয়া। আর মুসলিম শাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয় সেই মহৎ মানবিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে। ফলে ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পায় ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকার। যেমন মুসলমানদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয় উগ্র পুঁজিবাদ ও নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্যবাদ পরিহার করে এমন এক ভারসাম্যময় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য, যা কিনা সমাজ ও রাষ্ট্রের সব সদস্যকে সমান বলে গ্রহণ করবে এবং কাউকে শোষণ-পীড়নের সুযোগ দিবে না। বাধ্যতামূলক যাকাতের বিধান এবং সুদপ্রথা বাতিল –এ দুটি ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্যই হলো এ ধরণের স্বার্থপর অভিসন্ধি ও পরিকল্পনা ব্যর্থ করা এবং তাতে করে সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি নিশ্চিত করা।

শুধু তাই নয়, ইসলামী আইনে নারীসমাজের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং নারী পুরুষের সমান নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীমাত্রই ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী হতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে নিজের স্বামী নির্বাচনের অধিকারী হবে। আবার স্বামী যদি নৈতিক, অর্থনৈতিক ও দৈহিকভাবে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে তালাক দেয়ার অধিকারও স্ত্রীর থাকবে। এ ব্যবস্থারই সমর্থন পাওয়া যায় মহানবীর বিদায় হজ্জের ভাষণে। যেমন, তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে বৈষম্য করার কোনো অবকাশ নেই, সুতরাং স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে অধিকার, স্বামীর ওপরও স্ত্রীর সেই একই অধিকার। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "খোদার আলোয়, জলে ও বাতাসে সকল মানুষের, সকল স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। তেমনি ধর্ম যদি খোদার হয়, তবে তাতেও সকলের সমান অধিকার থাকিবে।" ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন, ... এখনও মুসলিম রাজ্যসমূহে নারীরা পুরুষের সহিত ইসলামের বিধান অনুযায়ী ঈদের ময়দানে ও মসজিদে নামাজে যোগদান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মসজিদে এখনও নারীদের জন্য পৃথক গ্যালারি দৃষ্ট হয়।"[১০] আসল

---

৯. Abul Hashim, Op.cit. P. 11

১০. মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ (সম্পাদিত) শহীদুল্লাহ সংবর্ধণা গ্রন্থ , ঢাকা, ১৯৬৭ ,পৃ. ১৩৪

কথা হচ্ছে নামাজ, রোযা প্রভৃতি ইসলামের সব অবশ্যপালনীয় কর্তব্যে যখন নারী-পুরুষের অবস্থান একই, হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ পুরুষের সাথে নারীরা যখন অনাবৃত মুখে পুরুষদের সঙ্গে কাবা প্রদক্ষিণ করতে পারে (রাসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রীগণও তাই করতেন) তা হলে বর্তমান অগ্রসর পরিবেশে আমাদের মেয়েরা সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কোন্ যুক্তিতে?

ইসলামী মতে, ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। আর এজন্যই আল্লাহ্‌র একত্বের (তৌহিদ) এর ওপর নিঃশর্ত গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা থেকেই উদ্ভব ঘটে মানবতার ঐক্যের ধারণার। আর এজন্যই আল্লাহ্ মহানবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমরা আপনাকে সমগ্র মানবজাতির সুপথপ্রদর্শন ও সাবধানকরণের বাণীসহ পাঠিয়েছি।"[১১] এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার কিংবা ধর্মের নামে মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ধর্ম নিয়ে জোরজবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা সরাসরি বাতিল করে দিয়েছে।[১২]

ইসলাম বলে দিয়েছে যে, পাপমুক্তি ও আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ কোন একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয়। ছোট-বড় নির্বিশেষে যার যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, তার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ নির্ভর করবে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা ও সদাচরণের ওপর। মোট কথা, একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আনুষ্ঠানিকতা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনই নয়, বরং অন্তঃকরণের এমন নির্ভেজাল পবিত্রতা যার লক্ষ্য মানুষ ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা তথা খোদার এবাদত ও বান্দার খেদমত।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, পবিত্র কোরআন একই সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শুধু তাই নয়, কোরআন একথাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, মানুষের প্রতি কর্তব্য যদি ঠিকমত পালন করা না হয়, কিংবা সে কর্তব্যে যদি কোনরকম অবহেলা করা হয়, তা হলে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপালন নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে যায়। এভাবে ইসলাম মুসলমানদের সব ধরণের গোষ্ঠী-আনুগত্য পরিহার করার, মানুষের মধ্যে গভীর মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-কৌশল অনুসন্ধানের এবং জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের ঘোষণা: "হে মানবজাতি, আমরা তোমাদের একই নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তারপরই কেবল তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, এজন্য যে তোমরা পরস্পরকে জানবে, এজন্য নয় যে তোমরা পরস্পরকে অবজ্ঞা করবে।"[১৩]

---

১১. আল-কুরআন, ৩৪:২৭

১২. আল-কুরআন, ২:২৫৬

১৩. কুরআন, ৪৯:১৩

এই একই বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় মহানবীর ঘোষণায়। তিনি বলেছেন, সব মানুষ একই উপাদান হতে সৃষ্ট; সুতরাং কালোর উপর সাদার এবং সাদার ওপরে কালোর, আরবের উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবের কোনো প্রাধান্য নেই।

ইসলামের উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত এই যে, এ নবীন ধর্ম পূর্ববর্তী কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ও নবী-রাসূলদেরকে অসম্মান করেনি, অবহেলা ও করেনি, বরং সব ধর্মের ঐক্য ও সংহতির কথা ঘোষণা করেছে এবং সেসব ধর্মের ঐতিহ্যকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে। ধর্মে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই–কোরআনের এই বাণী[১৪] ইসলাম ধর্মের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সকলকে। যেমন, খলিফা আবু বকরের শাসনামলে জিজিয়ার বিনিময়ে খ্রিস্টানদের জানমালের নিভয়তা এবং নিজেদের বিবেক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ি কাজ করার অধিকার যে কিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার বড় প্রমাণ খলীফার এই ঘোষণা, “তারা (খ্রিস্টানরা) কখনো তাদের নাকাস(ঘণ্টা) বাজাতে এবং উৎসবাদির সময়ে ক্রুশ নিয়ে বাইরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হবে না।” ইসলামে একচেটিয়া অধিকার (monopoly) বেআইনী- এই ছিল মহানবীর ঘোষণা।[১৫]

মোট কথা, জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ি কথা বলার ও কাজ করার স্বাধীনতা ইসলামী জীবনব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ। তাই দেখা যায় আদি ইসলামের সেই সৃজনশীল আমলে পন্ডিত, আইনবিদ, শিল্পী, ও মরমি সাধক–এঁরা সবাই পরিচালিত হতো ধর্মজাযকদের দ্বারা নয়, বরং জনগণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং তাদের মনোনীত খলিফাদের দ্বারা। এ দিক থেকে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব–ফরাসী বিপ্লবের এই ধ্বনির সুস্পষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

মূল্যবোধঃ

মানুষ যেদিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে সেদিন থেকে মূল্য শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছে। প্রয়োজন বোধ থেকেই মূল্যের ধারণার সার্থক সংকেত আমরা পেয়েছি। তাই প্রয়োজনের আর এক নাম মূল্য। মূল্য, মান, মূল্যায়ন, শব্দগুলোর সাথে আমাদের সবার পরিচয় আছে। সাধারণত মূল্য বলতে আর্থিক মূল্য বা দামকেই বুঝি। তবে মূল্যের সমার্থক শব্দ হিসেবে ভাল, মন্দ, সুন্দর প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করি। ক্রিয়া হিসেবে মূল্যের অর্থ হলো প্রশংসা করা বা সমাদর করা। গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে মূল্যের অর্থ যোগ্যতার গুণ বা ভালত্ব। বস্তুবাচক বিশেষ্য হিসেবে মূল্যের অর্থ হলো বস্তুতে আশ্রিত গুণ। যা আমাদের মনে সন্তোষ সৃষ্টি করে তারই নাম মূল্য।[১৬]

---

১৪. আল-কুরআন, ২:২৫৬

১৫. ড.আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

১৬. মো. আবদুল ওদুদ , সাধারণ নীতিদ্যিা, মনন পাবলিকেশন ব, ঢাকা, ২০১২ ,পৃ. ৫৬৮

মূল্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো (Value)। এটি একটি ফরাসী শব্দ। ফরাসি ভাষায় ভ্যালু শব্দের অর্থ হলো শক্তি। অর্থাৎ যা কোন কিছুর উপযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে ভ্যালু শব্দটিকে ভ্যালুয়ার (Valuer) শব্দের সমার্থক মনে করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যালু বলতে উৎকৃষ্টকে বোঝায়। ভ্যালু শব্দের সাথে যখন ইতালি শব্দ ভ্যালুটা (Valuta) শব্দের সংযোগ স্থাপন করা হয় তখন তার অর্থ হয়ে যায় দাম বা মূল্য। মেইনং ভ্যালু শব্দটিকে মর্যাদা ও মহত্ব অর্থে ব্যবহার করেছেন।[১৭]

মূল্যবোধ শিক্ষার যথেষ্ট উপাদান আমাদের বর্তমান পাঠ্য বিষয়বস্তুর সাথে মিলেমিশে আছে। সেই বিষয়গুলিকে সংযত উপায়ে মূল্যবোধের শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা দরকার। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতার নিরিখে এমন সব গুণাবলির বিকাশ সাধন যা তাদেরবে সৎ ও সাহসী নাগরিক হতে সাহায্য করে। এর জন্য নিম্নরূপ সাধারণ লক্ষ্যগুলিকে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১। ছাত্রদের যেসব মৌলিক মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো- পরিচ্ছন্নতা, আত্মমর্যাদাবোধ, সত্যবাদিতা, অহিংসা, কঠোর শ্রম, স্নেহ-প্রীতি, সাম্যবোধ, সহযোগিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সাহস, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশ সংরক্ষণ, অনুভূতিশীলতা, উৎপাদনশীল জনসংখ্যা বিষয়ক ধারণা।

২। ছাত্রদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্য পরায়ণ হতে সাহায্য করা।

৩। দেশের বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করা এবং এ সবের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সঠিক চেতনার সৃষ্টি করা।

৪। চিন্তায়, কর্মে ও অভ্যাসে, শিক্ষার্থীদেরকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের উর্ধ্বের্ক্ষ তাদের বুদ্ধির মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করা। এছাড়া বিজ্ঞান ভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা।

৫। নিম্নরূপ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা:

(ক) নিজের প্রতি, (খ) সমাজের প্রতি, (গ) স্বদেশের প্রতি, (ঘ) অন্যান্য দেশের প্রতি, (ঙ) পরিবেশের প্রতি, (চ) সকল ধর্মের প্রতি।

শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের বিকাশ ধারার সকল প্রকার মূল্যবোধ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপযুক্ত নয়। তাই বয়ঃক্রম অনুসারে মূল্যবোধগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন- প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্নতা, সত্যবাদিতা, অহিংসা, স্নেহ-প্রীতি, সাম্যবোধ, শ্রমের মর্যাদাবোধ, বয়স্ক ব্যক্তি ও গুরুজনসহ মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রবণতা,

---

১৭. মো. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৬৮

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে চেতনা সৃষ্টি, সৌহার্দ্যবোধ ও সৃষ্টিমূলক কর্মের প্রতি মোহ সৃষ্টি, দয়া, মায়া, সহানুভূতিশীলতা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, নিজ নিজ কর্তব্য পালন ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ: (১) দেশপ্রেম এবং জাতীয় অখন্ডতার চেতনা, (২) সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, (৩) নিজ নিজ কর্তব্য পালন, (৪) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের বোধ, (৫) সহানুভূতি, দয়া, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বোধ, (৬) সাহসিকতা ও নির্ভীকতা বোধ, (৭) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, (৮) ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা (৯) জনসংখ্যা ও জনশক্তি সম্পর্কে সঠিক চেতনাবোধ।

মাধ্যমিক স্তরের জন্য যে সব মূল্যবোধ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত সেগুলো হলো: (১) সমাজে অসততা, দুর্নীতি, অন্যায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে চেতনা সঞ্চার, (২) প্রাত্যহিক জীবনে সমতা ও সহযোগিতা বোধ জাগানো, (৩) সামাজিক পাপগুলিকে চিহ্নিত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে সেইগুলির বিরোধিতা করার প্রবণতা সৃষ্টির প্রয়াস, (৪) ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতি ও সম্প্রদায়গত অথবা অন্যান্য অপসংস্কৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা বা বুদ্ধির মুক্তি দান, (৫) সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের মূলগত সত্যকে অনুধাবন করা, (৬) অপরের চিন্তা ও মনোভাব সম্পর্কে উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন, (৭) ধূমপান, মদ্যপান অথবা মাদক ব্যবহারজনিত ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং অন্যদের এই সব কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা (৮) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, (৯) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা সৃষ্টি ইত্যাদি।

নৈতিক মূল্যবোধ:

ইংরেজি ‘moral value sense’ এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘নৈতিক মূল্যবোধ’। নৈতিক মূল্যবোধের অর্থ নৈতিক মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধি। এর প্রকৃত উৎস হলো নৈতিক চেতনা। নৈতিক চেতনা হলো মানুষের অন্তরের এক শক্তি, যা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মধ্যে পার্থক্য বোধ সৃষ্টি করে।

নৈতিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত নৈতিক মূল্য সম্পর্কে একধরণের উপলব্ধিকে বুঝায়। নৈতিক মূল্যবোধ এমন একটি অনন্য শক্তি, যা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে। সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত থেকেও এ শক্তি সমাজের ঊর্ধ্বে । বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এ শক্তি বিভিন্ন মাত্রায় থাকলেও এই অনন্য আত্মিক শক্তি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই কম-বেশি অবস্থান করে। তবে নৈতিক অন্ধ বা নৈতিকতাবোধ শূন্য লোকদের আলোচনা এর বাইরে রাখতে হবে। যেমন- নীতি বিজ্ঞানীগণ নৈতিক মূল্যবোধের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আমরা এখানে একটি সার্বিক সংজ্ঞা অনুধাবনের স্বার্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উপস্থাপন করব।

ড. হাসনা বেগম বলেন, “নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত কোন না কো একটি নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকে বুঝায়।”[১৮]

---

১৮. হাসনা বেগম, নৈতিকতা, নারী ও সমাজ, বাংলা একাডেমী. ঢাকা-২০০৩, পৃ.-৯৬

ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ডালী বলেন, "নৈতিক মূল্যবোধ হলো এক প্রকার নৈতিক চেতনা যার উৎস প্রকৃত অর্থে নীতিবোধ।"[১৯]

ড. আব্দুল হামিদ বলেন, "নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত আমরা কোন বস্তু বা ঘটনার সম্পর্কে কোন আদর্শের ভিত্তিতে এক ধরণের নৈতিক চেতনা বা মূল্যায়নকে বুঝে থাকি।"[২০]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, নৈতিক মূল্যবোধ বলতে নৈতিক মূল্য বা গুণ সম্পর্কে এক ধরণের উপলব্ধিকে বুঝায়, যাকে অনুসরণ করে মানুষ তার কর্ম পরিচালনা করে। নৈতিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করার মধ্য দিয়ে সামাজিক কার্যকলাপে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

নৈতিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য:

নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখানে নৈতিক মূল্যবোধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরব।

১. নৈতিক মূল্যবোধ হলো নৈতিক মূল্য সম্পর্কে এক ধরণের উপলব্ধি বা চেতনা।
২. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হলো নীতিবোধ বা নৈতিক চেতনা।
৩. নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। হতে পারে তা সুপ্ত অবস্থা বা জাগরিত অবস্থা। নৈতিক নিস্পৃহা বা অন্ধ ব্যক্তি এর আওতামুক্ত।
৪. নৈতিক মূল্যবোধ অন্যান্য সকল বোধ বা চেতনার ঊর্ধ্বে।
৫. নৈতিক মূল্যবোধ কেবল মাত্রার দিক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কম বেশি হতে পারে।
৬. নৈতিক জ্ঞানের সম্প্রসারণের সাথে সাথে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। আবার, সম্প্রসারণের অভাবে হ্রাস পায়।
৭. নৈতিক মূল্যবোধ যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
৮. নৈতিক মূল্যবোধ সার্বজনীন।
৯. নৈতিক মূল্যবোধ মানব মনের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

---

১৯. হাই ডালী, নীতিবিদ্যা : আদর্শনিষ্ঠ ও পরনীতিবিদ্যা, পৃ. ১৪৪

২০. আব্দুল হামিদ, সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা,অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা. পৃ. ১৬

নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের পার্থক্যঃ

সাধারণত নীতিবিজ্ঞানীগণ এবং অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে নৈতিক মূল্যবোধের স্থান সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে অনেক উচ্চ মানের বলে মনে করে থাকেন। নৈতিক মূল্যবোধকে উচ্চমানের মনে করার পিছনে যে মৌলিক দিকটি কাজ করেছে তা হলো এই যে, নৈতিক মূল্য যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখন নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেকার কতগুলো পার্থক্য তুলে ধরব।

১. নৈতিক মূল্যাবোধ হলো নৈতিক মূল্য সম্পর্কে সহজাত উপলব্ধি এবং যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ হলো কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সমাজে টিকে থাকার প্রয়োজনে তথাকথিত সামাজিক প্রথা, রীতি, বিশ্বাস ইত্যাদিকে মেনে নেয়া।

২. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হলো মানব মনের অভ্যন্তরীণ চেতনা। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের উৎস সামাজিক প্রথা, রীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির বাহ্যিক প্রভাব।

৩. নৈতিক মূল্যবোধ হলো সার্বজনীন। অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

৪. নৈতিক মূল্যবোধ জ্ঞানের সম্প্রসারণের ফলে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকজ্ঞান সম্প্রসারণের ফলে হ্রাস পেয়ে অবশেষে এর বিলুপ্তি ঘটে। যেমন- সতীদাহ প্রথা, দাস প্রথা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি সামাজিক প্রথার প্রতি মানুষের সমর্থন ছিল। এগুলো সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নৈতিক জ্ঞানের সম্প্রসারণের ফলে এসব তথাকথিত সামাজিক মূল্যবোধের বিলুপ্তি ঘটেছে।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ চিরন্তন। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ কোন বিশেষ সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে ।

৬. নৈতিক মূল্যবোধ অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ অন্য কিছুর ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে না। কারণ, সামাজিক মূল্য তথা সামাজিক মূল্যবোধ যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

৭. নৈতিক মূল্যবোধ যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, অনেক সামাজিকক মূল্যবোধ যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। যেমন- সতীদাহ প্রথা, দাস প্রথা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি।

৮. নৈতিক মূল্যবোধ মানব মনের অভ্যন্তরীণ নৈতিক চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাইরের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। [২১]

---

২১. মো. আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০ – ৫৭১

নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বঃ

মানব জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধের ফলে সমাজ বহু সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে মুক্তি পায় এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি প্রধান পূর্বশর্ত। যে জাতির নৈতিক মূল্যবোধ যত বেশি জাগ্রত হয়, সে জাতি তত বেশি উন্নত এই সত্যটির পক্ষে সকল চিন্তাশীল মানুষই একমত।

নৈতিক অন্ধ ও নৈতিক স্পৃহাবিহীন ব্যক্তি এ সত্য বহির্ভূত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনন্য ভূমিকা পালন করে এবং এর উপর একটি জাতির সভ্যতা, নৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল শ্রেণীর মানুষের দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতাই যথেষ্ট নয় বরং তারা কতখানি নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছে তাই হলো বড় কথা।

নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। শ্রম বিমুখতা, দায়িত্বহীনতা এবং উদাসীনতার মতো নৈতিক ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ মহৌষধের মত কাজ করে।

নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে অন্যায়ের পতন করতে চেতনা যোগায়। স্বার্থপরতা, আত্মবাদ ইত্যাদি সংকীর্ণ চিন্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে দেয় প্রবল ও দৃঢ় মানসিক শক্তি, যার ফলে মানুষ যাবতীয় দুর্নীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে শেখে; অন্যায় ও অবৈধ পন্থা পরিত্যাগ করে নৈতিক ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে। নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আলোকিত মানুষের সংখ্যা সমাজে যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সমাজ জীবন হয়ে ওঠে কলুষমুক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত। তাই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষের জন্য এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন ও বিকাশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই কারণে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উৎসারণ এবং তার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধ সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। তাই আমাদের উচিৎ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র:

ধর্ম কেবল উত্তম চরিত্র গ্রহণের আহক্ষান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও মৌল আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার-আচরণের খুঁটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপরে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিক চরিত্র হারালে তার কি নির্মম পরিণতি হতে পারে তার কথা বলে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়। আর চরিত্রবান কি উচ্চ সাওয়াব পেতে পারে এবং চরিত্র হারালে কি আযাব ভোগ করতে হতে পারে তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে চলা ধর্মের কাজ। জার্মান দার্শনিক বলেছেন, "ধর্ম ছাড়া চরিত্র নিষ্ফল।" ভারতীয় চিন্তাবিদের উক্তি হলো, "ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র আসলে দুটো একই জিনিস। দুটো কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেখানে ধর্ম সেখানেই চরিত্র, আর যেখানে চরিত্র সেখানেই ধর্ম। এদুটো অবিভাজ্য একক।" ধর্ম হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের প্রাণ শক্তি। আর নৈতিক চরিত্র হচ্ছে ধর্মের অবয়ব। অন্য কথায় ধর্ম চরিত্রের জীবিকা, ধর্মই চরিত্রকে পরিবর্ধিত করে, সঞ্জীবিত রাখে, যেমন করে পানি খাদ্য দেয় এবং কৃষির ফলন বৃদ্ধি করে। জন্ প্রস্ফুমো ও তার প্রেমিকা ক্রিস্টান কিলারের মামলার রায় দান প্রসঙ্গে বৃটিশ বিচারপতি বলেছিলেন: "ধর্ম ছাড়া কখনো চরিত্র হতে পারে না, আর নৈতিক চরিত্র ছাড়া আইনের কার্যকারিতা অসম্ভব।" [২২]

অকলঙ্ক উত্তম নৈতিক চরিত্র পাওয়ার একমাত্র উৎস হল ধর্ম। বিশ্বাসই মানুষকে সর্বপ্রকার অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করে। ধর্মই মানুষকে উচ্চতর লক্ষ্য পানে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। ধর্মই মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করে, তার সীমা নির্দিষ্ট করে এবং তা লংঘন করা থেকে তাকে এবং অন্যদেরকে বিরত রাখে। তার আদত-অভ্যাস, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাকে বিনয়ী ও অনুগত বানায়। তাঁর জীবন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মই ব্যক্তির মন-মানসিকতাকে জীবন্ত রাখে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে এবং তাকে উৎকর্ষ দান করে।

মন-মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র:

মানব মনের গভীরতম অন্দরে একটা গোপন ও প্রবলতর শক্তি নিহিত আছে। যে শক্তি মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করে, বিপদে মুক্তি দেয়, ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ করে। এ শক্তি যেমন খারাপ পরিণতির ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে তেমনি ভাল পরিণাণ বয়ে আনবে এমন কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধও করে। এ শক্তি যেমন হুকুমদাতা তেমনি কার্যনির্বাহীও। নীতি বিজ্ঞানীরা এ শক্তির নাম দিয়েছেন 'বিবেক'। কেউ কেউ বলেছেন নীতিবোধ বা চৈতন্য আর ইসলাম এর নাম দিয়েছে 'আল-ক্বালব'।[২৩] অর্থ-মন, অন্তর বা হৃদয়। আর নৈতিকতা এই

২২. শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামিক স্টাডিজ, সোনালী সোপান, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২২৭

২৩. আল-কুরআন, প্রাগুক্ত।

মন-মানসিকতাকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এক লোক রাসূলুল্লাহ্ স. এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "পুণ্য বা সুনীতি কী? পাপ বা দুর্নীতি কী?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে কাজে তোমার মন বা অন্তর স্থিতি লাভ করে, যে কাজে হৃদয় ও বিবেক স্বস্তি পায়, আত্মা নিশ্চিন্ত থাকে তাই পুণ্য বা সুনীতি। আর যে কাজে মন স্বস্তি পায় না এবং আত্মা নিশ্চিন্ততা লাভ করে না–তাই হচ্ছে পাপ বা দুর্নীতি, ফতোয়া দাতারা এর বিপরীত ফতোয়া যতই দিক না কেন।"[২৪]

বস্তুত, এই বিবেক ই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর। নৈতিক জীবনের প্রথম স্তম্ভ বা খুঁটি হচ্ছে এই বিবেক। বিবেক মানুষকে ভাল কাজে নামার অনুপ্রেরণা যোগায় এবং মন্দ কাজ হতে তাকে নিবৃত্ত রাখে। এটা মানবের অভ্যন্তরীণ এক অতন্দ্র প্রহরী যে মানবের কর্মনিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে যতক্ষণ না মানুষ নিজেই তার নির্দেশনা উপেক্ষা করতে করতে তাকে বাকস্তব্ধ না বানিয়ে ফেলে। মানব সমাজের সঠিক উন্নতি লাভ, সুসংগঠিত ও উন্নত হওয়ার জন্য এবং সুবিবেক ও ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের ধারা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই বিবেক ও নৈতিকতা অপরিহার্য।

ইসলামী নৈতিকতার কতিপয় দিক:

ইসলামী জীবনাদর্শের উপরে একটি নৈতিক-সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার অসংখ্য নীতিমালা রয়েছে। যার মাধ্যমে একটি সুন্দর আদর্শ সমাজ গঠন ও বিনির্মাণ করা যায়। যেহেতু নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে কোন আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই আদর্শ জাতি এবং আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজন অনেক বেশি। আমাদের নাগরিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, অফিস-আদালত এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বস্তরে যদি নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে দায়িত্ব পালনের কঠোর সংকল্প আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলে সমাজের বুক থেকে সর্বপ্রকার নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে দেয়া যায়। এজন্যই ইসলাম নৈতিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বাঞ্ছিত গুণে গুণান্বিত হতে সবিশেষ তাগিদ করেছে। অনুরূপভাবে নৈতিকতা বিরোধী সেই সব দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও সতর্ক-সাবধান করা হয়েছে যেগুলো মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে কলুষিত এবং কালিমামুক্ত করে থাকে।

আমরা এখানে ইসলামের কতিপয় মৌলিক ও আবশ্যকীয় নৈতিকতার কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

---

২৪. ইমাম অলি আল-দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল-মাছাবিহ (কলকাতা, এম বশির হাসান এন্ড সন্স, তাবি) পৃ.

সততা ও সত্যবাদিতাঃ

ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা সত্য কথা বলা, সত্যকে আঁকড়ে থাকা, সত্যের উপর অবিচল থাকা এবং সর্বাবস্থায় সততা রক্ষা করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর আর সর্বদা সত্য কথা বল। তাতে তোমাদের কাজ-কর্ম সংশোধিত হয়ে যাবে আর তোমাদের গুনাহ্ সকল ক্ষমা করা হবে।"[২৫]

সততা ও সত্যবাদিতার গুণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হলে সত্যবাদী লোকদের সঙ্গ লাভ করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সাথে থাক।"[২৬]

সত্যবাদীতা জীবনের সফলতা ও কল্যাণময় জীবনের উন্মেষ ঘটায়।

এ মর্মে মহানবী স. বলেন, "তোমাদের কর্তব্য সত্যাশ্রয়ী হওয়া। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যময় পথের সন্ধান দেয় আর পুণ্য জান্নাতের দিকে চালিত করে।"[২৭]

সত্যবাদিতার গুণে মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পায়। মহানবী (স.) বলেছেন, "সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।"[২৮]

ইসলাম মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী হতে বলেছে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম জীবনের সর্বস্তরে সত্যকে আঁকড়ে রাখার জন্য দ্ব্যর্থহীন তাকিদ করেছে। পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্ অগণিত মহামনীষী ও নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই জীবনের মূল্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। এ মর্মে আল-কুরআনের ঘোষণা, "সেইদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতায় হিতসাধন করবে। তাদের জন্য রয়েছে পরম সুখময় জান্নাত।"[২৯]

সকল সত্যের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই সত্য আর ইসলাম ছাড়া সবকিছু মিথ্যা ও বাতিল। যেমন বলা হয়, ইসলাম সত্য আর কুফর বাতিল–মিথ্যা। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি তার বাণীবাহককে সরলপথ-নির্দেশিকা ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এই ধর্মকে অপরাপর সকল ধর্মের উপরে প্রভাবশালী করতে পারেন।"[৩০]

---

২৫. আল-কুরআন, ২৩:৭০-৭১

২৬. আল-কুরআন, ৯:১১৯

২৭. ইমাম অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.

২৮. ইমাম অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ.

২৯. আল-কুরআন, ৫:১১৯

৩০. আল-কুরআন, ৯:৩৩, ৪৮:২৮, ৬১:৯

যারা এ সত্যকে শক্তভাবে ধরে থাকে মানবজাতির মধ্যে তারাই সাফল্য অর্জন করে। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "কালের শপথ, সকল মানুষই লোকসান কবলিত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ করেছে, তারপরে, ঈমান এনেছে যারা তাদের একজন আরেকজনকে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিয়েছে আর তারা যে সত্য গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে সেই সত্যগ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে।"[৩১]

অঙ্গীকার রক্ষা করাঃ

ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অঙ্গীকার রক্ষা করা। সমাজ জীবনে অঙ্গীকার পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সমাজে যাতে পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস থাকতে পারে সে জন্যে ইসলাম মানুষকে তাঁর প্রতিটি ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ যদি তাদের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক দেয়া ওয়াদা পালন না করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা লেগেই থাকবে। এজন্যই ইসলাম মানুষকে তার যাবতীয় বৈধ ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি মোতাবেক কাজ করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। মানুষ সমাজ জীবনে চলতে গিয়ে অপরের সাথে বিভিন্ন ধরণের চুক্তি বা অঙ্গীকার করে থাকে। এই অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা ঈমানের একটি অঙ্গ। কুরআন ও হাদীসে এই অঙ্গীকার পালন করার ব্যাপারে বহু তাকিদ এসেছে। যেমন-মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।"[৩২] আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, " তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর। অবশ্যই অঙ্গীকার সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৩] মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "আর আল্লাহর কাছে সে সব লোক সৎকর্মশীল বলে গণ্য যারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের এ অঙ্গীকার পূর্ণ করে।"[৩৪] মুমিনের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, কোন প্রকারের চুক্তি লঙ্ঘন করে না।"[৩৫]

ইসলামী নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াদাকে ঋণ স্বরূপ বলা হয়েছে। কারো কাছ থেকে কোন কিছু ঋণ নিলে তা যেমন পরিশোধ করতে হয়, তেমনি কারো সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ করতে হয়। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "ওয়াদা ঋণস্বরূপ" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার কোন ধর্ম নেই।"[৩৬]

---

৩১. আল-কুরআন, ১০৩:১-৩

৩২. আল-কুরআন, ৫:১

৩৩. আল-কুরআন, ১৭:৩৪

৩৪. আল-কুরআন, ২:১৭৭

৩৫. আল-কুরআন, ১৩:২০

৩৬. ইমাম অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.

একবার মহানবী স. সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা যদি ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের যিম্মাদার হব।” উক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ‘আহ্‌দ’ বা ওয়াদা পালন একটি। ওয়াদা পালনের বিষয়ে ওয়াদা প্রদানকারী উদাসীন মনোভাব নিয়ে চললে সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা থাকে না। কাজেই ইসলামী নৈতিক দর্শনে অঙ্গীকার পালন করার প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আমানতদারিতাঃ

ইসলামী নৈতিকতার আরো একটি বিশেষ গুণ আমানতদারিতা। ইসলাম এ আমানতদারিতা রক্ষা করে চলার বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের মধ্যে আস্থা-বিশ্বস্ততা না থাকলে সমাজটা সুখময় হয় না। সুতরাং সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে যেন সততা, আমানতদারিতা, আস্থা ও বিশ্বস্ততা ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে সুখকর, সুন্দর ও নিরাপদ স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা যায়। সে জন্যই ইসলাম আমানতদারীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আমানতদারিতা ইসলামী নৈতিকতার একটি মহান বৈশিষ্ট্য। যেহেতু এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ এবং সকল প্রকার কাজ-কর্মের নিরাপত্তার নিভয়তা রয়েছে। দৈনন্দিন কাজ কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এসব সমাধা করতে হলে পরস্পরের শুভেচ্ছা-সহযোগিতা অর্জন করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রয়েছে বিশ্বাসের। এ বিশ্বাসকে সঠিকভাবে রক্ষা করে যাওয়াই হলো আমানতদারিতা।

একজন মুমিনকে মনে রাখতে হবে যে, সে একজন মহান বড় আমানতদার। প্রথমেই সে হলো একজন তাওহীদের আমানতদার। সুতরাং যিনি তাওহীদের আমানতদার বা সংরক্ষক হিসেবে বর্তমান আছেন তাকে অবশ্যই সকল বিষয়েই এ বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলতে হবে। ঈমানদারের কাছে যে কোন লোকের বা সমাজ ও রাষ্ট্রের ধনমাল, বিষয়-সম্পত্তি, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তার জিম্মাদার নির্বিঘ্নে অর্পণ করা যেতে পারে। যে কোন মানুষ যে কোন মূল্যের মহা মূল্যবান সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত রাখতে পারবে। আর তিনিও সে সম্পদকে জীবনের যে কোন মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করে যাবেন। কখনো তার তসরূফ এবং খিয়ানত করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। এই শ্রেণীর মানুষই হলেন প্রকৃত মুমিন ও আমানতদার। এদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।”[৩৭] আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, “এরূপ লোকেরাই উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য, সেই ফেরদাউস নামক জান্নাতের যেখানে তারা বসবাস করবে অনন্তকাল।” [৩৮]

---

৩৭. আল-কুরআন,২৩:৬

৩৮. আল-কুরআন, ২৩:১০-১১

আমানতের তাৎপর্য অতি ব্যাপক। পৃথিবীতে প্রতিটি নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোন না কোন অল্প-বিস্তার দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বগুলো আমানতের অন্তর্ভূক্ত। আর এসব আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা এবং সঠিক মালিককে পৌঁছে দেয়া ইসলামী নৈতিকতার দাবী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানত তাদের হকদারের নিকট ঠিক ঠিক ভাবে পৌঁছে দাও।"[৩৯]

আদল-ইনসাফ:

ইসলামী নৈতিকতার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে-আদল ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। সামাজিক জীবনে এই আদল বা ন্যায়নীতি ইসলামী নৈতিকতার এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্ব প্রভূ আল্লাহ্ তায়ালা যেমন আদিল–ন্যায় বিচারক, তেমনি তিনি মানব জাতিকে তাদের সামাজিক জীবনে আদল প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আদল শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা। কোন বস্তুকে সমান অংশের অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দেয়া যাতে কারো অংশে সামান্য পরিমাণও কমবেশি না হয়। এরূপভাগ করাকে আদল বলা হয়। অত্যাচারের পরিমাণে উহার প্রতিবিধান এবং বিচারে ন্যায়ের মানদন্ড এমনভাবে ধারণ করা, যাতে পরস্পরের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়, ইহাই আদল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই হল আদল। যেহেতু ইসলাম ন্যায় বিচারের আদেশ করেছে তাই আদলই হলো ন্যায় বিচারের একমাত্র উপায়। আর তা হতে হবে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনসহ মানুষের সামগ্রিক জীবনেই। প্রত্যেক মানুষের নৈতিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত তথা সর্ব বিষয়ের প্রাপ্যকে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আদায় করা ও প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীর সাথে শরী'আত সম্মত আচরণ করাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে আদলের হুকুম।

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সুখময় নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আদলের গুরুত্ব অনেক। কেননা,আদল বা ন্যায়বিচারই হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি। সমাজ সংরক্ষণ, শাসন পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নয়নের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে আদলের বিশেষ প্রয়োজন।

আদল মহান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। তিনি সত্য বলেন, তিনি ন্যায় বিচার করেন। তিনি সততা পছন্দ করেন ও সততার সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করেন। আর মানব জীবনে সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলার মূল উৎসই হচ্ছে আদল। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদল প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তজার্তিক জীবনের শান্তি

---

৩৯. আল-কুরআন, ৪:৫৮

ও নিরাপত্তা আদল প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল। তাই মহান আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,"আল্লাহ্ আদল ও সদাচারের নির্দেশ দেন।"[৪০] আল্লাহ্ আদল বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পুন: পুন: আদেশ করেছেন। আদলের গুরুত্ব এত অধিক যে কোন উৎপীড়িত শক্তি উৎপীড়নকারীকে আইনগত ক্ষমা করতে পারে না। কারণ, তাতে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তোমরা সর্বাবস্থায় সুবিচার কর, এটাই তাকওয়ার নিকটতর।"[৪১] ইসলামী নৈতিকতার এ মহৎ গুণটি আমাদেরকে ফৌজদারি ও আদালত সংক্রান্ত বিচার ও দন্ডবিধানে , ব্যবসা-বাণিজ্যে, মাপে-ওজনে, অনাথ-ইয়াতীমদের প্রতি ব্যবহারে যুদ্ধ-বিগ্রহে ও সন্ধির ব্যাপারে, সাক্ষ্যদানে, দাম্পত্য ও পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে এ আদল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব বা তারতম্যের কোন অবকাশ নেই। এ মর্মেই মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা: "যখন তোমরা লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা কর তখন তা ন্যায়ের সাথে কর।"[৪২]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুবিচার ও ন্যায় নীতির উপরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়াও। যদিও সে সাক্ষ্য এবং বিচার তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতার এবং নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। তারা ধনী হোক বা গরীব, এদের সম্বন্ধে আল্লাহই অধিক অবগত আছেন। অতএব তোমরা নফসের খায়েশের অনুসরণ করে অবিচার করে বসো না।" [৪৩]

বস্তুত, মানব জীবনে আদল একটি মহৎ গুণ। এটা মানবের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

সবর বা ধৈর্য:

ইসলাম মানুষের মধ্যে আদর্শিক যে নৈতিকতার বাস্তবায়ন করতে চায় তন্মধ্যে ধৈর্য্য-সহ্য অন্যতম। সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্য ধৈর্য বা সবরের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সমাজে ধৈর্যচ্যুতির ফলে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে। ইসলামের পরিভাষায় বিপদাপদ বা পার্থিব বালা-মুসিবতে কিংবা অন্যায়-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে মহান স্রষ্ট করুণাময় আল্লাহ পাকের উপর নির্ভর করে সব কিছুকে সহ্য করাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। এগুণটি একান্তই মানবীয়। পশুতে এগুণ নেই বলেই ওগুলো হীনপ্রবৃত্তি সম্পন্ন এবং উত্তেজনাময় হিংস্র প্রাণী। এ মহৎ গুণটি মানুষকে সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে থাকে। এ গুণটি ঈমানের অর্ধেক। মহানবী (স.) তাই বলেন, "ধৈর্য্য ঈমানের অর্ধেক।"[৪৪]

---

৪০. আল-কুরআন, ১৬:৯০

৪১. আল-কুরআন, ৫:৮

৪২. আল-কুরআন, ৪:৫৮

৪৩. আল-কুরআন, ৪:১৩৫

৪৪. আল-কুরআন, প্রাগুক্ত।

সুখ-দুঃখ মানব জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বালা-মুসিবত মানব শক্তির আওতার বাইরে তাই মানব কখনো রোগ, শোক, দারিদ্র, ক্ষুধা বা অন্য কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারে। এসবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। সুতরাং এ সকল অবস্থায় হা-হুতাশ করলে কিংবা ভেংগে পড়লে চলবে না বরং সর্বাবস্থায়ই মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করে যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে এবং বলতে হবে: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরা তার কাছেই প্রত্যাবর্তনশীল।"[৪৫] আর ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। আল্লাহ্ বলেন, "এবং আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৪৬] কেউ বিপদে-আপদে ধৈর্য্য ধরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তার কাজে সাহায্য করেন। যেমন আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ধৈর্য্যশীলদের সাথেই আছেন।"[৪৭]

মু'মিন চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তায়ালাা বলেন, "মুমিন হলো তারা যারা অর্থ সংকটে ও কষ্টক্লেশে এবং যুদ্ধ চলাকালে দৃঢ়পদ থাকে। তারা হলো সত্যবাদী এবং তারা হল মুত্তাকী।"[৪৮]

ধৈর্য্যশীল মানুষের ব্যাপারে মহানবী (স.) সুসংবাদ দিয়ে বলেন যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে বারণ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তার উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিবেন। বস্তুত, ধৈর্য্য সমাজকে যাবতীয় বিপর্যয় হতে রক্ষা করে থাকে। এজন্য বলা হয়, "ধৈর্য্য শান্তি ও আরাম-আয়েশের চাবিকাঠি।" কাজেই ইসলামী নৈতিকতায় ধৈর্য্য এক অনন্য গুণ।

দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন:

অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং অপরাধকারীর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়াও ইসলামী নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলাম এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে রহম কর, তাহলে তোমাদের উপরও রহম করা হবে। অনুরূপভাবে তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দাও তোমাদের অপরাধসমূহও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

---

৪৫. আল-কুরআন, ২:১৫৬

৪৬. আল-কুরআন, প্রাগুক্ত

৪৭. আল-কুরআন, ২:১৫৩

৪৮. আল-কুরআন, ২:১৭৭

অপর হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না।" অন্য এক হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহ্ তায়ালাও তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না।" ইসলাম শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের সাথে এমনকি পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও মমতার আচরণ প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "যারা পৃথিবীর মানব সমাজের উপরে অন্যায়ভাবে আযাব দিয়েছে বা কষ্ট প্রদান করেছে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে কঠোর আযাব দেবেন।" (মুসলিম) "অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি যে মুমিনের ক্ষতি করে এবং তাকে প্রবঞ্চিত করে।"

বিনয় ও নম্রতা:

ইসলামী নৈতিকতার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা অন্যতম। বিনয়ের অর্থ হলো আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান কার। অর্থাৎ সকল প্রকার গর্ব ও অহংকার থেকে নিজের মন-মানসিকতাকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তদস্থলে পরম বিনয় ও নম্রতা নিজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা। বিনয়ী লোকদের জন্যই আল্লাহ্ পাকের দরবারে অবধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী মর্যাদা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "দয়াময় প্রভূর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।"[৪৯]

অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, "আখিরাতে ঐ গৃহের (বেহেশতের) অধিকারী আমি সেই সব মানুষকেই করব যারা জগতের বুকে উদ্ধত হতে চায় না এবং বিশৃঙ্খলা কামনা করে না।"[৫০]

---

৪৯. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩

৫০. আল-কুরআন, ২৮ : ৮৩

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও এর প্রভাব

ইসলামী নীতিবিদ্যার গতিশীলতা:

ইসলাম একটি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম।[১] এই ধর্মের নীতি-আদর্শসমূহ সুস্পষ্ট এবং সুনির্ধারিত। তাই এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে ইসলামভিত্তিক কোন নীতিমাল সম্ভব কিনা। এক্ষেত্রে প্রথমত বলা যায়, ইসলাম মানুষের চিন্তা ও মননশীলতার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রেখেই জগৎ-জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করার ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি।"[২]

মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ ইত্যাদি মান বিচারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেও তাকে গ্রহণ করা এবং কার্যকর করে তোলার বিষয়টি মানুষের বুদ্ধিনির্ভর বিচার বিবেচনার ওপর গড়ে ওঠে। তাছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেনি তার ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ইসলামে। এমনকি কুরআন নিয়েও গবেষণা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তারা কি তবে কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? যদি কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হতো তবে তাতে অনেক মতভেদ দেখতে পেতে।"[৩] ইসলামী নীতিবিদ্যা হচ্ছে প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার সমন্বিত একটি নীতিবিদ্যা। ইসলাম যেহেতু প্রত্যাদেশের সাথে প্রজ্ঞার সমন্বয়কে নিরুৎসাহিত করে না, বরং উৎসাহ দেয়। তাই ইসলামী নীতিবিদ্যার সম্ভাব্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ইসলাম একটি সর্বকালীন জীবন বিধান। কোন কালের সীমায় এর কার্যকারিতাকে আবদ্ধ করা চলে না। যদি এমন হতো যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই বিধানকে মানবজাতির জন্য নির্দেশিত করা হয়েছে তাহলে তার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে সময়ের ব্যবধানে প্রশ্নের সৃষ্টি হতো। কিন্তু ইসলামের বিধান সর্বকালের বিধায় এর থেকে নিঃসৃত বা এর আদলে গড়ে তোলা

---

১. প্রত্যাদেশ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে- Revelation, Catholic Encyclopedia তে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Revelation may be defined as the communication of some truth by God to a rational creature through means which are beyond the ordinary course of Nature." The Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Co. New York, 1912, XIII, 1. Hick, John, H., Philosophy of Religion, Prentic Hall of India, Private Limited, New Delhi, Fourth Edition, 1993, P. 56.

২. আল-কুরআন: ৩:১৯০ – ১৯১

৩. আল-কুরআন, ৪:৮২

নীতিতত্ত্বও যে কোন কালের জন্যই কার্যকরি বলে গ্রহণ করা যায়। এমনকি যুগের পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে ইসলামের নৈতিক বিধির মূল তাৎপর্যকে অক্ষুণ্ন রেখেও তাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায়। প্রয়োজন কেবল তাকে সেই ভাবে আবিষ্কার করা, সঠিকভাবে কার্যকর করা। ইসলামের আবেদন যেমন কালের সীমা পেরিয়ে, তেমনি তা নির্দিষ্ট স্থান বা জাতির মধ্যেও সীমিত নয়।

ইসলাম কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জাতির ধর্ম নয়। তাই ইসলাম অনুসরণে যে নীতিবিদ্যা প্রণয়ন করা হয় তাও হবে সর্বজনীন। দার্শনিক নীতিবিদ্যা যেমন পক্ষপাতহীন হয়ে উঠতে সচেষ্ট তেমনি ইসলামী নীতিবিদ্যাও সর্বজনীন ও আবেদনময়। ইসলামী নীতিবিদ্যার দার্শনিক মূল্য এ কারণে অগ্রাহ্য করা যায় না।

নৈতিক মূল্যবোধঃ

নীতিবিদ্যায় মূল্য (values) কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মূল্য মূলত আমাদের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্বের দিক মূল্যায়ন করে। ‘মূল্য’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ যোগ্যতা বা উৎকর্ষ। মূল্য হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষ, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে। নৈতিক মূল্যের ভিত্তি হিসেবে সাধারণত তথ্য বা বাস্তবিকতা (fact), নৈতিক সূত্র (moral principle), অনুভূতি (feeling), সামাজিক আদর্শ (social norm), ধর্মীয় অনুভূতি বা বিশ্বাস কাজ করে। নৈতিক মূল্যবোধ তাই ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষের পরিচায়ক।[৪]

নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধঃ

নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত আমরা কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে কোন আদর্শের ভিত্তিতে এক ধরণের নৈতিক চেতনা বা মূল্যায়নকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা নৈতিক দিক থেকে ভাল ও ন্যায়কে বুঝায়। আর সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত সমাজে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম কানুনকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার রেওয়াজকে বুঝায়। সদা সত্য কথা বলবে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা কর। এসব নৈতিকতার বাণী। কিন্তু আর্তমানবতার সেবা, দুঃস্থ এতিমকে সাহায্য কর, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও’ এ সকল বাণী অনেক সময় নৈতিক দায়িত্ব বা মূল্যবোধের পরিবর্তে সামাজিক দায়িত্ব বা মূল্যবোধের অন্তর্ভূক্ত। নৈতিক দায়িত্ববোধের উৎস ব্যক্তির অন্তস্থ (intrinsic) ধারণা বা তার স্বীয় নৈতিক চেতনা। ম্যুরের মতে, এ এমন একটি স্বকীয় ও অনন্য ধারণা যা প্রত্যেক সাধারণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে কমবেশি বিরাজ করে। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ববোধের উৎস সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যপ্রিয়তা ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ থেকে আসে। অথচ আর্তমানবতার সেবা করা বা প্রতিবেশির প্রতি সদয় হওয়া সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাহিরের তাগিদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব, সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির অন্তঃস্থ ধারণা নয়, বহিঃস্থ ধারণা।[৫]

---

৪. ডঃ এস. আবদুল হামিদ, সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, অনন্যা পাবলিকেশান্স, ঢাকা-২০১০, পৃ. ২২

৫. ডঃ এস. আবদুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

নৈতিক মূল্যবোধ সর্বজনীন (universal) না আপেক্ষিক (relative) এই প্রশ্ন নিয়ে নীতিবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এখনও বিশ্বাস করে যে নৈতিকতার মূল বাণী শাশ্বত ও সর্বজনীন। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নৈতিকতার বাণী এখনও একইভাবে সমাদৃত। বৃহত্তর পরিমণ্ডলে মতানৈক্য থাকলেও 'সত্য কথন বলা উচিৎ', 'হত্যা করা মহাপাপ' ইত্যাদি নৈতিক বাণীসমূহ সর্বসমাজে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন প্রথা বা রীতিনীতি দ্বারা নির্ধারিত। তাই বিভিন্ন সময়ে একই সমাজে বা একই সময়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। সতীদাহ প্রথা আজকের সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে গর্হিত কাজ বলে স্বীকৃত হলেও এক সময়ে তা সমাজে স্বীকৃত আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হত।[৬]

পরিবার পরিকল্পনা আজকের সমাজে স্বীকৃত বলে গণ্য হলেও কিছু দিন আগেও তা সামাজিক দৃষ্টিতে অনৈতিক বা সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হতো।

তাই, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে। তবে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বা পরিবর্তন নাও বোঝাতে পারে।

তবে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ স্বতন্ত্র হলেও উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রবিনসন ক্রুসোর মত সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্য নৈতিকতার প্রশ্ন অবান্তর। নৈতিক মূল্যবোধের পরিপূর্ণতা ও বিকাশের স্বার্থে সমাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজই মানুষের নৈতিক শিক্ষাবোধের শিক্ষায়তন। সত্য ও সুন্দরের কামনা অর্থহীন হবে, যদি সত্য ও সুন্দরের লালনভূমি হিসেবে সমাজ না থাকে। সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ আমাদের নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য। পক্ষান্তরে নৈতিক চেতনা বা বোধ একটি অনন্য ধারণা হলেও, সামাজিক আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এমনকি সামাজিক কুসংস্কার বা প্রথাকে পরিহার করতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। তাই বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও মহামানবগণ তাদের অনমনীয় ও অনন্য নৈতিক মূল্যবোধের বলেই নিজ নিজ সমাজের অনেক কুপ্রথা ও অনিয়মের সংস্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

নৈতিকতা ও ধর্ম সাধারণত একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। অনেকের ধারণা যে, নৈতিক মূল্যবোধ মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধের নামান্তর। কিন্তু আসলে কি তাই? নৈতিক মূল্য যে ধর্মীয় মূল্য থেকে বেশ পৃথক এবং এর যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে তা অনুধাবন না করতে পারলে অনেকের মত আমাদের মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

৬. ডঃ এস. আবদুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

প্রসঙ্গত নৈতিকতা বা মূল্য আমাদের আচরণের ভালত্ব বা মন্দত্বের মূল্যায়ন। এ এমনি এক ধরণের নৈতিক চেতনা বা মূল্যবোধকে বুঝায় যা আমরা কোন বস্তু বা ঘটনাকে কোন নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করে থাকি। আর ধর্মীয় চেতনা অতীন্দ্রিয় সত্তা বা সত্তাসমূহের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। নৈতিক ক্রিয়ার মূল্যায়ন থেকে যেমন আমাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম নেয়, ঠিক তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি থেকেও আমদের মধ্যে কতগুলি ধর্মীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।

ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বা মূল্যবোধের সঙ্গে নৈতিক নিয়ম বা সূত্রের অনেকাংশে মিল রয়েছে। যেমন প্রতারণা না করা, কামুকতা থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা না বলা, ইত্যাদি নৈতিক বিধি বা নিয়মসমূহ ধর্মীয় অনুশাসন বা অনুশীলনের ও বিষয়। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সাথে নৈতিক বিধি-নিষেধের উপরোক্ত মিল থাকার জন্য অনেকের ধারণা যে নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা এক ও অভিন্ন। তাদের ভ্রান্ত ধারণার পেছনে যে বদ্ধমূল বিশ্বাস কাজ করছে তা হচ্ছে নৈতিকতা ও ধর্ম একই আদি সূত্র থেকে উদ্ভূত। উল্লেখ্য, মানবজাতির সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের সূচনা ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি বা বিশ্বাস সবচেয়ে পুরাতন। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় ধর্মই সর্বপ্রথম, তারপর সামাজিক প্রথা বা রীতি-নীতি এবং পরিশেষে, ভাল-মন্দ'র ধারণা বা নীতিবোধের সূচনা। ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় রীতি-নীতি নৈতিক নিয়ম বা সূত্রের চেয়ে অনেক আগে থেকেই মানবজাতির কাছে পরিচিত বিধায় আমাদের অনেকের হয়ত ধারণা যে নৈতিক অনুশাসন মূলত ধর্মীয় বিধি-নিষেধের পরিবর্তিত রূপ। আসলে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সাথে অধিকাংশ নৈতিক বাণীর মিল থাকলেও, একথা বলা ঠিক হবে না যে নৈতিকতা ধর্মীয় মূল্য থেকে উদ্ভূত। মোট কথা, ধর্মের যেমন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তেমনি নৈতিকতারও একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যথায়, ধর্মীয় বিধিমালা এবং নৈতিকতার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণাগত (conceptual) যৌক্তিকতা কাজ করে, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে প্রধানত বিশ্বাস ও অনুভূতি কাজ করে। ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধের উৎস স্রষ্টা কিন্তু নৈতিক চেতনা আসে ব্যক্তির নিজস্ব অন্তঃস্থ ধারণা থেকে। তা ছাড়াও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ধর্মীয় অনুভূতির অনুপ্রেরণা আসে, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও আমাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের সঞ্চার হতে পারে। অতএব, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ এক বা অভিন্ন নয়।[৭]

তবে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার নিজ নিজ অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও উভয় উভয়কে প্রভাবিত করতে পারে। নৈতিকতার আলোকে যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব, তেমনি ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের নৈতিক চেতনা-নীতি জ্ঞানের বিকাশ সাধনে সহায়তা করতে পারে।

---

৭. ডঃ এস. আবদুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

ইসলাম ও সামাজিক মূল্যবোধঃ

সামগ্রিক জীবনদর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামের পরিধিভুক্ত। এজন্যই মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আজ তোমাদের ধর্মব্যবস্থা সর্বাঙ্গ সুন্দর ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।"[৮]

তাই ধর্ম শব্দের প্রচলিত অর্থে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না। ব্যক্তি এবং স্রষ্টার মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক সীমিত সম্পর্ক স্থাপনই সাধারণতঃ ধর্মের আওতায় আসে। কিন্তু ইসলাম এই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। ইসলাম একদিকে যেমন স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অপরদিকে তেমনি মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্টজগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সম্পর্কও সংজ্ঞায়িত করে। সমগ্র জীবনকেই বেষ্টন করে আছে ইসলাম। জীবনের এমন কোন দিক নেই; যা ইসলামে বর্ণিত হয়নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। তাই ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "That is combines all the grandest and the most prominent features in all ethnic religions, compatible with reason and the moral intuition of man .... It is not Merely a system of positive moral rules based upon a true conception of human progress but it also the establishment of certain principles, the enforcement of certain dispositions, the cultivation of a certain temper of mind which the conscience is to apply to the ever-varying exigencies of time and place".[৯]

ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়, সেখানে থাকবে শুধু সুখ আর সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ।

---

৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩

৯. Syed Amir Ali, The Spirit of Islam, Delhi, 1947, P. 178

ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায় বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে।

মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি:

ইসলামের মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই।"[১০] এটাই হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। এই সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতিত কেউ মানুষের উপরে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। অতএব, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর সামনে মানুষের মাথা নত করার দরকার নেই। মুসলমান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জলপথে। আর তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপরে তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।"[১১] সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতপর আমি ইহাকে নীচাশয়দের মধ্যে নীচ করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"[১২] কুরআন আরেকটি ঘোষণা দিয়েছে যে, নারী, পুরুষ, সাদা-কালো নির্বিশেষে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তোমাদের রব ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করছি।"[১৩] খলিফা সম্পর্কিত ধারণাই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর রুবুবিয়াতের কাজ (লালন ও পালন নীতি) মানুষ তারই প্রতিনিধি হিসেবে করে যাবে। যেহেতু মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব,তাই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন আদমকে সম্মানসূচক সিজদা দানের মাধ্যমে প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে।[১৪] স্রষ্টা স্বয়ং মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

---

১০. আল-কুরআন, ২:২৫৫

১১. আল-কুরআন, ১৭:৭০

১২. আল-কুরআন, ৯৫:4-৬

১৩. আল-কুরআন, ২:৩০

১৪. আল-কুরআন, ২:৩৪

সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে যাতে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সমগ্র সৃষ্টির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারে। কেননা, এ বস্তুজগতে মানুষের মর্যাদা অনেক বড়। মানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বলোকের সৃষ্টি।

তাই এ বিশ্বলোককে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য। মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে এর ব্যবহার করবে। এসবই মানুষের কল্যাণে নিয়োযিত। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "একমাত্র তিনিই পৃথিবীর সকল বস্তু তোমাদের (মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১৫]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তিনিই; যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে। আর আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি যা দ্বারা তিনি উৎপন্ন করেছেন ফল-মূল ও খাদ্যশস্য তোমাদের রিযিকরূপে। তিনি নৌকা-জাহাজ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন, যাতে তা সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর বিধান মত। তিনি ঝণাসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োযিত করেছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োযিত করেছেন আবর্তনশীল চন্দ্র ও সূর্যকে। তিনি তোমাদের জন্য নিয়োযিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং এভাবে তোমরা যা চাও- যা প্রয়োজন মনে কর তা সবই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্র দেয়া এসব কল্যাণকর দ্রব্য-উপকরণ গণনা করতে চেষ্টা কর, তাহলে তা কখনোই পারবে না।"[১৬] "তুমি কি দেখতে পাওনা যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও যমিনের সবকিছু তোমার অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাপকভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে তার বদান্যতাকে তোমাদের দিকে প্রবাহিত করেছেন।[১৭] সুতরাং ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তার জন্যই এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানবজাতিকে সম্মানের আসনে বসায়। এই সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দেয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারঃ

ইসলামের অন্যতম একটি স্বীকৃত মূল্যবোধ হলো মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার আছে। ইসলামী বিধান মতে, প্রত্যেক মানুষ স্বীয় চেষ্টায় ভাল-মন্দ করে থাকে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "যারা সৎ কাজ করে তারা তা নিজের জন্যই করে থাকে এবং যারা অসৎ কাজ করে তারা তা নিজেদের জন্যই করে থাকে।"[১৮]

---

১৫. আল-কুরআন ২:২৯
১৬. আল-কুরআন, ১৪:৩২-৩৪
১৭. আল-কুরআন, ৩১:১০
১৮. আল-কুরআন, ৪১:৪৬

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।"[১৯] "যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে নিযুক্ত হয়, সে সম্পূর্ণভাবে তার নিজ দায়িত্বেই তা করে থাকে।"[২০]

"যে সৎ পথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে আর যে বিপথে গমন করে সে বিপথে গমনের দায়িত্ব নিজেই বহন করে।"[২১] সুতরাং বোঝা যায় যে, ইসলামে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম একটা মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করে। ইসলাম আল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তত্বকে যেমন একবাক্যে স্বীকার করে, তেমনই মানুষের মুক্তচিন্তা ও দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না। আল্লাহ্ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমিত। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তাকে ভাল-মন্দ বিচার করে চলতে হয়।[২২] মানুষের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। মানুষের জন্মকাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলে ভিতর-বাইরের সংগ্রাম। একদিকে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার সাথে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এদিক থেকেও মানুষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। মানুষের গোটা পরিবেশ এক বিরোধ-সংহতির ইতিহাস, এক বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস। কাজেই মানুষ যা চায় সব সময় তা পায় না, এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়। মানুষ তাই এক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন, এক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক।[২৩]

সকলের জন্য সমান সুযোগঃ

ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপরে সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র। মহানবী (স.) বলেছেন, "সাদা মানুষ কালো মানুষের উপরে নয় আর কালো মানুষ ও সাদা মানুষের উপরে নয়। সবাই সমান।"[২৪]

---

১৯. আল-কুরআন, ৩১:১১

২০. আল-কুরআন, ৪:১১১

২১. আল-কুরআন, ১০:১০৮

২২. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৮

২৩. ডঃ রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া ও ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৮৮

২৪. ফজলুল করীম, আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭, পৃ. ৪৬

ইসলাম সমাজে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। এতে জাতিভেদের চিহ্নও নেই। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তিনি চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমানভাবে সবার জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে।"[২৫] এ আয়াতে সম্পদ ভোগে কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। কোন প্রাণির মধ্যেও বৈষম্য করা হয়নি।

ইসলামী আইন অনুসারে কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করলে তাকেও সেই শাস্তিই দেয়া হত যে শাস্তি একজন মুসলমানকে হত্যা করলে দেয়া হত। যাতে কোন অবিচার বা যথেচ্ছার না হয়, সেজন্য কোন মুসলমান নাগরিককে অমুসলিম (জিম্মি) নাগরিকের সম্পত্তি ক্রয় করারও অধিকার দেয়া হয়নি। এমনকি, ইমাম এবং সম্রাট পর্যন্ত কেউই কোন অমুসলিমকে তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারতেন না। মহানবী (স.) বলেছেন, "তাদের (জিম্মি) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ ও পুরোহিত কাউকে বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি নষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'ওশর' জিম্মিদের নিকট হতে নেয়া হবে না। তাদের অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।"[২৬]

বায়তুল মাল সম্পর্কে হযরত ওমর রা. এর ঘোষণা–"আল্লাহ্‌র শপথ! এ রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ অপর কারো অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবি করতে পারে না। আমি নিজেও কারো অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবিদার নই।"[২৭] এ জন্য এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন, " ইসলাম মানব মনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়নীতির প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্যই জগতে অবশ্যম্ভাবী সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।"[২৮]

সামাজিক দায়িত্বঃ

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমিনে যা কিছু বিদ্যমান, তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তাআলা, মানুষ নয়–তা সে ব্যক্তিই হোক আর ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রই হোক। মালিকানা স্বত্তের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। ইসলাম মানুষের এ ধরণের অধিকার স্বীকার করে না।

---

২৫. আল-কুরআন, প্রাগুক্ত

২৬. যাদুল মায়াদের উদ্ধৃতি দিয়ে সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

২৭. ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬, পৃ. ১০১

২৮. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিক রূপে নয়–আল্লাহ্‌র রব (লালন ও পালন নীতি) গুণের প্রতিভূরূপে (খলিফা)। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এ ব্যবহারিক স্বত্ত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রম-শক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মের সংস্থান এই মৌল জীবিকার উপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হাক্কুল ইবাদ' আদায় করা। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ- ক্লেশে ও সংগ্রামে-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[২৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। কোন কিছুকে তাঁর শরীক বলে গণ্য করো না। সদাচার কর পিতা-মাতার সাথে, তোমার নিকটাত্মীয়ের সাথে, অনাথদের সাথে, অভাবিদের সাথে, তোমার প্রতিবেশির সাথে, যে তোমার জ্ঞাতি অথবা জ্ঞাতি নয়, তোমার সহযাত্রীর প্রতি, মুসাফিরের প্রতি এবং তাদের প্রতি তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণ করেছে।"[৩০] "যারা এতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশির উপকার করার ব্যাপারে উদাসীন–সে সকল উপাসনাকারী অভিশপ্ত।"[৩১] "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা হতে যা উত্তম তা ব্যয় কর।"[৩২]

---

২৯. আল-কুরআন, ২:১৭৭

৩০. আল-কুরআন, ৪:৩৬

৩১. আল-কুরআন, ১০৭:২-৪

৩২. আল-কুরআন, ২:২৬৭

সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন:

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,"তারা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কী খরচ করবে? বলে দিন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর।"[৩৩] আল্লাহ্ বলেছেন, "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৩৪] এখানে 'তামাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং কারো বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, কোন অঞ্চলের সম্পদ যে শুধু সে অঞ্চলেরই, ইসলাম এ স্বীকৃতিও দেয়নি।

ইসলামের মতে, সম্পদ শুধুমাত্র দুটি কাজে ব্যবহৃত হবে। এর একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরটি শিল্প কিংবা ব্যবসায় ব্যয় করা। আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ হতে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর।"[৩৫]

দারিদ্র বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কম-বেশি ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ্ তাআলা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য আছে তারা তা হতে সমাজ কল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অসচ্ছলতা ও টানা-পোড়নের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ্ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করুক। আল্লাহ্ কারো উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। অস্বাচ্ছন্দ্যের পর আল্লাহ্ তাআলা পুনঃ তাদেরকে সম্পদ দান করবেন।"[৩৬]

আল-কুরআনে মজুতদারদের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এই বলে–"তারা অভিশপ্ত, যারা ধন-সম্পদ মজুত করে আর গুণে গুণে রাখে, ভাবে, তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে নিরাপত্তা বিধান করবে।

৩৩. আল-কুরআন, ২:২১৯

৩৪. আল-কুরআন , ২:২৯

৩৫. আল-কুরআন, ৬৩:১০

৩৬. আল-কুরআন, ৬৫:৭

নিশ্চয়ই নয়। এই সম্পদ তাদেরকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে যা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে।"[৩৭] সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ধন সম্পদের অপচয় করো না, যারা এভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[৩৮] ইসলাম মানুষকে সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। এভাবেই ইসলাম সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সামগ্রিক জীবনবোধ:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান বলে মানব জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলাম সমাজের অখণ্ডসত্তায় বিশ্বাসী এবং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সমাজকে পৃথকভাবে বিচার না করে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা হয়।

সাম্য ও গণতন্ত্র:

ইসলামের মৌল সামাজিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অপরাপর মূল্যবোধসমূহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্যের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলি ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল।"ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ চর্মকার, অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" [৩৯] ইসলামী মৌলতত্ত্বের খোঁজ নিতে গেলে দেখা যায় ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, সকল মানুষ একজন মানুষ থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকেই সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।"[৪০]

সুতরাং সমগ্র মানব জাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে্ সুতরাং জাতি ও গোত্রের এই প্রকার ভেদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হওয়া উচিৎ যে, এটি তার পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে হবে। এজন্যই আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।"[৪১]

---

৩৭. আল-কুরআন , ১০৪:২-৪

৩৮. আল-কুরআন , ১৭:২৬-২৭

৩৯. শাহেদ আলী সম্পাদিত, ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট, ১৯৭৬, পৃ. ১৪-১৫

৪০. আল-কুরআন, ৪:১

৪১. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

এরপর জীবনে কতক লোক সামনে এগিয়ে যায় এবং কতক লোক পেছনে পড়ে থাকে। কেউ ধনী হয়, কেউ পরমুখাপেক্ষী হয়, কেউ শাসক হয়, কেউ শাসিত হয়, কতক জাতির বর্ণ সাদা হয়, কতক জাতির চামড়া কালো হয়। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এ ধরণের উঁচু-নীচু ও ছোট-বড় হওয়া মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ ঘটাবে, এটা হতে দেয়া যায় না এবং ইসলাম তা হতেও দেয় না। গরীবের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের, কালোর উপরে সাদার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা কেবল সততার ভিত্তিতে। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে মুত্তাকী।"[৪২]

আইনের চোখে সবাই একই রকম। সবার উপর আইনের কর্তত্ব সমভাবে কার্যকর। তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু ন্যায়ের ভিত্তিতে—"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ন্যায় কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও অন্যায় কাজ করবে সেও তা দেখবে।"[৪৩] সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। যে শক্তিশালী সে দুর্বলকে সাহায্য করে। এভাবে গোটা সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির সেবকে পরিণত হয়। মহানবী (স.) বলেছেন, "পারস্পরিক স্নেহ-মমতায় মুসলমানদের উদাহরণ একটা একক দেহের মত। দেহের একটা অঙ্গ যখন রুগ্ন হয় তখন সবকটা অঙ্গ তার সাথে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়।"[৪৪] এভাবে ইসলাম ক্রমাগত ঘোষণা করে আসছে যে, মানব একটা একক সত্তা এবং এর সদস্যগণ সব একই মাতা-পিতার সন্তান ও ভাই-বোন। আল-কুরআন যে বারবার 'হে মানব জাতি' এবং 'হে আদম সন্তানরা' বলে সম্বোধন করে থাকে, সেটা এই জন্যই করে থাকে যেন মানুষের মনে মানবীয় ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি ও বদ্ধমূল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুসলমানদের 'হে আদম সন্তানরা' বলে সম্বোধন করে থাকে, সেটা এই জন্যই করে থাকে যেন মানুষের মনে মানবীয় ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি ও বদ্ধমূল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুসলমানদের 'হে মুমিনগণ' এবং 'হে ঈমানদারগণ,' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাদের ভেতরে বংশীয় বা শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।"[৪৫]

ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এইরূপ চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব।

একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার, যারা সমাজের সদস্য অথবা রাষ্ট্রের পরিচালক অথবা একজন নেতা, যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী, এদের সকলেরই করণীয় হল নিজ দায়িত্বে অন্তর্নিহিত সেই কর্তব্যসমূহ পালন করা। আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনিই সেই সুমহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে তিনি

---

৪২. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

৪৩. আল-কুরআন, ৯৯:৭-৮

৪৪. ওলী উদ্দীন মোহম্মদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, বাবুল বিররি ওয়াসসিলা দ্রষ্টব্য।

৪৫. ড. মুস্তফা আস্ সিবায়ী (অনুবাদ, আকরাম ফারুক), ইসলামী সভ্যতায় মানবপ্রেম, মাসিক পৃথিবী, মার্চ-১৯৯৯, পৃ.২৪

অপর কারো উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"[৪৬] "হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীর একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি, অতএব মানুষে মানুষে যথার্থ বিচার করো এবং বাসনার শিকার হয়ো না যা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে।"[৪৭]

এখানে যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে–সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব, যে মানবগোষ্ঠী প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ প্রতিনিধি এবং যাদের ইসলামের নবী মনোরম ব্যক্তিত্বের গুণে বিভূষিত করেছিলেন। এ ধর্ম তাদের জন্য যারা পরবর্তী কালে আল-কুরআন অনুমোদিত নিম্নোক্ত দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, "মানবতার জন্য গড়ে তোলা সকল সমাজের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ সমাজ। তোমরা সদাচরণের নির্দেশ দাও এবং অন্যায়কে নিষিদ্ধ কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখ।"[৪৮] "আমরা তোমাদের একটি মধ্যস্ততাকারী সমাজ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি, তোমরা সেই সমাজের নকশা যা মানবতার জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।"[৪৯]

যারা ইসলামের গণতন্ত্র গঠন করেছিলেন এমনি ছিল তাদের চরিত্র। হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), ও হযরত আলী (রা.) প্রমুখ জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষগণ সকলেই সামান্য দীনহীন কুলি ও মজদুরের সঙ্গে উঠা-বসা ও পানাহার করেছেন। তাঁর সামান্য দিন মজুরের কাজ করেছেন, ঝাড়ু দিয়েছেন, অপরের মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেছেন। রাজার আসনে বসেও সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন। ক্রীতদাস বেলালের অধীনে খুলাফা-এ-রাশেদীনের বরেণ্য জননেতাগণ মানুষের সেবা করেছেন। সেখানে কোন রাজপ্রাসাদ, রাজার বৈভব ও ঐশ্বর্য অথবা বিলাসের কোন সামগ্রী ছিল না। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝেও তাদের গৃহে অন্ন থাকত না। বিশাল ভূ-খন্ডের অধিপতি সত্ত্বেও হযরত উমরের পরিধানে ছিল অসংখ্য তালিযুক্ত কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানি ছিল তাঁর খাদ্য। এই প্রতাপশালী শাসক জেরুজালেম প্রবেশ করেছিলেন উষ্ট্রের রশি ধরে আর উষ্ট্রচালক উটের পিঠে বসা ছিল; মনিব-দাসের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। ভ্রাতৃত্বের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, সাম্য ও মানবতার এবং অনবদ্য ছবি ইতিহাস আর কোনদিন দেখেনি।

কুরআনের উদাত্ত ঘোষণা, "নিশ্চয়ই মানব জাতি এক অখন্ড সমাজ।"[৫০] মহানবী (স.) বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার।" যদি তোমরা স্রষ্টাকে ভালবাসতে চাও, তবে মানবজাতিকে ভালবাস।" "যদি সেই প্রভুর সামনে যেতে চাও, তবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবাস, যা তোমরা নিজের জন্য ভালবাস, তাদের জন্য তাই ভালবাসবে; যা নিজের জন্য বর্জন কর, তাদের জন্য তাই বর্জন করবে; তুমি তাদের প্রতি সেই ব্যবহার কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর।" "তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করো না, পরস্পর হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না, তোমরা আল্লাহ্‌র দাস ও পরস্পর পরস্পরে ভাই হয়ে যাও।" "মানুষের কল্যাণ যে সবচেয়ে বেশি করে, সেই সবচেয়ে বেশি ভাল মানুষ।"[৫১]

---

৪৬. আল-কুরআন, ৫:৪৯

৪৭. আল-কুরআন, ৩৮:২৬

৪৮. আল-কুরআন, ৩:১১০

৪৯. আল-কুরআন, ২:১৪৩

৫০. আল-কুরআন, ২:২১৩

৫১. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ – ৪৫

এই মহৎ আদর্শের সুর কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কুরআন মানুষকে মর্যাদা দান করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, "যে ব্যক্তি অন্য প্রাণের বিনিময়ে বা ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ বিস্তার প্রতিরোধ করা ব্যতীত অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি কোন মানুষকে রক্ষা করল সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে রক্ষা করল।"[৫২] এতে বুঝা যায় যে, সাম্য-মৈত্রী ও বিশ্ব মানবতার মহোত্তম আদর্শ হল ইসলাম। এজন্য Professor Hurgonje বলেছেন, æMohammad was claiment to new religion. ....The League of Nations, founded by the Prophet of Islam, put the principle of international unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candle to the other nations. Today the black Christians can not enter the church meant for the white Christians. A Christian missionary is boicotted for marrying a Negro woman. Human beings are buried alive. There are numerous other things of the kind attributed to the Christian society. The fact is that no other nation of the world can show a parallel to what Islam has done towards the realisation of the idea of a League of Nations." [৫৩]

সরোজিনী নাইডুর ভাষায়, "Centuries ago when my forefathers were evolving great philosophies and seeding to the younger nations a message of enlightenment, Arabia was still uncultured, Arabia was nothing but a desert of wild hordes. When the great Buddhist message of Nivran was being enunciated from the Bo-tree by Buddha at Gaya and Sarnath, there was no conception of what the word `Democracy' meant. When Christ was crucified upon the cross by the unbelievers, even then the idea of brotherhood was not accepted. It was challenged and trampled in the dust. It was necessary that a camel-driver from Arabia should give to the world in the ultimate form the most perfect defination of brotherhood of the republic of eqality of all men, of all classes, of all ranks."[৫৪]

সামাজিক ন্যায়বিচারঃ

সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এটি সাম্য ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল-দুর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম যে সুবিচারনীতি উপস্থাপন করেছে তা সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়–তা বংশের দিক দিয়েই হোক আর বর্ণ, ভাষা বা সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই হোক। এমনকি আকীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণেও আইন প্রয়োগে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার কার্য করবে তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে।"[৫৫] "হে ইমানদারগণ, ন্যায়বিচারে তোমরা অটল থাকবে, আল্লাহ্র পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীরূপে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের প্রতিকূলে যায় অথবা পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতিকূলে যায়। সে ধনী অথবা গরীব যাই হোক, আল্লাহ্ই উভয়ের জন্য উত্তম অভিভাবক।"[৫৬]

---

৫২. আল-কুরআন, ৫:৩২

৫৩. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ – ৫৬

৫৪. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ – ৫৩

৫৫. আল-কুরআন, ৪:৫৮

৫৬. আল-কুরআন, ৪: ১৩৫

মহানবী (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "অনারবের উপর একজন আরবের কোন কর্তৃত্ব নেই, যেমনি নেই একজন আরবের উপর আরেকজন আরবের। মাটির তৈরি আদমের পরবর্তী বংশধর হল মানুষ।" তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, বিশেষ সুযোগের প্রতিটি দাবি তা রক্তের হোক আর সম্পত্তির হোক সেদিন থেকে তাঁর পদতলে। রসূল (স.) কখনো নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেননি। কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তিনি আর সকলের মতই মানুষ। ব্যতিক্রমটা হল, তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ওহী আসে। তিনি সামাজিক আচরণেও কখনোই কোন বৈশিষ্ট্যের দাবি করেননি।"[৫৭] তিনি ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। মাখযূম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী একজন মহিলা চুরি করলে মহানবী (স.) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য ব্যাপারটা বড়ই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। মহিলাটি সম্মানিত কুরাইশ বংশের ছিল বলে ওসামা বিন যায়েদ তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে মহানবী (স.) বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র শপথ! চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি মুহাম্মাদ-কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তাঁর হাতও না কেটে ছাড়তাম না।"[৫৮]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর একজন গভর্নর আবু মুসা আল-আশআরী (রা.)। তাঁর নিকট প্রেরিত বিচার প্রশাসন সম্পর্কিত তাঁর (হযরত ওমর (রা.) চিঠিখানি ইসলামে আইনের শাসন ও আইনের চোখে সকলে সমান এ নীতির আরেকটি বড় প্রমাণ। চিঠির বক্তব্য: "সবার সাথে এমন বিচার কর যাতে বড়লোক ও শক্তিশালীরা তোমার বিচারের ব্যাপারে নির্ভিক না হয় এবং দরিদ্র ও দুর্বলেরাও তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী হতে ভীত না হয়।"[৫৯] এজন্য হযরত ওমর রা. হজ্জের সময় সমবেত জনতার সামনে তার গভর্নরদের উপস্থিত করতেন এবং লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করতেন, "হে জনতা, এরা সরকারী ভাণ্ডার থেকে জাতীয় সম্পদ প্রয়োজনমত তোমাদের মাঝে বণ্টন করবেন। এদের কেউ যদি এর বিপরীত কিছু করতে থাকে তাহলে এই জনসমাবেশে তাঁর বিরুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ কর।"[৬০]

ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও পূর্ণমাত্রায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করেছে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনজ্ঞদের সূত্র হল, "আমাদের জন্যও যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যও তাই এবং আমাদের উপরে যেসব দায়িত্ব, তাদের উপরও তাই।"[৬১] হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "অমুসলিম নাগরিকগণ জিজিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতই সংরক্ষিত হবে।"[৬২]

---

৫৭. আল-কুরআন, ৪১:৬

৫৮. তাফসিরুল উসূল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪

৫৯. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল-ফারুক, (অনু. মৌ. জাফর আলী খান), ১ম খন্ড , লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ১৬

৬০. মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ, তাবাকাত, দারু ইয়াহইয়া আততুরছিল আরবী, বৈরুত,লেবানন-১৯৯৬, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৯৩

৬১. ড. আব্দুল করিম জায়দান, (অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ.৮২

৬২. হযরত আলী (রা.) "প্রশাসনের মূলনীতি" (অনু.খালেদ চৌধুরী), ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ.২২

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক সংকটের ধারণা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ব্যাপ্তি ও কারণ

নৈতিক সমস্যা ও সংকট:

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে সমাজে বসবাস না করে পারে না। সমাজের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত। এই বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কই নৈতিকতার উৎস। এই পারস্পরিক সম্পর্ক মানুষের অস্তিত্ব তথা নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তার ওপর কিছু দায় দায়িত্ব আরোপ করে। এই দায় দায়িত্ব সম্পাদন যথাযথ হলে সমাজ স্থিতিশীল হয়, সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। আর যদি না হয়, তার উল্টোটি ঘটে তবে সেখানে সমস্যা দেখা দেয়, সংকট উপস্থিত হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দায়-দায়িত্ব কোথা থেকে আসে এবং কেই বা এই দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই প্রশ্নের উত্তর একেবারে সহজ, সরল নয়। এ নিয়ে বহু বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সব বিতর্ক এড়িয়ে একটি লক্ষ্যে আমরা একমত হতে পারি যে, আমরা সমাজের অন্তর্ভূক্ত সকল মানুষেরই কল্যাণ চাই। আর এই সার্বিক কল্যাণই আমাদের সকলের ব্যক্তিগত কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করবে। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, প্রত্যেক সমাজে মানুষ কোন না কোন ধর্ম অনুসরণ করে চলে। সমাজের সাধারণ মানুষ ধর্মের বাহ্যদিক নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ তারা ধর্মের বিধি-নিষেধের প্রতি নজর দেয়। এইসব বিধি-নিষেধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। ধর্মীয় বিধি-বিধানকে নৈতিকতার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে জগতের বড় বড় ধর্মের মধ্যে নৈতিকতা বিষয়ে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও নৈতিকতার দিক থেকে অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, ধর্মের মূল লক্ষ্য সুসংহত কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা।[১]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আদিম যুগ থেকে আধুনিক সুসভ্য যুগ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ জরিপ করলে দেখা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের বুদ্ধির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে মানুষ ধর্মের নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে ধর্মীয় বিধি-বিধান, এমনকি ধর্মের অন্তর্ভূক্ত নৈতিক বিধি-বিধান অন্ধ-বিশ্বাসের ব্যাপার না হয়ে বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে। এই যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে সামাজিক পরিবর্তন, এই সব বিষয় মানুষকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষ যে সব সময়ে ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করে এমন নয়। কোন কোন সময় প্রবৃত্তির তাড়নায়ও পথ চলে। বিচিত্র পথে মানুষের গতি, বিচিত্র যুক্তি তার চলার পথের হাতিয়ার। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক নিপীড়ন বা অবমূল্যায়নও অনেক সময় কাজে প্ররোচিত করে। অনেক সময় রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন বলবৎ করার ব্যাপারে শিথিলতাও নাগরিককে যথার্থ পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে পা বাড়ানোর সুযোগ করে দেয়। তাই বলা যায়, বিচিত্র পথে মানুষের পদচারণা। মানুষ সব সময় সর্বত্র বুদ্ধির প্রেরণায় কাজ করে, এমন নয়।অনেক সময় মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, বুদ্ধির দোহাই দিয়ে তাঁর পথ চলাকে যৌক্তিক করে তোলে।

---

১. ড. রশীদুল আলম, নীতিশাস্ত্র পরিচয়, মেরিট কেয়ার পাবলিকেশন, ঢাকা-২০১১, পৃ. ৩১৭

বুদ্ধির গতি সর্বদা একমুখি নয়। এটা একই সঙ্গে গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক। একই বুদ্ধি এক সময়ে সহজ, স্বাভাবিক পথনির্দেশ করে, আবার কোন কোন সময় বাঁকা-অস্বাভাবিক পথেরও নির্দেশ করে থাকে। কোন কোন সময় ব্যক্তির অহমিকাবোধকে প্রাধান্য দেয়, কোন কোন সময় আবার সমাজ চেতনা, সমাজ সংহতিকে বড় করে দেখে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা সীমিত থাকলে হয়ত তেমন কোন সমস্যা বা সংকট দেখা দেয় না। কিন্তু বৈপরীত্ব যখন সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সমাজের বেশির ভাগ মানুষকে তখন সার্বিক কল্যাণের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, তখনই সংকট উপস্থিত হয়। এ অবস্থা সমাজের কারো জন্য কল্যাণকর হয় না।[২] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'ঘুষ'। সমাজে যাদের ঘুষ নেয়ার মত সুযোগ রয়েছে তাদের সবাই ই যদি ঘুষ খায়, তাহলে কেমন হবে? পারস্পরিক বিপর্যয় শুরু হবে। বেশ কিছুদিন আগে টেলিভিশনে একটা ধারাবাহিক নাটক প্রচার করা হয়েছিল। তার মূল বিষয়বস্তু ছিল চাকরির মধ্যে আছি বলে মাসিক বেতন পাই। আর অফিসে কাজ করার জন্য 'উপরি' টাকা চাই। কাজেই এ টাকা আমার প্রাপ্য। দেখা গেল, প্রায় সব অফিসে বুদ্ধিমান কর্মকর্তা-কর্মচারিরা পয়সা না পেলে কাজ করেন না। যুক্তি এই যে, We are in service. কাজেই মাসে মাসে বেতন পাই, আর অফিসে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাই। আরো কথা আছে, যে টাকা বেতন পাই, দিনকাল যা, তাতে কুলোয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে এধরণের ঘুষ-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করতে পারে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতা না থাকার কারণেও এটা সম্ভব হতে পারে। দুর্নীতি দমন বিভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত থাকলে, প্রশাসনে ঘুষ-ঐতিহ্য থাকলে এমনটা ঘটতে দেখা যায়। এটা কেবলমাত্র ছোট বা অস্থিতিশীল রাষ্ট্রেরই বিষয় নয়, বড় বড় রাষ্ট্রেও উপরস্থ কর্মকর্তাদেরকে এই ধরণের বড় অংকের ডলার বা পাউন্ড হাতাতে দেখা যায়। ধরা পড়লে সে কেলেঙ্কারী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এইসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা বিচারশক্তির পরিবর্তে লোভই বড় হয়ে দেখা দেয়।

সন্ত্রাস একটি বড় ধরণের নৈতিক সংকট। এর রূপও বিচিত্র। এটা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশে জমি দখল, বাড়ি দখল, রাজনৈতিক খুন, স্মাগলিং ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস সংঘটিত হতে দেখা যায়-এর কারণ ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক রেষারেষি, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের লোভ ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসও সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো নৈতিক অধঃপতন। কাজেই এই ধরণের ঘটনাকে নৈতিক সংকট বলে অভিহিত করা যায়। নৈতিকভাবে অধঃপতিত না হলে এই ধরণের ঘটনার জন্ম দেয়া যায় না। এইসব নৈতিক সংকট থেকে দেশ, জাতি ও বিশ্ব সমাজকে বাঁচাবার চিন্তা মানুষকে আজ ভাবিয়ে তুলেছে।[৩]

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১৮

৩. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আমেরিকার সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগন ও নিউইয়ার্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার ঘটনাটি ছিল বিশ্ববাসীকে চরম আতঙ্কিত ও বিচলিত করার মত একটি মারাত্মক ঘটনা। ঘটনাটি ছিল যতটা না ভয়ংকর ও ক্ষতিকর তার চেয়ে শতগুণ ভয়ংকর ও ক্ষতিকর ছিল এর প্রতিশোধস্পৃহা। এই প্রতিশোধ স্পৃহার শিকার হয় নিরীহ দু'টি সমৃদ্ধ দেশ আফগানিস্তান ও ইরাক। আক্রমন-প্রতিশোধ উভয় দিক বিবেচনা করলেইদেখা যায় যে, এ ঘটনা মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত একটি নমুনা।

'নৈতিক সমস্যা' ও 'নৈতিক সংকট' মূলত পৃথক দু'টি বিষয় নয়। নৈতিক সমস্যা ব্যাপক ও ঘনীভূত হলেই তা নৈতিক সংকটে রূপ নেয়। আমরা জানি নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কোন নৈতিক আদর্শের আলোকে ব্যক্তির বা সমাজের কার্যাবলির বিচার বা মূল্যায়ণ করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ। এটা থেকে বুঝা যায় যে, নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দু'টি দিক রয়েছে–শুধু নৈতিকতার জ্ঞানমূলক আলোচনাই জীবনকে মহৎ ও উন্নত করতে পারে না, জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগই জীবনকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নৈতিকতার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দু'টি দিকই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষা ও নৈতিক আচরণের মিল হওয়া প্রয়োজন। এ মিলের অভাব ঘটলে সমাজে নৈতিক সমস্যা দেখা দেয় এবং সমস্যার পথ ধরে নৈতিক সংকটও উপস্থিত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। তাই সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সমাজে যাতে নৈতিক সংকট উপস্থিত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর উপস্থিত হলে তা নিরসনে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে।

সমাজবদ্ধ সত্তা হিসেবে মানুষকে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। এসব মেনে চলার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব এমনকি স্বার্থও রক্ষা পায়। এ মেনে চলা যেমন সামাজিক তেমন মানুষের প্রকৃতিগতও । মানুষ তার অন্তর তাড়না ও তাগিদে অন্য মানুষের সাথে মিলিত হয়, বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সামাজিকতা রক্ষা করে, প্রতিবেশির সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখে। এজন্য সে একটা অন্তর্গত বাধ্যবাধকতাও অনুভব করে। তার মনে প্রশ্ন জাগে অন্যের সাথে তার আচরণ কেমন হবে, কী তার করা উচিৎ হবে, কী উচিৎ হবে না, কোন্ কাজে মঙ্গল হবে, কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর, কোনটা বাঞ্ছনীয় আর কোনটা অবাঞ্ছনীয়? এসবই নৈতিকতার প্রশ্ন। এসব বিষয়কে এড়িয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করতে পারে না। তাই সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস করার জন্য মানুষকে নৈতিকতাও অবলম্বন করে চলতে হয়।

কিন্তু মানুষ সবসময় নৈতিকতা মেনে চলে না। সে স্বেচ্ছায় নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে, নিয়ম-নীতিহীন ও দুষ্কর্মের প্রতি ধাবিত হয়। এটা যে সে অজ্ঞাতসারে করে তা নয়। বরং সে সজ্ঞানেই অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়; সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থকে পদদলিত করে। স্বীয় স্বার্থের কাছে সে অন্ধ হয়ে যায়। সমুদয় মূল্যবোধ ও বিবেকের বাণীকে সে জলাঞ্জলি দেয় নির্দ্বিধায়। সে হয়ে যায় তার কুপ্রবৃত্তির পুতুল। তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এ অবস্থায় কুপ্রবৃত্তির হুকুম তামিল করাই তার অন্যতম কাজ হয়ে যায়। কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি তার সুকুমারবৃত্তি, নীতিবোধ, ঔচিত্য-চেতনা, মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তা, দেশপ্রেম, মানবতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা, আদর্শ ও ত্যাগের মহিমা প্রভৃতি সদ্গুণাবলিকে ধ্বংস করে দেয়। তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসকে বিকৃত করে দেয়। এও তার প্রকৃতিগত। মানব প্রকৃতিতে দু'ধরণের প্রবণতা রয়েছে: সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, হিতকর-ক্ষতিকর, সুন্দর-কুৎসিৎ, ক্ষমা-প্রতিশোধ, দয়া-নিষ্ঠুরতা, রাগ-বিরাগ, পরার্থতা বা স্বার্থপরতা–এ দ্বিবিধ উপাদানই মানব প্রকৃতিতে রয়েছে। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ও নৈতিক সংস্কারের জন্য মানব প্রকৃতির এ দ্বিবিধ উপাদানকে বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হতে হবে।

মানবাচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিঃ

মানুষের মনোজৎ ও মানসিক অবস্থা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার চিন্তা-চেতনা, আবেগ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি তার কর্মে প্রতিফলিত হয়। সৎ ও মঙ্গল চিন্তা যার প্রবল তার কর্মও সৎ এবং মঙ্গলময় হয়ে থাকে। মহৎ চিন্তা মহৎ কর্মের জন্ম দেয়। আর অন্যায় চিন্তা ও ভাবাবেগ অন্যায় কর্মের জন্ম দেয়। অন্তত চার ধরণের মানসিক অবস্থা মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। (১) চিন্তা বা ধারণা। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ধারণা রয়েছে যা আমাদেরকে কোন কর্মের দিকে ধাবিত করে। যেমন, জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশের চিন্তা আমাদেরকে জানালা বন্ধ করার জন্য উদ্বিগ্ন করে, এবং আমরা জানালা বন্ধ করি। চিন্তা ধারণার এ ধরণের গতি সঞ্চালনকে 'ধারণা গতি সঞ্চালক প্রবণতা' (indeo-motor tendency) বলে অভিহিত করা হয়। (২) কামনা। কামনাও আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। কামনা প্ররোচকের ভূমিকা পালন করে। কামনার উদ্ভব ঘটে কোন না কোন অভাববোধ থেকে। যেমন-আমরা যখন ক্ষুধা অনুভব করি, তখন আমরা খাদ্যবস্তু কামনা করি এবং খাদ্য গ্রহণ করি। (৩) অসচেতন মানসিক প্রবণতা। এটি অবচেতন মনের ক্রিয়া। এটিও অনেক সময় আমাদেরকে সচেতন কামনার মত কর্মে প্রবৃত্ত করে । তবে এ ধরণের প্রবণতা সম্পর্কে আমরা তৎক্ষণাৎ সচেতন থাকি না বা এ প্রবণতা সম্পর্কে আমরা ঐ মুহূর্তে ভীত হই না। এটা আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়। (৪) বিবেক (conscience) বিবেক মানুষের একটি অন্তর শক্তি। এ শক্তির দ্বারা মানুষ তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে। কোনটি ভাল বা মন্দ, কোনটি উচিৎ বা অনুচিত তার নির্দেশ ব্যক্তি বিবেক থেকে পেয়ে থাকে।[৪] এই মানসিক প্রবণতাসমূহ স্থির, অবিচল ও স্থায়ী নয়। আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত ও জৈবিক প্রভাবে প্রবণতাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। নৈতিকতা, নৈতিক আচরণ, সত্য-সুন্দর-শুভ ইত্যাদি বা এর বিপরীত গুণাবলি এসব প্রবণতার উপরে নির্ভর করে। নৈতিক চিন্তা ও তার অনুশীলন, ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও শুভের ধারণা এই প্রবণতাগুলোকে শ্রেয়ঃনীতির ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে পারে।

মানুষের নৈতিক অগ্রগতি ও উৎকর্ষের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও নৈতিক অবস্থার যোগ রয়েছে। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। তাই ব্যক্তির আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা সমাজের উপরে যেমন প্রভাব বিস্তার করে তেমনি সমাজের ন্যায়-নীতি, রীতি-প্রথা, মূল্যবোধ ও আদর্শও ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ যদি উন্নত আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ইত্যাদির লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়, অনিয়ম, দুষ্কৃতি, দুর্নীতি যদি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়, সে সমাজে ব্যক্তির পক্ষে নীতিবান থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সমাজ যদি উচ্ছন্ন, দুর্নীতি ও বিকারগ্রস্ত হয়, বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মে নিপতিত হয় তাহলে এ সমাজকে রক্ষা করতে সৎ, নীতিবান, ধী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এরা সংস্কারের সাধনায় ব্রতী হয়ে ত্যাগ ও সংগ্রামের মহিমায় দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, অবক্ষয়, অনিয়ম ও নীতিহীনতা হতে রক্ষা করবে। প্রতিষ্ঠিত করবে আদর্শ ও নীতিবান সমাজ ও রাষ্ট্র।

---

৪. William Lille, An Introduction to Ethics, 3rd ed. London , Metheuen–1957, P.20–22

এখন কী করে বোঝা যাবে যে, একটা সমাজ নৈতিক সংকটগ্রস্ত? নৈতিক সংকটের বৈশিষ্ট্যই বা কী? একটা সমাজকে নৈতিক সংকটগ্রস্ত বা নৈতিক অবক্ষয়ে নিপতিত তখনই মনে করা হয় যখন সে সমাজে প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন নৈতিকতার লজ্ঘন, দুর্নীতি-দুষ্কৃতি, অন্যায়-অবিচার, ভাওতা, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, ঠগবাজি ও মিথ্যাচার সাধারণ হয়ে ওঠে। নীতিবোধ থাকে অনুপস্থিত এবং নীতিহীনতাকে অপরাধ মনে করা হয়। পাশাপাশি, ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে। স্বার্থের কাছে সে অন্ধ হয়ে যায়। স্বীয় অন্যায় স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই সে করে। নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদিকে তখন মানুষ নির্দ্বিধায় জলাঞ্জলি দেয়। তখন সমাজের সিংহভাগ মানুষ উৎকোচ, দুর্নীতি, ঠকানো, জুলুম, নিপীড়ন, জবর দখল, শোষণ ইত্যাদিকে ভাগ্য পরিবর্তনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করে।

আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি, নিরতিশয় বিলাসিতা, অপচয়, অপব্যয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে বিরাজমান থাকাও কোন সমাজের নৈতিক সংকট নির্দেশ করে। সন্ত্রাস এবং চরিত্র বিধ্বংসী সংস্কৃতির ব্যাপকতাও নৈতিক সংকটের নির্দেশক। বিবেকমান ও ধীমান মানুষ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ সংকটের সরব নিনাদ শুনতে পান। এ নিনাদ তাদের মর্মকে স্পর্শ করে। পীড়া দেয় অহরহ । এ পীড়া তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হলে তাদের দ্বারা নীতিবান, নিয়মনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল সমাজ নির্মাণের আশা করা যায়।

কতিপয় নৈতিক সমস্যা বা সংকটঃ

নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং নৈতিক সংকট বলতে কী বুঝায় তাও আভাষিত হয়েছে। এবার যে সব নৈতিক সমস্যা বিভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে সেইগুলোর বর্ণনা দেয়া হল। এগুলো হল– (ক) দারিদ্র্য (খ) যুদ্ধ (গ) ন্যায়পরায়ণতা (ঘ) সাম্য (ঙ) আত্মহত্যা (চ) শ্রেণী ও বর্ণ দ্বন্দ্ব (ছ) পরিবার পরিকল্পনা ও (জ) নৈতিক সংকট।

(ক) দারিদ্র্য :

দারিদ্র্য শুধু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়। এটা একটি নৈতিক সমস্যাও। সাধারণভাবে দারিদ্র্য একটি আর্থসামাজিক সমস্যা। ব্যক্তি তার নিজ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়াটাই দারিদ্র্য। দারিদ্র্য আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা বিলাসিতা বা আরাম আয়েশের ব্যাপার আর একজনের কাছে তা হয়তো নেহায়েত প্রয়োজনের ব্যাপার। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে–তা হলে কতটা মৌল চাহিদা মিটলে তা দারিদ্র্য-সীমার বাইরে পড়ে? এর উত্তরে বলা যায় যে, এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। কেননা, এটা ব্যক্তিভেদে ও সমাজভেদে, এমনকি দেশভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রেট ব্রিটেনের একজন ব্যক্তির দারিদ্র্য এবং আফ্রিকার একজন ব্যক্তির দারিদ্র্য এক রকম নয়। আবার একই দেশের একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দারিদ্র্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এই কথা বলা যায় যে, মানুষের নেহায়েত মৌলিক চাহিদা–অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংস্থান না হলে সেই অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে বিবেচনা করা যায়।

দারিদ্র্য একটি প্রধান নৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা ব্যাপক ও প্রকট। দারিদ্র্য জটিল, সেই কারণে এর উৎস একটি নয়। নানা কারণে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হতে পারে। দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, কর্মবিমুখতা, কৃষি ও শিল্পের পশ্চাদমুখিতা, শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা।[৫] এবার এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ: ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেক দেশে রাজা-বাদশাহ দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতেন। সাধারণ লোকের ভাগ্যের উন্নয়ন কিবা দারিদ্র্য দূরীকরণের দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। খেয়ালখুশি মত শাসন ও শোষণ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আবার বিভিন্ন যুগে বিদেশি যুদ্ধবাজ রাজা-বাদশাহরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অন্য কোন দেশ দখলে এনে সেই দেশের ভাগ্যবিধাতা সেজে বসতেন। অধিকৃত দেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন বা দেশের সমৃদ্ধি তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের দেশ দখলের মূল উদ্দেশ্য থাকত শাসন ও শোষণ। এইসব ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণ বিদেশি শাসন ও শোষণের চাপে দারিদ্র্য বরণ করে নিতে বাধ্য হত। এই সব অবস্থার পরিণতি ছিল দারিদ্র্য।

(২) **কর্মবিমুখতা:** কর্মবিমুখ ব্যক্তির জীবনে অভাব ও দুঃখ স্বাভাবিকভাবেই নেমে আসে। অলস ও কর্মবিমুখ লোক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়। বসে বসে খাওয়ার জন্য অর্থাৎ অলস ও কর্মবিমুখ জীবনযাপন করার জন্য নিরতিশয় কষ্টের মধ্যে নিপতিত হতে হয়। গ্রামবাংলার বিভিন্ন জায়গায় একটি কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়–'বসে বসে খেলে রাজার ভান্ডারও ফুরায়'। কর্ম কর্মবিমুখতা ও অলসতার পাশাপাশি বেকারত্বও সমাজ জীবনের ওপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার ঘটায় এবং দারিদ্র্য ডেকে আনে।

(৩) কৃষি ও শিল্পের পশ্চাদমুখিতা: আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান জীবনের অন্যান্য অঙ্গনের মত কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রেও বিপ্লব আনয়ন করেছে, তাতে কৃষি কাজে সময় সংক্ষিপ্ত হয়েছে, ফসলের ফলন বাড়ানো ও ফসলের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের দমন সহজতর হয়েছে।বাংলাদেশে কৃষিবিপ্লব ঠিকমত না হওয়া ও শিল্পোন্নয়নের অভাবে এদেশের দারিদ্র্য ঘুচছে না।

(৪) শিক্ষার অভাব: শিক্ষা মানুষের জীবনের বড় হাতিয়ার। শিক্ষা আলোকস্বরূপ। যে বিষয়ে আমরা জানি সে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। তার ওপরে আমাদের অধিকার জন্মে । যে বিষয়ে আমাদের জানা নেই সে বিষয়ে আমরা অন্ধকারে আবরিত। কী করতে হবে তা আমরা বুঝতে পারি না। শিক্ষা আমাদেরকে পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও করণীয় নির্ধারণে সাহায্য করে। শিক্ষার অভাবে আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।

---

৫. মো. আবদুল ওদুদ, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, কাজল বুক ডিপো, ঢাকা-২০০৯, পৃ.২৬৫

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ: প্রবল খরা ও বর্ষা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, কীটপতঙ্গের উপদ্রব ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্তর্ভূক্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি উৎপাদনের অন্তরায়।

(৬) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ: দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটলে সেখানে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। প্রত্যেক দেশের সম্পদ সীমিত, জমিও নির্দিষ্ট। ফলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী একটি ভূখন্ডের ওপর দারুন চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ভূখন্ডের অধিবাসীরা দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হয়। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ তাই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৭) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: রাজনৈতিক অস্থিরতা রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্মকান্ডকে বিপর্যস্ত করে। কোন উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না। দেশের সাধারণ প্রশাসনের কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এ অবস্থায় দেশের উন্নয়নের কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এতে জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়–এ অবস্থায় দেশের সমৃদ্ধির কথা ভাবাই যায় না। তাছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। এ পরিবেশে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। জনগণ দারিদ্র্যের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো। এদের বাইরে আরো কারণ থাকতে পারে। সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ অপরিহার্য। দারিদ্র্য সমাজ জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রযাত্রাকে বিড়ম্বিত করে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সহজ ব্যাপার নয়। দারিদ্র্যের কারণসমূহ দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হতে পারে।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, দরিদ্র ব্যক্তির কাছে নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা কি সমীচীন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুন যেভাবে মেনে চলে, সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের তেমনভাবে সাধারণ নিয়ম-কানুন মানতে দেখা যায় না। সমাজের উপরতলার লোকদের বরং ঢিলেঢালাভাবে নৈতিক নিয়ম পালন করতে দেখা যায়। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের লোকদের ওপর জরিপ চালালে দেখতে পাওয়া যায় যে, দেশের দরিদ্র নাগরিকরা ধনী ও উচ্চশ্রেণির ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের চেয়ে নৈতিকতার মানদন্ডে বেশ এগিয়েই আছে। মনে হয়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়া অন্যান্য উপাদান বর্তমান।

(খ) যুদ্ধ:

যুদ্ধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা, সেই সঙ্গে নৈতিক সমস্যাও। যুদ্ধ মানুষের সদগুণাবলি প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন যুগে যুদ্ধের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আদিম সমাজে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হত, আধুনিককালের যুদ্ধ আদিম সমাজের যুদ্ধ থেকে হাজারগুণে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। আদিম সমাজের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হত গোত্রে-গোত্রে, গোত্রের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অতীতে যুদ্ধকে মানুষের মধ্যকার আক্রমণ প্রবণতার ফল হিসেবে মনে করা হত, কিন্তু আধুনিককালে যুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রও বহু এবং সেগুলোর প্রয়োগের কলা-কৌশলও বিভিন্ন। যুদ্ধের মনস্তত্ত্বের দিকে মনোনিবেশ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার মূল। মনে্র একই প্রবণতা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হতে পারে। আক্রমণ করার পিছনে কাজ ককের আক্রমণকারীর অস্তিত্বনাশের ভয়, আর এই ভয়ই অন্যের অস্তিত্ব পর্যুদস্ত করার জন্য শক্তিশালী যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধ কি কারণে সংঘটিত হয় তা নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা যায় । কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেন, যুদ্ধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা সুপ্রাচীন ধারণা। কেউ কেউ মনে করেন, বর্তমানে এ ধারণা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। তারা যুদ্ধের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, মানব মনের অভিন্ন প্রবণতা–আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই যুদ্ধের কারণ। আধুনিক জীবন অত্যন্ত জটিল ও দ্বন্দ্বমুখর।[৬] মূল কারণের সঙ্গে অন্যান্য কারণও যুক্ত হয় কখনো কখনো; যেমন, নেতাদের দম্ভ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন ও একধরণের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিস্তারই । সবখানে এক প্রবণতাই কাজ করছে–শুধু প্রেক্ষাপটের পার্থক্য।

যুদ্ধ যখন বাধে তখন যে দেশ যুদ্ধ করে এবং যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, উভয় দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আসে; কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল উভয় দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিকর হয়ে থাকে। যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত দেশের জনগণের নৈতিকতা ঐ সময়ে পর্যুদস্ত হয়, মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগ্রত হয়, শান্তির চিন্তা তিরোহিত হয়।

যুদ্ধাবস্থায় মানবতা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়, মানুষের সদগুণাবলি বিদায় নেয়; মানব সম্পদ ও ধন-সম্পদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। মানুষের আর্তনাদে পৃথিবী ভরে যায়। যুদ্ধের উপকারের চেয়ে অপকারই সবসময় বেশি হয়ে থাকে।

যুদ্ধাস্ত্র ও সমরায়োজনে যে অর্থের অপচয় হয় তা দিয়ে সমগ্র বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের তা বুঝানো সম্ভব নয়। যুদ্ধে যে অর্থ ও সম্পদ ধ্বংস হয় তা যদি মানবকল্যাণে ব্যয় করা হত তবে পৃথিবীতে দুঃখ থাকত না। মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধির মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে পারত। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-ক্রোধ, অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সহ আরো যেসব রিপু জেগে ওঠে, তার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত সদগুণাবলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ সময়ে মানুষ তার সদগুণাবলি হারিয়ে পদে পদে মনুষ্যতের অবমাননা করে। কোন মানুষকে আঘাত করা নৈতিকতা বিরোধী কাজ। যুদ্ধের সময়ে এই নীতিবিরোধী কাজই সমাজ বা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. মো. আবদুল ওদুদ, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, কাজল বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.২৬৫

দার্শনিক কান্ট মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কোন পন্থা বা উপায় হিসেবে নয়। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের স্বকীয় মূল্য রয়েছে। মানুষ কর্তব্যপরায়ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীব। মানুষের মর্যাদা রয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলও মানুষের মর্যাদা স্বীকার করেছেন। যুদ্ধ মানুষের মর্যাদাকে বিনষ্ট করে। এ কারণে যুদ্ধ একটি নৈতিক সমস্যা। যুদ্ধ বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে কাজ করে। যুদ্ধের কুফল থেকে বিশ্ব মানবকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে হবে এবং বিশ্ব শান্তিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাকে সমুন্নত রাখতে হবে। [৭]

(গ) ন্যায়পরায়ণতাঃ

'ন্যায়পরায়ণতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে ন্যায়পরায়ণতা বলতে বুঝায় নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করা, সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা, স্বীয় অধিকার সংরক্ষণে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করা, প্রত্যেকের প্রাপ্য ঠিকমত নিশ্চিত করা। কারো অনিষ্ট না করা।

সক্রেটিস তাঁর সময়ে গ্রিসের একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এথেন্সের রাজশক্তির খোঁড়া অজুহাত ও প্রহসনমূলক বিচারের ফলে সক্রেটিসকে জীবন দিতে হয়েছিল। এই ঘটনায় সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত লাগে। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া তাঁর সংলাপে প্রকাশ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়পরতা না থাকলে এমন অবস্থাই হয়। কাজেই আমাদের সমষ্টিগত জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। গ্রিসের রাজনৈতিক জীবনের ক্রান্তিকালে প্লেটো তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "দি রিপাবলিক" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ন্যায়পরায়ণতার বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্লেটো যা কিছু লিখেছেন সংলাপাকারে, কথোপকথনের মধ্য দিয়ে; তার ডায়ালগ বা সংলাপের সংখ্যা ৩৬ খানা। সিফালাসের কথা দিয়ে এই কথোপকথন শুরু হয়। সক্রেটিস সমুদয় বক্তার বক্তব্য সমন্বিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিফালাস বলেন, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে কথা ও কাজে সততা। পলিমার্কসের মতে, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার প্রতি শত্রুতা।

প্রেসিমেকাস বলেন, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ। এসব মতবাদ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে সক্রেটিস একটি সিদ্ধান্তে আসেন। প্লেটোর সংলাপের চরিত্র সক্রেটিস। তিনিই সমন্বয়কারী। সক্রেটিসের মুখ দিয়েই প্লেটো তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্লেটো ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞা প্রদানের পূর্বে রাষ্ট্রের নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। শাসক, সৈনিক ও শ্রমিক। অতঃপর প্রজ্ঞা বা reason কে শাসকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সাহস বা courage কে সৈনিক শ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সংযম বা temperance শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে

---

৭. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৪

চিহ্নিত করেন। আর রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যেক শ্রেণী যখন অন্য শ্রেণীর কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তখন ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ অপরাপর শ্রেণীর কাজে কোনরূপ ব্যঘাত সৃষ্টি না করে নিজ নিজ কর্তব্য করার নামই ন্যায়পরতা। যদি এই নীতি প্রতিফলিত হয় তবে শাসকদের মধ্যে প্রজ্ঞা, সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে সাহস এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংযম উপস্থিত থাকবে। এটা থেকে বলা যায় যে, প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ন্যায়পরতা। তিনি মানুষের আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। প্রজ্ঞাংশ, শৌর্যাংশ ও কামনাংশ (parts of reason, courage and appetite)। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে সংগতি থাকলেই ব্যক্তিজীবনের ন্যায়পরতা থাকবে। অতএব, প্লেটোর মতে সদগুণাবলির সমন্বয়ই হল ন্যায়পরতা, আর সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন।

অ্যারিস্টটল ন্যায়পরতাকে সদগুণ বা সদগুণাবলির সমন্বয় বলেও মনে করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, ন্যায়পরতা হল কতকগুলি নৈতিক আবশ্যিকতা, যা সমষ্টিগতভাবে বিবেচিত হলে সমাজের সর্বোচ্চ বাধ্যবাধকতা দাবি করে। কোন কোন নীতি দার্শনিক আইনের ন্যায়পরতাকে পক্ষপাতশূন্যতা বলে মনে করেন। এ কালের নীতিদার্শনিক রলস Rawls ন্যায়পরতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদগুণ বলে অভিহিত করেন। ন্যায়পরতা প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, ব্যষ্টিক ন্যায়পরতা (distributive justice), সামাজিক ন্যায়পরতা (social justice), এবং সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা (corrective justice)। ন্যায়পরায়ণতার আলোকে ব্যক্তি মানুষের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলাই রাষ্ট্রের শাসকবর্গের প্রধান লক্ষ্য। ব্যষ্টিক ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার উদ্দেশ্য হল সমাজে ব্যক্তিমানুষ যাতে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করতে পারে সেই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম' এ বলেছেন যে, প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার তাকে দিতে হবে–ভালোর জন্য ভালো প্রদান করা এবং মন্দ দ্বারা মন্দকে দমন করা। সমাজের সকলের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করা উচিৎ। সামাজিক ও ব্যষ্টিক ন্যায়পরায়ণতার এটাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্য হল–মানবকল্যাণধর্মী কোন কাজে যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সংশোধনমূলক ন্যায়পরায়ণতা বলবৎ করার জন্য কতকগুলি নীতি প্রণয়ন করা দরকার।[৮]

(ঘ) সাম্যঃ

সাম্য বলতে মানুষে মানুষে সমতা বুঝায়। অ্যারিস্টটল বলেন যে, সাম্যের ফলেই মৈত্রী সম্ভব আর মৈত্রী হলো ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর মেটাফিজিক্স অব মরালজ গ্রন্থে প্রত্যেকটি মানুষকে আদর্শ রাজ্যের সদস্য বলে পরিগণিত করেছেন।

---

৮. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২৫

এবং সেই সুবাদে প্রত্যেকে সমানাধিকার পাওয়ার যোগ্য। জে. এস. মিল তাঁর 'ইউটিলিটিরিয়ানস' গ্রন্থে সমাজে ন্যায়পরায়ণতার গঠন উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন।[৯] ব্যক্তি যেখানে সুবিধাবাদের আশ্রয় নেয় না সেইখানে সাম্য ন্যায়পরায়ণতার মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। কেউ কেউ সাম্যকে ন্যায়পরায়ণতার সারসত্ত্বা বলে মনে করেন। সুবিধাবাদের প্রভাব যেখানে নেই সেখানে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশই সাম্য। যথার্থই সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদি মানবাধিকার না পায় তবে ব্যক্তির সম্যক আত্মোপলব্ধি হতে পারে না। সাম্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সাম্য, রাষ্ট্রীয় সাম্য, আইনগত সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্য। এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাম্যঃ

ব্যক্তির সুস্থ ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাম্য (individual and social equality) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ব্যক্তির এই সাম্যের অভাব হলে সমাজ জীবন ভেঙ্গে পড়ে। মানুষে মানুষে ভেদ আছে সত্য কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে দেখলে এই ভেদ দূর হয়ে যায়। সোনা, রূপা ও তামার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, মানুষও তেমনি বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে মানুষকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে দেখলে সমাজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

রাষ্ট্রীয় সাম্যঃ কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সাম্য কায়েম হলে রাষ্ট্রের সমুদয় নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এ অবস্থায় চাকরি, সরকারি কর্মকান্ড, নির্বাচন ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সম্ভব। রাষ্ট্রীয় সাম্য কায়েম হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমানাধিকার ভোগ করতে পারবে।[১০]

আইনগত সাম্যঃ রাষ্ট্রীয় সাম্যের মত আইনগত সাম্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকরা আইনগত সাম্য ভোগ করতে পারে। যখন রাষ্ট্রে জাতি-ধম ও বর্ণের ভেদাভেদ দূর করা সম্ভব হয় কেবল তখনি নাগরিকরা আইনগত সাম্য ভোগ করতে পারে, তার আগে নয়।

অর্থনৈতিক সাম্যঃ রাষ্ট্রের ব্যক্তি মানুষের আত্মবিকাশের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বুঝায় সমাজের সকল মানুষের পেশা, মর্যাদা, সামর্থ্য, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তির প্রয়োজন চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টি। রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাতে পারে তখনই অথনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৯. ড. রশীদুল আলম , প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬

১০. ড. রশীদুল আলম , প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানান ধরণের দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। ফলে অধঃপতন ঘটতে থাকে এবং মানবসুলভ সদগুণাবলির বিপর্যয় ঘটে। এ ধরণের সমাজের বিবেকবান মানুষের টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে। কাজেই নৈতিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোস্তরে ন্যায়পরতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

(ঙ) **আত্মহত্যা**

আত্মহত্যা হল আত্মনিধন। জীবন থেকে এক ধরণের পলায়ন–এ এক ধরণের পলায়নী মনোবৃত্তি। এখানে বুদ্ধিকে ছাপিয়ে কাজ করে ভাবাবেগ। মানুষ যখন জগতের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ, সামাজিক অবমাননা ও গঞ্জনার শিকার হয়, যখন সে দেখে যে জীবন তার কাছে বোঝা স্বরূপ, সে এমন অবস্থায় নিপতিত হয় যে, সে আর তার ইচ্ছেমত জীবন নির্বাহ করতে পারছে না, চারদিক হতে হতাশার কারায় আটকে পড়েছে–বের হওয়ার আর কোন পথ পাচ্ছে না। সে তখন অসহায় হয়ে জীবনের সব কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, জীবনকে সে নিজের ইচ্ছায় শেষ করে দিতে কৃতসংকল্প হয় । আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে চরম হতাশা ও নৈরাশ্য দৃষ্ট হয়, তার ধৈর্য্য, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা লোপ পায়। এ অবস্থায় মানুষের সংগ্রামী চেতনা অবলুপ্ত হয়। আত্মহত্যা ধর্ম ও নৈতিকতার পরিপন্থি। আত্মহত্যা একটি নৈতিক সমস্যা।[১১]

আত্মহত্যা প্রাচীনকালে অমানবিক বলে বিবেচিত হত। কিন্তু দার্শনিকেরা তেমন বিবেচনা করতেন না। প্লেটো সক্রেটিস সম্পর্কে মনে করতেন যে, মানুষ যেহেতু দেবতাদের সম্পদ, কাজেই আত্মহত্যা দেবতাদের রোষ সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিবেশগত কারণে এমনটি হলে তাতে দেবতাদের অনুমোদন রয়েছে। প্লেটো আরো মনে করতেন যে, চরম দুঃখ-দারিদ্র্য, অসহনীয় যন্ত্রণা, অনিবার্য ভাগ্য ইত্যাদি অবমাননাকর পরিস্থিতিতে আত্মহত্যাকে সমর্থন করা যায়। কিন্ত পরবর্তী গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। কারণ, তাঁর মতে, আত্মহত্যা কাপুরুষোচিত এবং রাষ্ট্রের এক ধরণের অপরাধ। অ্যাপিকিউরিয়াস মনে করেন যে, জীবনের সুখ যদি ফুরিয়ে যায়, তবে একজন স্বাধীন মানুষের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হল জীবনাবসান ঘটানো। স্টোয়িকরা মনে করেন যে, একজন স্বাধীন মানুষের পক্ষে আত্মহত্যা করার অধিকার রয়েছে। মেনেকা যুক্তি দেন যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও বার্ধক্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার অধিকার রয়েছে, যদিও মানুষের সাধারণ কর্তব্য অন্যের জন্য অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ততির জন্য বেঁচে থাকা। সিসেবো বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে আত্মহত্যাকে নিরুৎসাহিত করেন। সেন্ট অগাস্টাইন আত্মহত্যাকে অন্যায় কাজ বলে মনে করেন। কারণ, আত্মহত্যা

১১. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৫

পাপমুক্তির অনুতাপের সুযোগ থেকে পাপীকে বঞ্চিত করে। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস মনে করেন যে, আত্মহত্যা মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবণতা, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মানুষের নিজের বদান্যতার বিপরীত। তাঁর মতে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের অবদান থেকে সমাজকে বঞ্চিত করে এবং স্রষ্টার বিধান নিজ হাতে তুলে নেয়।

আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে ভলতেয়ারের মত খুবই সুস্পষ্ট। তিনি বলেন যে, যদি যুদ্ধে মানুষ হত্যা দোষের না হয়, তবে সেনাধ্যক্ষের আত্মহত্যা কেন খ্রিস্টধর্মের পরিপন্থি হবে? কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করেন যে, প্রাচীন বীরদের মধ্যে ব্রুটাস, ফেটিয়াস, মার্ক এ্যান্টনি প্রমুখ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন, কেননা তাদের মধ্যে সৎসাহসের অভাব ছিল। কিন্তু আসল সত্য হল চরম মৃত্যুকে শান্তভাবে বরণ করা প্রভূত সাহসের ব্যাপার-ভীরুতা নয়। বরং এটা প্রকৃতির ওপর বিজয়। এ বিষয়ে হিউম বলেন যে, একজন মানুষ জীবন থেকে বিদায় নিলে সে সমাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না, সে শুধু সমাজের জন্য মঙ্গল কিছু করতে ব্যর্থ হয়। আর এ ক্ষতি সমাজের জন্য সামান্য। তাঁর মতে, নৈতিক কর্তব্য পারস্পরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে প্রকাশ করে। তিনি বলেন যে আমি যখন পুরোপুরি সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই, তখন সমাজের কাজে আমার দায়বদ্ধতা থাকে না।

আর আমার জীবন যখন সমাজের কাছে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তখন জীবনটাকে সমাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া একটা নিরাপত্তামূলক ও প্রশংসনীয় কাজ।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেন, "এমনভাবে কাজ কর যাতে তুমি নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে পন্থা বা উপায় হিসেবে গণ্য না করে সকল সময় লক্ষ্য হিসেবে গণ্য কর। তিনি আত্মহত্যার উদাহরণের সাহায্যে এই নীতির ব্যাখ্যা করেন। আত্মহত্যা অন্যায় কার্যকারণ, তা মানবতার আদর্শের পরিপন্থি। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষ তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করে।"[১২] তাঁর মতে, মানুষকে কোন লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য না করে লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করার মাধ্যমে নৈতিকতা স্বতঃমূল্য অর্জন করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক শোপেনহাওয়ার আত্মহত্যাকে ভ্রান্তি বলে বিবেচনা করেন। কেননা, আত্মহত্যা মানুষকে প্রকৃত মুক্তি না দিয়ে বরং আপাতত মুক্তি দেয়। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিবিশেষের উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু সার্বিক ইচ্ছাশক্তির কোন বিনাশ নাই। তবে বিশেষ ইচ্ছাশক্তির বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির শুধু বিনাশ ঘটতে পারে। আত্মহত্যা তাই একটি বিশেষ ইচ্ছাশক্তির বিনাশ, সার্বিক ইচ্ছাশক্তির বিনাশ নয়। আবার কোন কোন সময় তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আত্মহত্যা অপরাধ বলে মনে করা অযৌক্তিক, কেননা বিশ্বজগতে এমন কিছু নেই যার উপর মানুষের জীবন ও দেহের চেয়ে বেশি অধিকার আছে। বিলেতে আত্মহত্যাকে ঘৃণ্য মনে করা হত। এজন্য তিনি ধর্মযাজকদেরই দায়ী করেন।

---

১২. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৮

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন সমাজে স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে এবং তাদের অসম্মানজনক শেষকৃত্যের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন।

এখন সমাপনী মন্তব্যে আমরা নিরীক্ষণ করি যে, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। কিন্তু তার মধ্যে আবেগও আছে। বিচারশক্তি ও আবেগ–দুই ই তার জীবনে কাজ করে এবং তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। এই দু'টির মধ্যে একটি অধিক প্রাধান্য পেলে অন্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে, দুয়ের মধ্যে সমন্বয় পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে–জীবন একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। আত্মহত্যাকারী যখন আত্মহত্যা করে তখন তার মধ্যে আবেগ প্রবল আকার ধারণ করে, বিচারবুদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সে পৃথিবীকে অন্ধকার হিসেবে মনে করে, মানব জীবনকে বাসের অযোগ্য বলে মনে করে। কোন দিকে জীবনের তাৎপর্য দেখতে পায় না। মানব জীবন থেকে খসে পড়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু জীবনের প্রধানতম, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল সংগ্রাম। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই জীবন সংগ্রামের শুরু, আর জীবনের পরিসমাপ্তিতে এর শেষ। কাজেই এ সংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে জীবনের সার্থকতা নেই। পলায়নবাদ জীবনের তাৎপর্যনির্দেশক নয়, বরং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম জীবনের অর্থ নির্দেশক। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের ক্রমিক প্রকাশ ঘটেছে এবং প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে। কাজেই সুখ-দুঃখ ভোগ করেও ব্যক্তিকে এই সার্বিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে মানব জীবনের মহিমা প্রকাশের সার্বিক আয়োজনকে সফল করে তুলতে হবে–এটাই তার জীবনের চরম লক্ষ্য। এখানে আত্মহত্যার, অকালে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর কোন অবকাশ নেই। আত্মহত্যা যথার্থই মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী।

(চ) শ্রেণী ও বর্ণ দ্বন্দ্বঃ

সামাজিক শ্রেণী ও বর্ণভেদ ধর্ম ও নৈতিকতা সমর্থিত নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা, মধ্যযুগীয় এস্টেট প্রথা, ধর্মাশ্রম প্রথা ও আধুনিক ধনী ও সর্বহারা শ্রেণীর বিন্যাস গোচরীভূত হয়। প্রাচীন গ্রিসে আমরা নাগরিক ও ভূমিদাস দুই শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাই। ভূমিদাসরা গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, একমাত্র শ্রম দেওয়ার অধিকার তাদের ছিল, তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হত। মধ্যযুগে ইউরোপেও ধনী বা অভিজাত বা লর্ড শ্রেণী ও কমন্স বা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ বিভক্ত ছিল। ভারতে আর্যগমনের পর থেকেই এখানে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র–এই চার শ্রেণী নিয়ে বর্ণচতুষ্টয় গঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি বর্ণ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রিত। একশ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কোন সামাজিক বন্ধন ছিল না। আন্তঃশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এখনও ভারতীয় সমাজে প্রায় একই অবস্থা বিদ্যমান। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ফলে সামাজিকতার পরিবর্তন হলেও সমাজে তার প্রতিফলন

তেমন হয়নি। যে বর্ণে যে জন্মগ্রহণ করবে সে বর্ণ সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। বর্ণ পরিবর্তন করার কোন উপায় নেই।[১৩]

আধুনিককালে অর্থনৈতিক কারণে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে জনগণকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন কার্ল মার্কস বিভক্ত করেছেন সম্পদশালী ও সর্বহারা (haves and haves not/proleteriat)। সমাজবিজ্ঞানী গিন্সবার্গ মনে করেন যে, একাধিক লোক নিয়েও একটি শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে, যেমন পদমর্যাদার অধিকারী সকল সদস্যই এক শ্রেণীভুক্ত। ম্যাকাইভার মনে করেন, সামাজিক শ্রেণী নিরূপণে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা পদমর্যাদা মানদন্ড হিসেবে কাজ করে। কেউ কেউ আবার অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থকে মাপকাঠি হিসেবে শ্রেণী নিরূপনের চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞানী পেইজ শ্রেণী চৈতন্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রেণী নিরূপনের প্রয়াস পান। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা মন বা মানসিকতার দিকে একই শ্রেণীর লোক একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করেন। এই ধরণের শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চবিত্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সন্ধান মেলে। মার্কস মনে করেন যে, ঐতিহাসিক শ্রেণীবিবর্তনের ফলে কোন কিছু থাকবে না–উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র (haves and haves not/proleteriat) সম্পদশালী ও সর্বহারা এই দুই শ্রেণীতে জনগণ বিভক্ত থাকবে। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এবং মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান। মার্কস ও মার্কসের অনুসারীরা দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী–পুঁজিবাদী ও সর্বহারা শ্রেণীতে সমাজকে বিভক্ত করেন।

আমরা উপরে শ্রেণীবিন্যাস ও বর্ণ বৈষম্যের ইঙ্গিত দিয়েছি। এই বিভাগ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। এটা মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর আঘাত হানে। শ্রেণী বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্য সমাজে আর্থিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। আধুনিক যুগে বর্ণ বৈষম্যের হাত হতে মানুষ কিছুটা নিষ্কৃতি পেলেও শ্রেণী বৈষম্য বেশ প্রবলই আছে। নীচ বর্ণের বর্ণ বৈষম্যের ফলে যেভাবে বঞ্চিত হয়, শ্রেণী বৈষম্যের ফলেও মানুষের তেমনি ক্ষতি সাধিত হচেছ। জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও শ্রেণী অনুসারে ব্যক্তি মানুষের শ্রেণীকরণ তার আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানুষের মধ্যে এই ভেদাভেদ মনুষ্যত্বের অবমাননা ও নৈতিকতা বিরোধী।[১৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মানব কল্যাণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এই ধরণের বৈষম্য দূরীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জোরালো অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয়তাবাদ মানুষকে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের শিক্ষা দেয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে শত্রুর মনোভাব পোষণ করেন। এই কারণে রাসেল বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কাজেই বলা যায়, শ্রেণী বা বর্ণ বৈষম্য মানবতাবিরোধী এবং নৈতিকতার পরিপন্থী।

---

১৩. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩০

১৪. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১

(ছ) পরিবার পরিকল্পনাঃ

'পরিবার পরিকল্পনা' ধারণা অত্যাধুনিক। পরিবার শব্দটি মানব সৃষ্টির পর থেকে প্রচলিত। কারণ মানুষের আদিম প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। মানব শিশু পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে এবং পরিবারেই লালিত পালিত হয়। 'পরিবার পরিকল্পনা' বলতে বুঝায় কোন নির্দিষ্ট আয়-কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার। পরিবার পরিকল্পনা ধারণার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা জড়িত রয়েছে। এর স্লোগান হল 'ছোট পরিবার সুখি পরিবার।' মূলত সুস্থ ও সুখি জীবন-যাপনই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য।

অতীতে মানুষের ধারণা ছিল পরিবারের প্রতিপত্তি হয় ধনবল না হয় জনবলের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন পরিবার যদি সম্পদশালী হয় তবে পরিবারটি শক্তিশালী। কিংবা কোন পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি অধিক হয় তা হলেও পরিবার শক্তিশালী। উভয় অবস্থায় পরিবারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শক্তি প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক কালে অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ টি. আর. ম্যালথাস পরিবার পরিকল্পার ধারণা জনগণের নিকট পরিচিত করেন। তার লেখা 'An Essay on the principles of population'-এ এ বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখা করেন। তিনি দেখান যে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ (১, ২, ৪, ৮, ১৬), আর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪........) এভাবে। এর ফলে খাদ্যের অভাব দেখা দেবে এবং তা মানুষের হুমকিস্বরূপ হবে।[১৫] কাজেই এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ম্যালথাস পরিবার পরিকল্পনা করার অর্থাৎ পরিবারকে ছোট রাখার পরামর্শ দেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবারকে ছোট রাখা যায়। তার এই পরামর্শ বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

আধুনিক কালে বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কাজেই প্রতিটি পরিবারের জনসংখ্যা এমনভাবে সীমিত রাখতে হবে যাতে পরিবারের আয় দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই ঠিকমত সম্পন্ন করা যায়।

ম্যালথাস নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিবাহ-পূর্ব জীবনে নৈতিক চরিত্র বহাল রাখা, দেরিতে বিবাহ করা এবং প্রয়োজনে বিবাহিত জীবনে যৌনমিলনে মিতাচারী হওয়ার বা যৌনমিলন বিলম্বিত করার পরামর্শ দেন। ক্যাননের optimum theory বা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ও দেশে বিরাজিত উপাদানকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনমাফিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী রস জন্মহার বৃদ্ধির ব্যাপারে বাল্য বিবাহ, যৌথ পরিবার, নারীর স্বাধীনতার অভাব, বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয় হিসেবে সন্তান কামনা এবং আয়েশী জীবন নির্বাহকে জন্মহার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৬]

---

১৫. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১

১৬ . ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩২

এসব বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যদি পরিবার পরিকল্পনা করে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়, আর আপামর জনসাধারণের মধ্যে এর অনুপস্থিতি দৃষ্ট হয়, তবে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের আশা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন যে, পাশ্চাত্যে যেভাবে জন্মহার হ্রাস এবং অনুন্নত দেশসমূহে যেভাবে জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে পৃথিবী অশিক্ষিত ও অর্ধ-সভ্য লোকে ভরপুর হয়ে যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী চিন্তাবিদরা অভিমত পোষণ করেন যে, ধনতান্ত্রিক শোষণের ফলেই জনগণের জীবনের মান নিম্ন হয় এবং দারিদ্র্য তাদের জীবনের সাথী হয়। কাজেই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে তাদের জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারলেই তারা উন্নত জীবনে অভ্যস্ত হবে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে।

এই ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে নিছক প্রচারণার মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভ সম্ভব নয়। জনসংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নটি শুধু সংখ্যার প্রশ্ন নয়, এটা যেমন আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন, তেমনি এটা জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন। নরনারীর বৈবাহিক জীবনে যৌন মিলনে মাতৃগর্ভে প্রাথমিক জীবন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা হলে জীবনহত্যার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধী নয়। নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারের বাইরে নরনারীর, বিশেষ করে মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়টাকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। মায়েদের স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য তাদের রূপলাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে নৈতিক সংকটের বিকাশ:

মানুষের সুষম বিকাশই মানুষের সামাজিক জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জন কঠিন ব্যাপার। বর্তমান যুগে জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের সম্প্রসারণ ঘটেছে, বস্তু জগতের ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিণতিতে দেখা দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিগত সংকট (intellectual crisis) ও নৈতিক সংকট (moral crisis)। বুদ্ধিবৃত্তিগত সংকট এসেছে এই কারণে যে জীবনের সব দিক মিলিয়ে জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করা যাচ্ছে না এবং সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের আলোকে বিকশিত জীবনের চিত্র দৃষ্ট হচ্ছে না। ব্যক্তির কল্যাণকে সার্বিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে প্রাত্যহিক জীবনকে চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করা যাচ্ছে না। আজ এই সংকটের সামনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সভ্যতা। এই সংকটের হাত হতে উদ্ধার পেতে হলে অন্ধ ভাবাবেগ, স্বার্থপরতা ও অন্ধ কুসংস্কার এবং উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতা পরিহার করতে হবে, নৈতিক দর্শন ও জীবন দর্শন নির্ভর উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে ব্যক্তিমানুষের অন্তরে পারস্পরিক প্রেমপ্রীতির ভাব জাগিয়ে তুলতে

হবে। এক কথায়, বিজ্ঞানের অফুরন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রেম-প্রীতির রাখী বন্ধন ঘটাতে হবে। আর এই পথেই আসতে পারে মানব জাতির সমূহত কল্যাণ। সুস্থ জীবনবোধের প্রতি অবহেলা না দেখিয়ে পরীক্ষিত জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনকে নিশ্চিত করতে পারে। মনুষ্যত্বে বিকশিত মানুষের সাহায্যে গঠিত সমাজই নৈতিক সংকট অতিক্রম করে যেতে পারে। প্রখ্যাত দার্শনিক মহামতি সক্রেটিস অপরীক্ষিত জীবনকে যাপনের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন। নৈতিক মূল্যকে আপেক্ষিক বলে কেউ কেউ উল্লেখ করলেও যে সার্বজনীন দিকও আছে কান্টের উক্তিতে তার সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন, 'সত্য বলা উচিৎ,' 'কাউকে আঘাত করা উচিৎ নয়', ইত্যাদি। এসব নৈতিকতা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। এবার বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে নৈতিক সংকট জড়িত। নৈতিক মূল্য এমন এমন মূল্যকে বুঝায় যা নৈতিক দিক দিয়ে উত্তম, আবার নৈতিক মূল্য সমাজের সঙ্গে জড়িত নৈতিকতা সমাজবদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ সমাজে বাস করে না এমন মানুষের বেলায় নৈতিকতার কোন প্রশ্নই আসে না। সমাজ হচ্ছে নৈতিকতা অনুশীলনের প্রকৃত ক্ষেত্র। সামাজিক মূল্য ও নৈতিক মূল্য খুব অন্তরঙ্গ হলেও এক নয়। নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তির ভিতর থেকে ব্যক্তির ওপর এসে পড়ে আর সামাজিক দায়িত্ব ব্যক্তির বাইরে থেকে ব্যক্তির উপরে এসে পড়ে। কাজেই সামাজিক মূল্য ও নৈতিক মূল্য এক ও অভিন্ন নয়। নৈতিকতা অভ্যাস ও অনুশীলনের বিষয় এবং এতে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

সমাজে নৈতিক সমস্যা সমাধানের অভাব ঘটলেই নৈতিক মূল্যবোধের অধঃগতি শুরু হয় আর এই অধঃপতনের ফলেই নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। সুতরাং নৈতিক সংকট বলতে বুঝায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

নৈতিক সংকট সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেন মানুষ নৈতিকতাবিরোধি কাজ করে, সে সম্পর্কে সর্বসম্মত ঐকমত্য পাওয়া যায় না, কেননা বিষয়টি জটিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন বিভিন্ন যুগের নীতি দার্শনিকেরা। নৈতিক সংকটের কারণ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা—পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক। এবারে সামান্য বিস্তারিতভাবে কারণগুলো আলোচনা করা যাক।

পারিবারিক কারণ:

পরিবার হচ্ছে নৈতিকতা শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্র। এখানেই মানবশিশুর নীতি শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। পরিবারে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যদি নৈতিকতার বিকাশ সাধিত হয় তাহলে পরিবারে একটা নৈতিকতার পরিবেশ থাকে। সেই ক্ষেত্রে সে তার অলক্ষ্যে ঐ পরিবেশকে নিজস্ব আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। আর যদি পরিবারের পরিবেশ নৈতিকতার

পরিপন্থি হয়, সে অবস্থায় শিশু নৈতিকতার বিরোধী আচরণই অনুকরণ করে। এভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়।

সামাজিক কারণঃ

সমাজও নৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। পরিবারের পরেই সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যাপক ক্ষেত্র। যে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে বাঁধা সৃষ্টি হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের চিরন্তন আদর্শের অবমূল্যায়নে সমাজে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধরণের নৈতিকতাবিরোধী অপরাধপ্রবণতা। এই অবস্থায় পরার্থরতার মনোভাবের পরিবর্তে স্বার্থপরতার মনোভাব জাগ্রত হয়। সুস্থ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক উন্নতির পরিবেশ ব্যাহত হলে মানুষ প্রবঞ্চনা, ঘুষ, চোরাকারবার, জালিয়াতি ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে সমাজে বিত্ত ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। সমাজের এ্ই শ্রেণীর উপরতলার লোকদের দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে বিভিন্ন নৈতিক ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ভিসিআর ইত্যাদি গণমাধ্যমে অপসংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা নৈতিকতাবিরোধী কাজে উদ্দীপনা যোগায়, কিশোর-কিশোরীদের সুকুমার মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করে তাদেরকে নীতিবিরোধী কাজে প্ররোচিত করে।

অর্থনৈতিক কারণঃ

নৈতিকতার উপাদান বিভিন্ন, যেমন প্রাকৃতিক, সামাজিক, দৈহিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি। সামাজিক পরিবেশের মত প্রাকৃতিক পরিবেশও মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ওপর বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। সেই সঙ্গে তার নৈতিক জীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। তবে নীতি দার্শনিকরা অর্থ বা সম্পদকে নৈতিক জীবনের অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে মনে করেন। সুস্থ বা নৈতিক জীবন যাপনের জন্য অর্থনৈতিক উপাদান অন্যতম প্রধান উপাদান। কারণ অর্থের অভাবে মানুষের অনেক মূল্যই অর্জিত হতে পারে না। তবে অর্থনৈতিক জীবন, জীবন যাপনের একটি উপায় (means) মাত্র, লক্ষ্য (ends) নয়। অর্থনৈতিক অভাবের সমস্যা আপেক্ষিক; যে ব্যক্তির দু'বেলার অন্ন জোটে না তার অভাব আর যে লক্ষপতি কোটিপতি হতে চায় তার অভাব এক নয়। ব্যাপারটা এখানে আপেক্ষিক। সমাজের উপরতলার মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্ত না হয়ে নানান ধরণের দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। ফলে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিণতিতে নৈতিক সংকট উদ্ভূত হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত কারণঃ

শিক্ষা মানব শিশু বিকাশের জন্য অপরিহার্য। পূর্বে পাঠ্যপুস্তকসমূহে অনেক নীতিকথা থাকত। কিন্তু বর্তমানে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে তেমন কিছুই নেই। তার ফলে তার প্রভাব শিশুদের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নৈতিক বিষয় প্রতিফলিত হলে শিক্ষাকালেই এই সবের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিক্ষার ওপর পড়ে। কাজেই শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে

নৈতিক বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার। সমাজের কল্যাণমুখী যুগোপযোগী নৈতিক শিক্ষা সংবলিত বিষয়াবলি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, না হলে নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের ভিতর দিয়ে নৈতিক সংকট উপস্থিত হতে পারে।

রাজনৈতিক কারণ:

দলীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব সমাজে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাতে দেশের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং দেশের প্রচলিত নৈতিক আদর্শ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সুতরাং দেশের রাজনীতিকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, জনস্বার্থে রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। উগ্র ও প্রলয়ংকরী ছাত্র রাজনীতি সংশোধন করতে হবে। এর ফলে নৈতিকতার পরিবেশ ফিরে পাবে। এর বিপরীত পথে চললে নৈতিক সংকট আমাদের গিলে ফেলবে।

আইন সংক্রান্ত কারণ:

আইন বলবৎকরণ প্রশাসনের প্রাণ। দেশের আইনের শাসনই দেশের সমূহ কল্যাণের গ্যারান্টি। প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দেশের প্রশাসনকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। এর বিপরীত চললে দেশে নৈতিক সংকট দেখা দেয়। এ পর্যন্ত আমরা নৈতিক সংকট কী এবং কি কি কারণে তা বৃদ্ধি পায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে শেষ করব। নৈতিক সংকট নিরসন করা একটু দুরূহ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যে সব অবস্থা নৈতিক সংকটকে বৃদ্ধি করে সেই সব কারণকে দূর করতে হবে। কাজটি অবশ্যই সহজসাধ্য নয়, অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য। সাধারণভাবে সমস্যা বা সঙ্কট উত্তরণের দু'টি পথ আছে। যথা-প্রতিকার এবং প্রতিরোধ। সমস্যা বা সঙ্কটের প্রতিকার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ–জরুরী ভিত্তিতে সংকটের মূলোৎপাটন করা। অপরপক্ষে প্রতিরোধ প্রক্রিয়া হল সমস্যা বা সঙ্কটের কারণ চিহ্নিত করে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যার ফলে যেন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। এটা হল প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

এই প্রতিকার ব্যবস্থা ছাড়াও এই ব্যাপারে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারি। নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদেরকে–(১) সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। (২) অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। (৩) বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে রুচিসম্মত উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) সুস্থ চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে রুচিসম্মত উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে–সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠে উৎসাহ যোগাতে হবে। নৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমকে গঠনমূলক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। অল্প কথায় নৈতিক সঙ্কটের কারণসমূহকে চিহ্নিত করে

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নৈতিক সঙ্কট উত্তরণে সর্বস্তরের চিন্তাবিদ, দার্শনিক, নীতি দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, সংস্কারককে সম্মিলিতভাবে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান বাংলাদেশে এমন কোন অঙ্গন নেই যা কম-বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত প্রবল। রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন, ব্যবসায়সহ সকল পেশায় নৈতিকতা ও নীতিবোধের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিও যেন অনুপস্থিত। এখানে চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকহিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না।[১৭] সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে। বৈষয়িক উন্নতি সাধন বা বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সে উন্নতি বা উন্নতির চেষ্টা যদি হয় দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, ভাওতাবাজি, ঠগবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তবে তা ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত। আহার-বিহার ও বাসস্থানের চাকচিক্য বৃদ্ধি এবং বিলাসী জীবনভোগের জন্যে অন্যের অধিকার হরণ, ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ-নিপীড়ন, মিথ্যাভাষণ, সদগুণাবলির বিসর্জন মানুষকে কতটা অধঃপতিত করে তা উপলব্ধিও আজ মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে মানুষ আজ পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কে কত পশুবৃত্তি অর্জন করতে পারে, কে কত হিংস্র হতে পারে, কে কত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কে কত বেশি পারঙ্গম হতে তারই প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। মানুষ আজ বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্মম। দয়া-মায়া, প্রেম-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, ন্যায্যতা, সততা, দক্ষতা, নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা-মূল্যবোধ ইত্যাদি তার নিকট অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। পরিণামে আমদের সমাজে দুর্নীতি, দুষ্কর্ম, বলপ্রয়োগ, অপকৌশল ইত্যাদির চর্চা দিন দিন বাড়ছে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা আমাদের দেশ ও জাতির জঘন্য অধঃপতন নির্দেশ করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশ ও জাতি আরো পশ্চাদপদতায় নিপতিত হবে। আমাদের দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরো পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই যত দ্রুত সম্ভব দেশ ও জাতিকে নৈতিক পদস্খলনের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে। এ জন্য সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে মানুষের মন-মানস বিকৃত হয়ে যায়। মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলে। তরুণ ও সম্ভাবনাময় প্রজন্মের মেধা ও মননে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ সমাজে নবপ্রজন্মের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা, চেতনা, চরিত্র, সংস্কৃতি স্বাভাবিক পন্থায় বিকশিত হয় না। ফলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যতা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও দূরদর্শিতায় যেমন অপূর্ণতা দৃষ্ট হয় তেমনি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবকল্যাণ প্রভৃতিতেও ঐকান্তিকতাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় প্রকটভাবে। অনুরূপ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ যে জনশক্তির

জন্ম দেয় সে জনশক্তি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত জীবনে দুষ্কৃতি ও অপরাধকে প্রসারিত করে অবিরাম গতিতে।

---

১৭. আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, রসস্ট্রাম থেকে, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স-২০০০, পৃ. ৬২

আজকের বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি-দুষ্কৃতির যে সয়লাব তা এই বিকারগ্রস্ত জনশক্তির প্রতিনিয়ত অন্যায়-অপকর্মের বাঁধাহীন চর্চার ফসল। অন্যায়কারী তার কর্মটি যে অন্যায় তা জেনেই করে। এর পেছনে হয়তো তার কোন হীনস্বার্থ হাসিলের প্রয়াস থাকে। নৈতিক শক্তি ও সাহসের অপর্যাপ্ততা, অনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দুষ্কৃতিকারীকে অপরাধ ও অন্যায় করতে সাহস যোগায়। এভাবে অপরাধ, অপকর্ম নির্বিঘ্নে চলতে থাকার কারণে বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। এ অবক্ষয়ের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা নিরসন করা এবং সত্য সুন্দর শুভ তথা নৈতিকতা ও আদর্শের চর্চা করা।

আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি-দুষ্কৃতির যে বিস্তার তার মূল বীজ মানুষের হৃদয় ও মানসিকতায় গ্রথিত। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি মানুষের চিন্তা-চেতনা, মন ও মগজকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পন্ডাতে আত্মসুখ ও স্বার্থবাদিতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরসুখ বা সর্বসুখ তার নিকট অর্থহীন। কেউ যদি স্বীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে পরসুখ নিশ্চিত করে সে তো খুবই উত্তম। আবার কেউ নিজের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত সুখ বিসর্জন দেয় নাই কিন্তু পরসুখ, স্বার্থ ও অধিকারের ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে নাই সেও উত্তম। কিন্তু কেউ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যদি অপরের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে, অন্যে সাথে মিথ্যা, প্রতারণা, ভাওতা, ফাঁকি ও কূটকৌশল অবলম্বন করে তাহলে তা হবে নিকৃষ্টতম কাজ। এই নিকৃষ্টতম কাজ এবং এই কাজের মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুব বেশি। অফিস আদালতের চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী-বণিক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকি গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এই নিকৃষ্টতমের সংখ্যা বিপুল। এরা নিজেদের অজান্তেই হয়তো পাশবিকতার চর্চায় প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে বেড়াচ্ছে। মমত্ব, বুদ্ধি-বিবেক এরা হারিয়ে ফেলেছে। শুভবোধ, শুভদৃষ্টি ও হৃদয়ানুভূতি এদের বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এরা পশুতুল্য। আল কুরআনে এমন প্রকৃতির মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল-কুরআন বলছে, "তাদের অন্তর রয়েছে, তারা তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তারা তার দ্বারা দেখেনা, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।"[১৮]

এই নিকৃষ্টতর মানুষদেরকে আবার মনুষ্যত্বের স্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই উপলব্ধিতে আবার তাকে বলীয়ান হতে হবে যে, আমি মানুষ। দর্শন, শ্রবণ, বিচার-বুদ্ধি, হৃদয়াবৃত্তি প্রভৃতিতে অন্য যে কোন প্রাণির চেয়ে আমার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এবং এ স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

উন্নততম। সর্বোপরি, এই নিকৃষ্টতম মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। তার বিবেকই হবে দুর্নীতি-দুষ্কর্ম নিরসনের মোক্ষম হাতিয়ার।

---

১৮. আল-কুরআন, ৭ : ১৭৯

আমাদের সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান মিথ্যাচার আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের এক বড় প্রমাণ। মিথ্যা বলা, মিথ্যার চর্চা করা একটি খারাপ গুণ, একটি বদ কাজ একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনবান কি গরীব, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কি নিম্নতম কর্মচারী, শিক্ষক কি ছাত্র প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে মিথ্যার অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের শিক্ষা, উচ্চপদ, অর্থ-সম্পদ এই নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য আচরণটি বর্জন করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে না। এই মিথ্যাচারিতার কারণে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রচন্ড অভাব আমাদের সমাজে। এখানে জনগণ রাজনৈতিক নেতাকে, রোগী তার চিকিৎসককে, ক্রেতা তার বিক্রেতাকে, অধীনস্ত ব্যক্তি তার বসকে, বা বস তার অধীনস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে না, পারে না একে অপরের ব্যাপারে নিঃশংসয় হতে। সততা এবং ন্যায়পরায়ণতার অভাবেই এমন চিত্র আমাদের সমাজে বিরাজ করছে।

অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সৎ, ন্যায়পরায়ণ, ত্যাগী, পরার্থপর বা সর্বসুখবাদী ও আদর্শবান মানুষ যে আমাদের সমাজে নেই তা নয়। তবে এঁদের সংখ্যা বিরল ও নগণ্য। এঁদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। বরং মিথ্যাচার, অন্যায় ও অপকর্মের প্রভাবে তাঁদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা কুণ্ঠিত হয়ে আছে। এই মিথ্যাচার আমাদের সমাজকে তিলে তিলে অবক্ষয়ের চরম স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যাচারের প্রভাব আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, যুবক, তরুণ, ছাত্র ও শিশুদের প্রতি পড়ছে। আমরা জাতিগতভাবে আরো নিম্নগামী হচ্ছি এই মিথ্যাচারের বদৌলতে। আমাদেরকে মিথ্যাচার বর্জন করতে হবে। মিথ্যাচার পরিহারের অভ্যাসই আমাদেরকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য করবে। মিথ্যাচার পরিহার না করলে আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নপ্রয়াস সার্থক হবে এটা আশা করা যায় না। তাই আমাদের জাতীয় সার্বিক উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য মিথ্যাচার বর্জন, পরিহার ও প্রতিরোধও করতে হবে।

আমাদের সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বভাব-চরিত্র, কর্মকান্ড, উত্থান প্রক্রিয়া ইত্যাদিও আমাদের সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক দৈন্যদশা নির্দেশ করে। আমাদের নেতারা যতটা জনগণকে নিয়ে, জনগণের হিতকে নিয়ে ভাবেন তারচেয়ে বেশি ভাবেন নিজের উন্নতি ও ক্ষমতা নিয়ে। আর জনগণকে নিয়ে যতটুকু ভাবেন, যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেন, তাও করেন নিজের উন্নতি ও ভাগ্য নির্মাণের মাধ্যম হিসেবে। এ কারণে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠানগুলো দখলের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করা ও করায়ত্ত করাই মূল লক্ষ্য হয়ে গিয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যে শক্তি-সাহস ও জনবলের প্রয়োজন সে শক্তি-সাহস ও জনবল সংগ্রহের সাধনায় তারা লিপ্ত থাকেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে অভিনয়ের প্রয়োজন হয়, সে অভিনয় তাঁরা করেন। লক্ষ্যে পৌঁছার পরে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বার্থ হাসিলের কেন্দ্রে পরিণত করে। আমি কেবল জাতীয় নেতৃত্বের কথা বলছি না, স্থানীয় নেতৃত্বের স্বভাব প্রকৃতিও এমন। আগেই বলেছি ব্যতিক্রম আছে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও আছে। নিঃস্বার্থ জনদরদী, নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক নেতা আছেন। তবে এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

আমাদের সিংহভাগ নেতা ও নেতৃত্বাভিলাষীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, নেতাকে ধূর্ত, ঠগবাজ, ভাওতাবাজ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক না হলে চলে না। তাই তারা অতি যত্নে এই কুঅভ্যাসকে লালন-পালন করে থাকেন। এসব নেতারা জনগণের কল্যাণ, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ ও নিরাপত্তাবিধানকে যতটুকু আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করে তার চেয়ে জনতার উপরে প্রভূত্ব করাকে বেশি উপভোগ করেন। এ কারণে অনেক নেতার দ্বারা জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জুলুম-নিপীড়ন ও শোষণের শিকার হন। এমন কোন অন্যায়-অপকর্ম বা দুষ্কৃতি নেই যা আমাদের এই নেতারা করেন না। এই নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমাদের তরুণ যুবক ও ছাত্রদের উপরে পড়ে। কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব উপভোগ করা মানুষের প্রকৃতিগত। কর্তৃত্ব করে মানুষ আনন্দ পায়। প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন স্তরে কম-বেশি কর্তৃত্ব উপভোগ করে। যেহেতু আমাদের নেতারা নানা অপকৌশল অবলম্বনে সমাজের কর্তৃত্ব করে, সেহেতু এই অপকৌশলগুলো আমাদের মেধাবী তরুণ-যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। তরুণ-তরুণীরাও রাতারাতি এই অপকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। খুব অল্প সময়ে নেতৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের সাধনায় লিপ্ত থাকে। ফলে আজ আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে অন্যায়-অপকর্মের গভীর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। যে মেধা-মগজ কাজে লাগিয়ে তারা জাতির দিশা দিতে পারত তাদের সে মেধা-মনন আজ অন্যায়-অপকর্ম, অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির চেতনায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানেই যদি সৎ, ন্যায়পরায়ণ, প্রজ্ঞাবান, মেধাবী ও বিবেকবান লোকের কর্তৃত্ব বোঝাত তাহলে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্জন করে ও দুর্নীতি-দুষ্কৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নীতি-নৈতিকতার অনুশীলন ও সাধনায় লিপ্ত হতে দেখা যেত। অবশ্য আমাদের নেতৃত্বের দুশ্চরিত্র, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির জন্য যে কেবল নেতারাই দায়ী তা নয়, বরং এ জন্য আমাদের জনগণও অনেকাংশে দায়ী। কেননা, আমাদের জনগণই তো নেতা সৃষ্টি করে। জনগণইতো তাদের প্রতিনিধি মনোনীত বা নির্বাচিত করে। জনগণ সচেতন হলে, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের প্রত্যাশী হলে তার দুর্নীতিবাজ, দুশ্চরিত্র, ঠগবাজ, মিথ্যাবাদী নেতৃত্ব বর্জন করত। সৎ ও অকৃত্রিম জনদরদী নেতৃত্ব নির্বাচন করত। হয় আমাদের জনগণ প্রতারিত হচ্ছে, দুশ্চরিত্র নেতৃত্বের পাতা ফাঁদে বারবার নিপতিত হচ্ছে নতুবা তারা ন্যায়পরায়ণ ও প্রকৃত সেবক ও নেতা নির্ধারণে অক্ষম। এ অক্ষমতার নানা কারণ থাকতে পারে। যাহোক, আমাদের জনগণকে সচেতন হতে হবে। জনগণকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও নীতিবান হতে হবে। জনগণকে নীতিবান, নিয়মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, প্রকৃত সেবক ও নেতা নির্বাচনে ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি নেতৃত্বের অন্যায়-অপকর্ম, অবিচার, অনিয়ম, জুলুম-নিপীড়ন, দুর্নীতি-দুষ্কৃতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শক্তি ও সাহস থাকতে হবে।

বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম, যুবতশ্রেণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, এনজিও কর্মী এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর মনেও আজ এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, দুর্নীতি ও ঠগবাজির আশ্রয় নেয়া ছাড়া ধনবান হওয়া বা স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। জনমনের এই বদ্ধমূল ধারণাও জাতীয় নৈতিক অধঃপতন নির্দেশ করে। আসলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলার কারণে আমাদের জাতীয় মন-মানসিকতা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। মানুষ আজ সৎ ও সরলভাবে জীবন যাপনের চিন্তা করতে পারে না। সে তার শক্তি-সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেছে। জনমনের এই বদ্ধমূল ধারণা ভুল। দুর্নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে জাতির কেবল ক্ষতিই সাধন করা যায়। জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয় না। দুর্নীতি অবলম্বন করে ব্যক্তিগতভাবেও কেউ সুখ ও শান্তি পেতে পারে না। সে কেবল পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়। এটাও সত্য যে, কেবল বৈষয়িক সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে না। নিছক সুখের অন্বেষণ মানবজীবনে নৈরাজ্য নিয়ে আসে। কারণ সে সুখ খোঁজে কিন্তু সুখের নাগাল পায় না। অনেকটা মরীচিকার ন্যায়। সে যেটাকে সুখকর বস্তু মনে করে ধাবিত হয়, লক্ষ্যে পৌঁছার পর বা প্রাপ্তির পরও সে তৃপ্ত হয় না। একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য হচ্ছে যে, সুখের প্রতি আকর্ষণ যত বেশি হবে সুখ ততবেশি দুষ্প্রাপ্য হবে। সুখান্বেষণ অবিরত চলতে থাকবে, কিন্তু কখনো সুখ পাওয়া যাবে না। নীতিবিদ সিকউইক এ অবস্থাকে 'সুখবাদের কূটাভাস' (paradox of hedonism) বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] তাই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। দুর্নীতি ও অন্যায় উপার্জনের চিন্তা ও প্রয়াস পরিহার করতে হবে। তাহলে মানবজীবন সুখময় হয়ে উঠবে। এ উপলব্ধিতেই মহামানব ও সাধকেরা সৎ উপার্জনের প্রতি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। মহামতি গৌতম বুদ্ধ সম্যক আজীব' (ন্যায় উপার্জন) মুক্তিলাভের অন্যতম উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামে রয়েছে হালাল-হারামের বিধান। আমাদের দেশে শতকরা নবক্ষই জন লোক মুসলমান। এই মুসলমানরাই এদেশের অফিস-আদালত চালায়, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এই মুসলমানরা হালাল-হারামের বিধানকে বিশ্বস্ততা ও ঐকান্তিকতার সাথে মেনে নিলে আমাদের সমাজে দুর্নীতি, ঘুষ-উৎকোচ, চৌর্যবৃত্তি, প্রতারণা ইত্যাদি থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশের প্রায় সকল খাতেই দুর্নীতি বিরাজমান। সম্প্রতি টি আই বি'র রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। ঐ রিপোর্ট-এ এও বলা হয়েছে যে, দুর্নীতির কারণে গত ২০০১ সালে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা যা ১৯৯০-২০০০ সালের জিডিপির শতকরা ৪.৭৫ ভাগ।[২০] রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতির দ্বিতীয় খাত হচ্ছে শিক্ষা এবং এরপর পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, বন ও পরিবেশ সেক্টর।

---

১৯. Sidgwick. The Methods of Ethics, 7th ed . London: Macmillan, 1967, P .48

২০. দৈনিক ইত্তিফাক, ১০ জুলাই ২০০২

আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ অন্ততপক্ষে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। অর্থাৎ তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কর্মজীবনে তারা দুর্নীতিতেও উচ্চে। এ অবস্থা আমাদের শিক্ষার করুণ দুর্বলতা ও নীতিহীনতা প্রকাশ করে। আসলে আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় এমন ভেজাল জড়িত আছে, যে কারণে আমাদের শিক্ষিতেরা নীতি-নৈতিকতা ও বিবেকের শক্তিতে বলিষ্ঠ হতে পারে না। এ ভেজালকে জনৈক অধ্যাপক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন এভাবে "দেশের শিক্ষা প্রশাসন সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত। শিক্ষকরা দুর্নীতির অসহায় শিকার। দুর্নীতির প্রক্রিয়ায় কিছু শিক্ষকও নিজেদেরকে জড়িত করেন। যে শিক্ষকরা ঘুষ দিয়ে চাকুরির নিয়োগপত্র সংগ্রহ করেন, ঘুষ দিয়ে মাসিক বেতনের টাকা নেন, যে ছাত্রকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার দিয়ে হলের সিটে উঠতে হয়, যে ছাত্রকে ঘুষ দিয়ে স্কলারশীপের টাকা তুলতে হয়, যে শিক্ষক দলীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার দিয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন, সেই শিক্ষক ও ছাত্রের নৈতিক চেতনা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। যে শিক্ষকদের নৈতিক বল নেই সেই শিক্ষকদের কাছে পড়ে ছাত্রেরা উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না।"[২১] আমাদের এখানে হাজার হাজার শিক্ষক পাওয়া যাবে বিশেষ করে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক যারা স্কুলে না গিয়েও মাসের পর মাস বেতন তুলছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু শিক্ষক পরিচয়ে কতিপয় ব্যক্তি বেতন তোলেন এমন সব রিপোর্টও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নকল সরবরাহের দায়ে শিক্ষক বহিষ্কারের ঘটনা আমরা পত্র-পত্রিকায় বারবার পড়ি। আমাদের এই ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষিতদের নীতিহীনতা ও দুর্বল বিবেকের জন্য কেবল তাঁরাই দায়ী নন। যাঁরা এই নীতিহীনতার সুযোগ করে দেন এবং অনৈতিক হতে বাধ্য করেন তারাই মূলত দায়ী। আমাদের আইন প্রণেতা, রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্বাহী এবং প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিমুক্ত হলে, নীতি ও বিবেকের শক্তিতে বলিষ্ঠ হলে, নিবদিত প্রাণ দেশপ্রেমী এবং জনহিতকে পবিত্র দায়িত্ব বিবেচনা করে কর্মতৎপর হলে আমাদের সমাজের সর্বস্তর থেকে অন্যায়-অবিচার দুর্নীতি প্রভৃতির নিরসন সম্ভব। তবে এটা আকস্মিকভাবে সম্ভব নয়। আমাদেরকে প্রাজ্ঞ পরিকল্পনা ও দীর্ঘ কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা পুলিশের দুর্নীতি সর্বজন বিদিত। পুলিশের দুর্নীতি আজকের নতুন কিছু নয়। উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের রচনায়ও পুলিশ চরিত্রের বিরূপ আলোচনা লক্ষ করা যায়। 'পুলিশেরা অত্যাচারী এবং নির্লজ্জ ঘুষখোর' এসব মন্তব্য আমরা তাদের রচনায় লক্ষ করি। ইদানীং এই শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতিকারী, চোরাকারবারী, শিশু ও নারী পাচারকারীদের সাথে এদের রয়েছে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও গোপন চুক্তি। পকেটমার এবং ছিনতাইকারী লালন-পালন করে বলেও এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকার গুলশান-বনানীর অধিকাংশ অভিজাত বাড়ির মালিক নাকি পুলিশ কর্মকর্তা। এ থেকেও এদের অবৈধ আয় সম্পর্কে আঁচ করা যায়। প্রায়শই এদের কুকীর্তির কথা পত্র—পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তাই এখানে তাদের কুকীর্তির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

---

২১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, অবক্ষয় ও উত্তরণ, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী: ঢাকা -১৯৯৮, পৃ. ২৭

প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা শীর্ষ স্থানে থাকলেও বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের দুর্নীতির মাত্রাও নগণ্য নয়। শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, বন, বিচার বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, প্রশাসন প্রভৃতি সেক্টরে দুর্নীতি ব্যাপক এবং সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করেছে। এসব সেক্টরের দুর্নীতির কোন প্রতিবেদন রচনা করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাংলাদেশের মানুষ ও সমাজ কত ব্যাপক ও শোচনীয় দুর্নীতির শিকার তা বোঝানোর জন্য দুই-একটা সেক্টরের দুর্নীতি তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করেছি মাত্র। ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদান আমাদের সমাজে কোন গোপন ব্যাপার নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে এবং নির্লজ্জভাবেই এর আদান-প্রদান হয়ে থাকে। 'ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না'–এটা অনেক আগে থেকেই আমাদের সমাজে প্রবাদের মত হয়ে গিয়েছে। একজন আরেকজনের নিকট কোন কাজের জন্য দ্বারস্থ হলে, এটা প্রায় ধরেই নেয়া যায় যে, তিনি দুর্নীতির শিকার হবেন। আজ এক অফিসে বসে যিনি দুর্নীতি করছেন, ভন্ডামী, ভাওতাবাজি ও প্রতারণা করছেন অন্যের অফিসের দ্বারস্থ হলে তিনিই আবার দুর্নীতি, ভন্ডামি, ভাওতাবাজি ও প্রতারণার শিকার হবেন। এটাই আমাদের সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তাই দুর্নীতি-দুষ্কৃতি, অন্যায়-অবিচার বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করেছে বললে বোধ হয় অত্যূক্তি হবে না।

এই নৈতিক অবক্ষয়ের নানা কারণ রয়েছে। এ কারণ দুই ধরণের। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন, ও বিবেকে যে অন্যায়, অসততা, বিচারহীনতা বাসা বেঁধেছে তার অবক্ষয়ের অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ কারণ। আর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, আইনের জটিলতা, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদির প্রভাবকে অবক্ষয়ের বাহ্যিক কারণ বলা যায়।

সত্য, সুন্দর, শুভ ইত্যাদির স্বতঃমূল্য (intrinsic value) রয়েছে। সুতরাং সত্য, সুন্দর ও শুভের জন্য সাধনা করা, প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদিরও মূল্য থাকবে। এসবের জন্য কেউ সাধনা না করলে, নিজেকে এসব মূল্যের উপর টিকিয়ে না রাখলে সে হারাবে প্রকৃত মানবীয় জীবন। তখন জীবন হয়ে পড়বে কেবল একটি প্রাণির জীবন। মানুষ নামের এ প্রাণির সাথে তখন অন্যান্য প্রাণির আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া গুণগত তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। মনোজগতের এ অবস্থায় মানুষ অন্যায়, অপকর্ম, অবিচার, পাশবিক কাজ এবং অশ্লীলতা নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাবে। আমাদের মানুষদের ও হয়েছে তাই। আজ আমাদের দ্বারা নির্লজ্জভাবে যে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি সম্পাদিত হচ্ছে তা সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, শুভ ও মঙ্গলের প্রতি আমাদের অনাসক্তি ও অনানুগত্যের ফলশ্রুতি। দ্বিতীয়ত, আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কতগুলো বাহ্যিক চাপ রয়েছে। আমাদের সমাজ ও পরিবেশ আমাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার দিকে ধাবিত করে। এ সমাজে রয়েছে ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, সবল ও দুর্বলের প্রবল তারতম্য। উঁচু, ধনী ও সবলেরা নিচু, নির্ধন ও দুর্বলের উপরে প্রভূত্ব ও শোষণ করে। অন্যদিকে নির্ধন ও দুর্বলেরা শোষণ ও নিস্পেষণ হতে মুক্তির জন্য ধনী ও সবল হওয়ার পথ বেছে নেয়। সবল চায় দুর্বলকে দমিয়ে রাখতে আর দুর্বল চায় সবলের স্থানের নিজেকে আসীন করতে। ফলে উভয় দলের মধ্যে দুর্নীতি, দুষ্কৃতি বিরাজমান থাকে। স্বল্প আয় বা আয়ের চেয়ে ব্যয় অপ্রতুল হওয়াও আমাদের সমাজে দুর্নীতির একটি কারণ।

অবশ্য যতদিন দুর্নীতি থাকবে, ততদিন আয়-ব্যয়ের অসংগতিও থাকবে, দ্রব্যমূল্যের ঊধর্ক্ষগতিও থাকবে। আমাদের দেশে কেবল নিম্ন বেতনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ করে না বরং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ করে এবং এদের অংশ ও পরিমাণ বিপুলই হয়ে থাকে। কর্মচারীদের অবৈধ অর্থ যেখানে জৈবিক ও মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয়, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সেখানে দুর্নীতির অর্থ দিয়ে বিলাসিতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের প্রয়াস পায়। একজন অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীর পক্ষে একটা দ্রব্য উচু বা চড়া দামে ক্রয় করা কষ্টকর নয়। সে চড়া দামে দ্রব্যটি ক্রয় করবে, যাচাই-বাছাই, দরকষাকষি তার নিকট সময়ের অপচয় এবং অভদ্রতার শামিল। অসাধু ব্যবসায়ীরা এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে দ্রব্যের ঊর্ধ্বমূল্য সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলাদেশে এই ভয়াবহ দুর্নীতি একদিনের সৃষ্টি নয়। ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে করতে এটা আজ সর্বগ্রাসীরূপ লাভ করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষোর্ধে এর বীজ বপন করেছিল। কোম্পানী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এত কম বেতন দিত যে কারণে কর্মচারী-কর্মকর্তারা অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনের পথ অবলম্বন করত। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন থেকে এতদঞ্চলের মানুষ মুক্তি পেলেও দুর্নীতি থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং ধীরে ধীরে দুর্নীতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বৃটিশরা এদেশ ছেড়েছে দৈহিকভাবে–তাদের শাসননীতি, বিচারব্যবস্থা আজো ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের গভীরে গেঁথে রয়েছে। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে দুর্নীতি-দুষ্কৃতি-ঘুষ ইত্যাদির বিরোধিতা নির্বাচনী প্রচারণায় স্থান পেল। যুক্তফ্রন্টের প্রচারিত ২১ দফার মধ্যে একটি দফা ছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ ইত্যাদির নিরসন ও নিরোধ সম্পর্কে। এরপর জনগণ আইয়ূব খানের সামরিক শাসন প্রত্যাখ্যান করল। এই সামরিক শাসক ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও অনুগত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতি ও সুবিধাভোগের সুযোগ করে দিল। ফলে একটা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হলো। অবশ্য এই সামরিক শাসক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এই জিহাদ ঘোষণার অভিনয় যে জনগণ বুঝতে পারেনি তা নয়। বুঝতে পেরেছিল। ১৯৬৯ সহ বিভিন্ন সময়ে এই দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ বিস্ফোরণোন্মুখ হয়েছে। পাকিস্তানী দুঃশাসনের অবসান হলো, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। কিন্তু সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অবসান হলো না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর সাহায্য আসে। সিংহভাগ লুটপাট হয়ে গেল। শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, উৎপাদিত পণ্য লুট হতে থাকল। ট্রেড ইউনিয়ন দখল, বাড়ি দখল, গাড়ি দখল এ সময় শুরু হয়ে গেল। এভাবে নানা কৌশলে একশ্রেণীর মানুষ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। আর একদল মানুষ দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল। এরপর এদেশের স্বাধীন মানুষেরা একাধিকবার সামরিক শাসন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষ করেছে সামরিক শাসনের রূঢ়রূপ। আবার গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে তারা দিনাতিপাত করেছে বহুদিন। যাইহোক, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, অনিয়ম, অবিচার, সন্ত্রাস, প্রতারণা ইত্যাদির অভিশাপ থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য আমাদের শাসকেরা নানা সময়ে এসব থেকে জনগণকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন খুব কমই হয়েছে। তাই প্রতিজ্ঞা কেবল প্রতিজ্ঞার পর্যায়ে থাকলে জনগণের মুক্তি আশা করা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগনীতি

বাংলাদেশের নৈতিক সংকট:

মানুষ বৌদ্ধিক ও নৈতিক জীব। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষীকরণের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, এর ফলে এসব ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মানুষের সহজাত নৈতিক বৃত্তিসমূহের সার্বিক বিকাশ লাভ করে নি। আজকের এই বস্তুবাদী শিক্ষা ও যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানুষের গড়ে উঠা উগ্র বস্তুবাদী মনোভাবের মধ্যে যদি সহজাত নৈতিক সংকট দেখা দেয় তবে মানুষের জীবন পরিনত হবে পশু জীবনে।

নৈতিক সংকট বলতে নৈতক মূল্যবোধের অভাবকেই বোঝায়। নৈতিক সংকট যখন ব্যাপক ও ঘনীভূত হয় তখন নৈতিক ব্যাধি বা সমস্যার সৃষ্টি হয়। নৈতিক সংকট বা নৈতিক অবক্ষয় মূলত একই অর্থ বহণ করে, যার অর্থ নৈতিক মূল্য সম্পর্কে উপলব্দি ক্ষমতার অভাব। আমরা এখন বাংলাদেশে নৈতক সংকট নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক সংকট বা সমস্যার আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে নৈতিক সংকট অত্যন্ত প্রবল। অর্থের মানদন্ডে সবকিছুকে বিচার করার একটি প্রবণতা মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত । ব্যস্ত নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে। বৈষয়িক উন্নীত প্রতারণা নয়। অতি ভোগ ও বিলাসী জীবনের জন্য অন্যের অধিকার হরণ, উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ, মিথ্যা ভাষণ, সততার বিসর্জন ইত্যাদি মানব জীবনকে কতটা অধঃপতিত করে, মানুষ আজও তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

সমাজের প্রতিটি স্তরে আত্মবাদী চিন্তা চেতনার প্রবাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি এসেছে বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে। আমাদের দেশের কিছু তথা কথিত বুদ্ধিজীবী আবার আত্মবাদী ধ্যান-ধারণার পক্ষে ওকালতি করেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে। বস্তুত তারাই মানবতার শত্রু। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "তাদের অন্তর আছে তার দ্বারা তারা বিবেচনা করেনা। তাদের চোখ আছে তার দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ-জন্তুর মত বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।"

দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজে মানুষের মনোবৃত্তি বিকৃত হয়ে যায়। মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবন যাপনের শক্তি হারিয়ে ফেলে। যুব সমাজের মেধা ও মননে নৈতিক ব্যাধির মাধ্যমে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই অবক্ষয় নৈতিক শিক্ষা, দক্ষতার যোগ্যতা, নৈতিক চেতনা, নৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বাভাবিক পন্থায় বিকশিত হয় না।

আমাদের সমাজের সর্বস্তরে নৈতিক সংকট আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের এক বড় প্রমাণ। নীতিবিজ্ঞানের ভাষায়-মিথ্যা, উৎকোচ, প্রতারণা, শোষণ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়কে নৈতিক ব্যাধি বলা হয়। আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, কর্তাকর্মী, ছাত্র-শিক্ষক প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে নৈতিক ব্যাধির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

যার ফলে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই অবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভয়াবহ পরিনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা কোন শিক্ষাই নয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষত্বকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত-অনৌচিত্য, সততা, মানবতাবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় না; সে শিক্ষার পিএইচডি ডিগ্রীধারী হলেও সে বিকারগ্রস্ত হতে বাধ্য।

কাজেই এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সুদূরপ্রসারী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এই ব্যবস্থা গ্রহণে যত বিলম্ব করব তাতে আমরা শত হাজার বছর পিছিয়ে যাব।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা পুলিশের দুর্নীতি সর্বজন বিদিত। পুলিশের দুর্নীতি আজকের নতুন কিছু নয়। উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের রচনায় পুলিশ চরিত্রের বিরূপ আলোচলা লক্ষ্য করা যায়। পুলিশেরা অত্যাচারী এবং নির্লজ্জ ঘুষখোর এসব মন্তব্য আমরা তাদের রচনায় লক্ষ্য করি। সম্প্রীতিকালে এই পুলিশ বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ত্রাসী, চোরা কারবারী, মাদক পাচারকারী, শিশু ও নারী পাচারকারীদের পালন করে বলে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকার গুলশান বনানীর অধিকাংশ অভিজাত বাড়ীর মালিক পুলিশ কর্মকর্তারা। এতে তাদের অবৈধ আয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রায়শই তাদের দুর্নীতির বর্ণনা পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তাদের কর্মকান্ডের নৈতিক বিচার করলে তাদেরকে আর মানুষ বলা যায় না। তারা পশুর চেয়েও আরো নিচে নেমে গেছে। তাই এখানে তাদের কুকীর্তির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষ ও সমাজ কত ব্যাপক ও শোচনীয় দুর্নীতির শিকার তা বোঝানোর জন্য কয়েকটি সেকটরের দুর্নীতির প্রতি ইঙ্গিত করছি মাত্র। দেশের প্রায় সকল বিভাগই দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি, অন্যায়, অনৈতিক কর্মকান্ড বাংলাদেশে প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এ সব কিছুই হচ্ছে নৈতিক সংকটের কারণে।

নৈতিক ব্যাধির কয়েকটি দিক:

সাধারণত পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবীয় মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়ার পরবর্তীতে মানবীয় আচরণে যা কিছুই চলে আসে তাকেই নৈতিক অবক্ষয় বলা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সার্বিক আচরনের মধ্য হতে মূল্যবোধ, মমত্ববোধ, নৈতিকতা বিলীণ হয়ে যাওয়ার পর তার বিপরীত যে সব অনৈতিক অবক্ষয়যুক্ত আচরণ সম্প্রসারিত হয় তাদের সমন্বয়গত প্রতিফলনই হল নৈতিক অবক্ষ। মানব সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের নমুনা বহুবিধ।

যেমন:

১. দুর্নীতি
২. যৌতুক প্রথা
৩. খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল
৪. যৌনতা, অশ্লীলতা ও ব্যাভিচার
৫. পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু ফ্লিম
৬. ইভটিজিং
৭. এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন
৮. শিশু অপরাধ ও ইসলাম
৯. দুর্নাম, গীবত ও চোগলখুরি
১০. বেকারত
১১. আত্মহত্যা
১২. সন্ত্রাস
১৩. চৌর্যবৃত্তি
১৪. মাদকাসক্তি

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম

দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দুর্নীতি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে চলছে লাগামহীন দুর্নীতি। দুর্নীতির মাত্রাও বিশ্বব্যাপী ক্রমেই বাড়ছে। তাছাড়া আগের চেয়ে বিভিন্ন অভিনব কায়দায় দুর্নীতি হচ্ছে এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটছে। শক্তির অপব্যবহার এবং অপরাধের শিকড় হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে বাড়ছে মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। দুর্নীতির ন্যায় এ সমাজ বিধংসী ব্যাধি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নিত্য সহচরের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতায় মনে হয় এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তবে সমাজ থেকে কিভাবে দুর্নীতি দূর করা যাবে সেটা এখন বিশ্বব্যাপী একটি জিজ্ঞাসা। ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা চরমভাবে দুর্নীতিকে প্রতিহত করছে। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে দুর্নীতির পরিচয়, এর উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণ, প্রতিরোধের উপায় ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কি ধরণের বিধান প্রনয়ণ করেছে,সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা:

দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। এর ধরণ,গতি-প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। সহজ ভাষায় কু-নীতি, কু-রীতি বা নীতি বহির্ভূত কর্মকান্ডকে দুর্নীতি বলে।[১] দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, আদর্শ ও মূল্যাবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা,সুযোগ-সুবিধা, পদবী প্রকৃতির অপব্যবহার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট।

---

১. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৯

*রামনাথ শর্মার মতে, "অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।"[২]

* Oxford English Dictionary তে বলা হয়েছে, Dishonest , illegal behabior , especially of authority, elegations of bribery.[৩] অর্থাৎ "দুর্নীতি হল অসসতা, অবৈধ আচরণ, বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের আইন বহির্ভূত আচরণ, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ইত্যাদি।"

* World Bank কর্তৃক প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞা হলোঃ Corruption is the abuse of public power for privet benefit[৪] অর্থাৎ "দুর্নীতি হলো ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী দায়িত্বের অবহেলা করা।"

* Trancparency Interational (TI) Ges Corruption Perception Index (CPI) প্রতিবেদনে দুর্নীতি বলতে সরকারি ক্ষমতা ও সুবিধাকে বেসরকারি বা ব্যক্তি স্বার্থে অপব্যবহার এবং সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিকে বুঝানো হয়েছে।[৫]

* Trancparency Interational এর সংজ্ঞা হলঃ Corruption is the abuse of public office for privat gain. অর্থাৎ "সরকারি দফতরকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।" [৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, দুর্নীতি হলো দায়িত্ব অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ। স্ব-স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষে কৃত অপরাধমূলক আচরণই হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি এবং ভদ্রবেশী অপরাধ সহধর্মী ও সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও কলা কৌশলগত দিক থেকে দুর্নীতি ভিন্নধর্মী অপরাধ যা দুর্নীতিবাজদের দৈহিক অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন-উৎকোচগ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধভাবে পেশাগত প্রভাব খাটানো,স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি।

---

২. Ramnath Sharma," Indian Social Problem`s (Media Promoters Pvt. Ltd. Bombay 1982) P. 101"

৩. A. S Hornby, Oxford Advanced Learner's of Current English, Oxford University Press, 2000, P-201

৪. Vito Tanzi, "Corruption around the world couses. consequencesscope.

৫. আব্দুন নূর, 'আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' তা. বি পৃ. ১৭-১৮

৬. মুহাম্মাদ মুহিউদ্দন, দুর্নীতি ও উন্নয়নঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ঢাকাঃ মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, মার্চ-২০০৬, পৃ.৪৩

দুর্নীতির কারণ:

দুর্নীতি একটি জটিল সামাজিক ব্যাধি। মানুষ কোন কোন অবস্থায় দুর্নীতি করে তার উত্তর নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দুর্নীতির পরিধি ও প্রকৃতি যেমন বিচিত্র ধরণের, তেমনি এর কারণও বহুমুখী। সমাজ বিজ্ঞানী এইচ.এ.ফিলপ্স-এর মতে, প্রতিটি সমাজে মানুষের ধন-সম্পদ অর্জন, দৈহিক ও মানসিক ভারসম্য রক্ষা করা এবং দলগত ও ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য বিধানের কতগুলো আদর্শ থাকে। এসব আদর্শ সামাজিক অনুমোদন লাভের মধ্যে দিয়ে সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এসব আদর্শের বিচ্যুতি হতেই জন্ম নেয় সামাজিক দুর্নীতি। কোন ব্যক্তি বা দল যদি সমাজ অনুমোদিত আদর্শ ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে নীতি বহির্ভূত উপায়ে স্বীয় উদ্ধারের চেষ্টা করে, তখন তাকে দুর্নীতি বলা হয়। দুর্নীতি হচ্ছে সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থিমূলক কাজ। প্রচলিত আইনের অস্পষ্টতার সুযোগে, সামাজিক নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে স্ব-স্ব পেশা এবং ব্যবসার মধ্যে দিয়ে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা হতে জন্ম নেয় দুর্নীতি।[৭]

আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নীতি নৈতিকতার অবক্ষয় আর আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের তীব্র বাসনা বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজের স্বাভাবিক উপায়ে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করেছে। যার প্রভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বল্প আয়ভুক্ত ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর মানুষ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সাথে পাল্লা দিয়ে জীবন যাপন করতে গিয়ে । আর আর্থিকভাবে সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত তারাও দুর্নীতির আশ্রয়ে অধিক অধিক সম্পদের মালিক হতে সদা সচেষ্ট। রাতারাতি আর্থ- সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি লাভের তীব্র আকাঙ্খা এদেরকে দুর্নীতিগ্রস্থ করছে। কিভাবে স্বল্প সময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়া যায়, তার প্রচেষ্ঠা হতে সমাজের উচ্চশ্রেণী স্ব-স্ব ক্ষমতা ও পেশাগত পদবীর অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি করে থাকে। সমাজের উচ্চ শ্রেণী স্ব-স্ব ব্যবসা ও পেশার মধ্য দিয়ে যেসব দুর্নীতি করে তার দ্বারা সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার তুলনায় সমাজের সর্ব সাধারণের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের ক্ষতি খুবই নগণ্য।[৮]

বেকারত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজে দুর্নীতি প্রসারিত হয়ে থাকে। বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সমাজে দুর্নীতি সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যেমন ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে কেউ চাকরী পেলে সেও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষ লেন-দেনের সাথে স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে পড়বে। আমাদের সমাজের একটি বড় অংশের নিকট অর্থই হলো সমাজিক মর্যদা পরিমাপের প্রধান মানদন্ড।

যে যত বেশী সম্পদশালী, সমাজে সে তত বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। অর্থ অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা লাভের অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে প্রভাব বিস্তার করছে। সৎপথে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে এরূপ আর্থিক মর্যাদা অর্জনের প্রতিযোগিতা সম্ভব নয় বিধায়মানুষ বাধ্য হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।[৯]

---

৭. উদ্ধৃত, মো: আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

অন্যান্য কহুবিধ সমস্যার ন্যায় দুর্নীতিও সামাজিক অস্থিরতার ফসল। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে দুর্নীতি বিস্তারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিতিশীলতাও বহুলাংশে দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচিতির সুযোগ নিয়ে ব্যাপকহারে দুর্নীতি করা হয়। সদা জাগ্রত দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। যারা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সম্পর্কে সদা সচেতন তারা দুর্নীতি থেকে যেমন নিজেরা বিরত থাকে তেমনি অন্যকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখে।

যখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশ ও জাতির স্বার্থে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়,তখনই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাবেই আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, সার প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল মিশিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা হয়। নিজ সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়া দুর্নীতির অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃংখলাপুর্ণ পরিবেশ, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ প্রভৃতি রয়েছে। মোটকথা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই দুর্নীতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এজন্য আইনের শাসন স্থিতিশীলতা আনয়ন, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতা রোধ জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকরণ, দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি হ্রাস করা যায়।

দুর্নীতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যথাযথভাবে না হওয়ায়ও উন্নয়ন ব্যহত হয়। এতে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে আত্মসাৎ করার ফলে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। দুর্নীতি দারিদ্র প্রসারের সহায়ক। দুর্নীতির আশ্রয়ার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করার মুদ্রাস্ফীত বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাবে দারিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া দুর্নীতির প্রভাবে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ফলে দারিদ্র হ্রাস না পেয়ে দারিদ্র প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। দুর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতি সমাজে দ্বন্দ, সংঘাত, কলহ সৃষ্টি করে। দুর্নীতি চক্রাকারে ক্রিয়াশীল আত্মঘাতী সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয়ে অন্যকে প্রতারিত করে, আবার সেও অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। ক্ষমতা অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনিও ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। এভাবে চক্রাকারে দুর্নীতি সমাজে প্রসারিত হয়। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা প্রদানে ব্যর্থ হয়। সমাজে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে সমাজের মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের বিধি-বিধানঃ

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবন-বিধান হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংকটের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা,সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগেই বন্ধ করে দেয়।

এ উদ্দেশ্যে ইসলাম মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এর পরে কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। দুর্নীতি অনেকগুলো বিষয়কে অন্তরভূক্ত করে। যেমন ঘূষ, স্বজনপ্রীতি, খেয়ানত, দ্রব্যে ভেজাল, কালোজারী মওজুদারী ইত্যাদি। মহানবী (স.) এসকল বিষয় থেকে সতর্ক থাকার জন্য মানব জাতিকে উদেশ দিয়েছেন।[১০] দুর্নীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহকে হারাম ঘোষণা করা দুর্নীতি দমনে মহানবী (স.) এর প্রথম পদক্ষেপ। ইসলাম খাদ্য, বস্ত্র,পানীয়, কর্ম, উপার্জন তথা সকল বিষয়ে শুধু হালাল ও হারামের পথই নির্দেশ করেনি; বরং বৈজ্ঞানিক পন্থায় যুক্তির মাধ্যমে হারামের অপকারীতা এবং হালাল বস্তুর উপকারীতাও বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"হে মানব মন্ডলী ! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সেতোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১]

মহানবী (স.) বলেছেন, ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদ্কা করে, তা কবুল করা হবে না । তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকত ও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেও হয় মাত্র।[১২]

"মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। [১৩]

এভাবে ইসলাম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদের অপকারিতা এবং স্বীয় কষ্টে উপার্জিত হালাল সম্পদের উপকারিতা বর্ণনা করে মানব জাতিকে দুর্নীতি মুক্ত জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত পাপ করা হয়, তা অধিকাংশ বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি প্রদান , পদোন্নতি প্রদান,অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান, স্বজন প্রীতি, অন্যের সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। বান্দার সহিত সংশ্লিষ্ট হক যথযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে , তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যাবর্তন কর।"[১৪]

---

১০. ইমাম অলি আল- দীন মুহাম্মদ মিশকাক আল-মাছাবিহ (কলকাতা, এমবশির হাসান এণ্ডসন্স, তাবি) পৃ. ২৫১
১১. আল-কুরআন, ২: ১৬৮
১২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ মুসনাদ, ৩য় খন্ড, দার আল-হাদীস, মিশর -১৯৯৫, পৃ. ৪৬০
১৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী। সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, আধুনিক প্রকাশনী, পৃ. ৩৪৫, ঢাকা-১৯৯৬
১৪. আল-কুরআন, ৪: ৫৮

রাসূল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।"[১৫] রাসূল

(স.) বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৬]

ইসলাম ধনলিপ্সা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দান করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে," নিশ্চয়ই তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদী তোমাদের জন্য ফেতনা। আর আল্লাহ তা'য়ালার নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"[১৭] মহানবী (স.) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।"[১৮] তিনি আরো বলেন, "পার্থিব ভোগ বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।"[১৯]

বর্তমান সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি এত নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তারা নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ আদালত সবকিছুকে ফেলে রেখে অর্থকেই সব সময় বড় মনে করছে। সমাজে যার যত বেশী সম্পদ সেই বেশী সম্মানিত, যদিও সে দুর্নীতির মাধ্যমে তা অর্জন করুক না কেন। মানুষের মাঝে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে পড়ায় দিন দিন দুর্নীতি বাড়ছে। কিন্তু ইসলাম এই মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত ঘৃনা করে এবং দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীকে যারা শুধু অর্থবৃত্তের কারণে শ্রদ্ধা করে তাদেরকে জুলুমের সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ইসলাম অর্থ-সম্পদ নয়, তাকওয়াকে সম্মানের মানদন্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালাবলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে তাকওয়াবান।"[২০] বস্তুত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে যে গুনাবলী থাকা প্রয়োজন, যেমন সততা, ন্যায়পরায়ণতা, তাকওয়া, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, দেশাত্ববোধ, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সত্যের উপর দৃঢ়তা ইত্যাদি অধুনা সমাজ সংসারে খুবই বিরল।অথচ ইসলাম দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়াকে বাধ্যবাধকতা করেছে। উল্লেখিত গুণাবলী সমাজপতি থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারের জন্যও করেছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "যে লোকের দিল আল্লাহর স্মরণ শূণ্য আল্লাহ আনুগত্যমূলক ভাবধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার, আর এ কারণে যার

---

১৫. মুহাম্মদ মুহাম্মদী আর-রায় শাহবী, মিযানুল হিকমাহ, মাকতাবুল আলম আল-ইসলামী- ১৩৪৭ হি. পৃ. ৩৪৫

১৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, পৃ.৩৪৫

১৭. আল-কুরআন, ৮:২৮

১৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল রিকাক, খন্ড-৬ , পৃ. ২০

১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাযাহ আল-কাযভিনি, সুনান ইবনে মাযাহ, কিতাবুল যোহুদ (দারুল আল-ইহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়া) তাবি, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৪

২০. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

কাজ-কর্ম বাড়াবাড়ি তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না।"[২১] এ ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন," কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে জালিম শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃনিত এবং আসন গ্রহণের দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে।"[২২]

অপরদিকে ইসলামে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক কাজে নিয়ুক্তির ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন, "কোন কাজের প্রধান পদে নিয়ুক্তির জন্য যোগ্য কেবল সে ব্যক্তিই হতে পারে যে তার যোগ্যতা রাখে।"[২৩]

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পবেতন প্রদান দুর্নীতির প্রতি উৎসাহ বাড়ায়। তাই ইসলাম সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক তথা সকল দায়িত্ব পালনকারীর ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিক নিশ্চিত করেছে । কারো ভাই তার অধীন থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাকে তা খাওয়াবে। নিজের যা পরিধান করে তাকেও তাই পরিধান করবে এবং তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। কোনভাবে তার উপর আরোপিত বোঝা বেশী হলে নিজেও তাকে সে কাজে সহায়তা করবে। [২৪]

দুর্নীতির শাস্তি বিধান:

ইসলাম একদিকে যেমন দুর্নীতি দূরীকরণের প্রতিরোমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি তা প্রতিকারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এজন্য ইসলাম সকল প্রকার দুর্নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। মিথ্যাচার, ওয়াদা খেলাফ করা, সরকারী অর্থ আত্মসাথ করা, দলীয় করণ, স্বজন প্রীতি, সরকারী অর্থ অপচয় বা অপব্যয় করা, প্রশাসনিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, জুলুম বা হয়রানী করা, কর্মে ফাঁকি দেয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি বিষয় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক দুর্নীতির অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতিপক্ষের দুর্নাম করা, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা তার দোষ খুঁজে বেড়ান গীবত করা, সুবিধা লাভের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকট চোগলখোরী করা ইত্যাদি বিষয় ও দুর্নীতির আওতায় পড়ে। এসকল বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত স্বচ্ছ। যেমন মিথ্যাচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, অর্থ্যাৎ, "যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।"[২৫] রাসূল (স.) বলেছেন, "ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে।"[২৬]

ইসলাম যে কোন ওয়াদা চুক্তি যথাযথভাবে পালন করার প্রতি জোর দিয়েছে । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর।"[২৭] মহানবী (স.) বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খেয়ানত করে।"[২৮]

---

২১. আল-কুরআন, ১৮:২৮
২২. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্-তিরমিযী, জামে তিরমিযী, আহকাম অধ্যায় (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , ঢাকা-১৯৯৭) পৃ. ৫
২৩. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০) পৃ. ২০০৩
২৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৫৯০
২৫. আল-কুরআন, ৩:৬১
২৬. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, (৪র্থ খন্ড) পৃ. ১৮৫
২৭. আল-কুরআন, ৫:১
২৮. আল-কুরআন, ৫:১

মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা দখল করার প্রতি ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা জবর দখলকারীর জন্য ইসলামে শাস্তির রাখা হয়েছে এবং পরকালে তাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন,"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[২৯] রাসূল (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দাংশ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত জমিনের নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। "[৩০]

চুরির শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন,"পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত কেটে দাও। তা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং নির্ধারিত আদর্শ দন্ড।"[৩১] এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেছেন,"আল্লাহ তা'য়ালা জালিমকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ধরবেন তখন তাকে আর অবকাশ দেয়া হবে না।" [২]

তিনি আরো বলেন, "অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আকে ভয় কর, কেননা ঐ দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৩৩]

অপরদিকে হারাম জিনিস বিক্রয়,ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয়, মজুদদারী , চোরামাল ক্রয় , বাজার স্বাধীনতায় কৃতিম হস্তক্ষেপ, মোনাফাখোরী,ধোঁকাবাজী,ওজনে কম দেয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুর্নীতির অর্ন্তভূক্ত। নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা কিংবা তার ব্যবসা করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম এবং গুনাহ পর্যায়ের কাজ।

এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করাও হারাম। শূকর, মদ্য, হারাম খাদ্য - পানীয়, মূর্তি ক্রুশ,প্রতিকৃতি প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.) মদ্য, মৃতজীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৩৪] আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। "রাসূল (স.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারীনীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপাজিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৫]

পন্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেয়া কিংবা ওজন করে নেয়ার সময় বেশী নেয়া ইসলামী বিধান মতে দুর্নীতির শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, "মন্দ পরিনাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[৩৬]

---

২৯. আল-কুরআন, ৫:৩৮
৩০. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস, (২য় খন্ড), পৃ. ৪৮৩
৩১. আল-কুরআন ,৫:৩৮
৩২. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, (৪র্থ খন্ড), পৃ. ৪২৮
৩৩. প্রাগুক্ত, কিতাবুত মাগাযী, হাদীস নং ৪০০০
৩৪. প্রাগুক্ত, কিতাবুত বুয়ু , (২য় খন্ড) , পৃ. ৩৭৪।
৩৫. প্রাগুক্ত, কিতাবুত বুয়ু , (২য় খন্ড) , পৃ. ৩৭৪।
৩৬. আল-কুরআন ,৮৩:১-৩

ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলেই দ্রব্যমূল্য আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, বাজারে পণ্য আমদানি ও তার চাহিদা অনুপাতে দ্রব্যমূল্য উত্থান-পতন হতেই থাকে। নবী করীম (স.) এর যুগে তাই দেখা যায়, যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলো লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমাদের জন্য দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন । তখন নবী করীম (স.) বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য মূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি মূল্য বৃদ্ধি করেন,তিনি সস্তা করেন। রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ জুলুম , রক্তপাত বা ধন-সম্পদ অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার উপর কেউ থাকবে না।"[৩৭]

নবী করীম (স.) এ হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চাপানো জুলুম এবং সেই জুলুম থেকে ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও স্বার্থপরতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ইসলাম সমর্থন করে না। ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে খাদ্যপণ্য ও জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা । এ জন্যই নবী করীম (স.) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিছন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে লোক চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও সম্পর্কহীন হয়ে গেলেন তার থেকে।"[৩৮] নবী করীম (স.) আরো বলেছেন, "পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[৩৯] ইসলাম ধোঁকা প্রতারণার সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক কোনক্রমেই তা বৈধ নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে সব ব্যাপারেই সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে।

নবী করীম (স.) বলেছেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু' জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দু'জন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নির্মূল হয়ে যাবে।[৪০]

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া বা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা গর্হিত কাজ। যেমন ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের অথবা দামাদামী করা । মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।"[৪১]

---

৩৭. ইমাম তিরমিযী , প্রাগুক্ত ,কিতাবুল বুয়ু , হাদীস নং ১২৩৫
৩৮. ইমাম আহমাদ , মুসনাদ , হাদীস নং ৪৬৪৮
৩৯. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহী মুসলিম, (করাচী, আসাহহাল মাতাবী- ১৯৩০ খৃ.) হাদীস নং ৩০১৩
৪০. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত বুয়ু, পৃ. ৩২৬
৪১. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, (১ম খন্ড), পৃ. নং ২৪৪

পণ্য বিক্রয় পাত্র দ্বারা মাপার সময় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করতে কম দেয়াও ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সূরা আল-আনয়ামে এই বিষয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা সুবিচার সহকারে পূর্ণ ভর্তি করে দাও । মানুষের সাধ্য-সামর্থের অধিক আমরা কোন দায়িত্বই তার উপর চাপিয়ে দিই না।"[৪২] আরও বলা হয়েছে,"আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ় সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম।"[৪৩] মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, অর্থ্যাৎ, "ওজনে যারা কম করে তাদের জন্য বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে আনে তখন পূর্ণ মাত্রায় মেপে আনে। আর যখন মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখেনা যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরাত্থিত হবে , যেদিন সমস্ত মানুষ রবক্ষুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে।"[৪৪]

ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে শুনে ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর এবং ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।"[৪৫] সুদের পন্থায় 'মুনাফা ' লাভ করার সকল পথকে ইসলাম বন্ধ ও হারাম করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় কর এবং সুদী কারবার ছেড়ে দাও যদি তোমরা ঈমানদার হও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে। আর তোমরা জুলুম করবে না আর না তোমাদের উপর জুলুম করা হবে।"[৪৬]

এইভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল প্রকার দুর্নীতিকে হারাম ঘোষণা করে তার মূলোচ্ছেদ করেছে। অবৈধ উপায়ে ও অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ লেনদেনের একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ । প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা দায়িত্বশীল বক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে। শাসক-প্রকাশক বা তার সহকারীদের জন্য ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেশাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। "[৪৭]

---

৪২. আল-কুরআন, ৬ : ১৫২

৪৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৫

৪৪. আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৬

৪৫. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (অনুবাদক মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীসম, খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭) পৃ. ৩৪২।

৪৬. আল-কুরআন, ২:২৭৮-২৭৯

৪৭. আল-কুরআন, ২:১৮৮

সর্বোপরি হারাম উপায়ে তথা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ করে ইবাদত করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। এমনকি এ অবৈধ সম্পদ দ্বারা কোন ভাল কাজ করলে বা দান-সাদকা করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। মহানবী (স.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল লাভ করে সাদ্‌কা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। কিন্তু তিনি মন্দকে সৎকর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে মেটাতে পারে না।"[৪৮] প্রকৃতার্থেই দূর্নীতি ও প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন অকল্যাণকর ওঅপমানজনক। ইসলাম এহেন গর্হিত কাজ হতে মানব জাতিকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণকর-অসৎকর্মের মাধ্যমে সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে।"[৪৯]

যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

যৌতুকের ধারণা ও পরিচিতি:

'যৌতুক' বাংলা শব্দ। এটির প্রতিশব্দ হচ্ছে 'পণ'। যৌতুক এবং পণ শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে এবং এ দুটি শব্দই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত হতে এসেছে। হিন্দিতে এটির প্রতিশব্দ হচ্ছে 'দেহায' (Dehaj) আরবি ও ফারসি ভাষায়-এর সমার্থক কোন শব্দ না থাকলেও 'বায়েনাহ্' ও 'দাওহাহ' আরবি শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থে যৌতুক বা পণ বুঝানো হয়ে থাকে। কনে পক্ষ হতে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রিকে উর্দুতে যাহেজ (Jehaj), যেহাজ (Jahaz) বলে। ইংরেজিতে Dowry শব্দটি বিয়ের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ, সম্পত্তি ও উপঢৌকনকে বুঝানো হয়ে থাকে।[৫০] সাধারণভাবে এবং ব্যাপক অর্থে বিবাহের সময় কনের অভিভাবক এবং পরিবার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে পাত্র পক্ষকে যে অর্থ, সম্পদ, অলংকার, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি প্রদান করে থাকে তাকে যৌতুক বলে।[৫১] মেয়েকে ভাল পাত্রের হাতে তুলে দেয়ার অভিলাষে অর্থাৎ ভাল পাত্র ও পাত্রের অভিভাবকদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য স্বেচ্ছায় কনেপক্ষ যৌতুক দিয়ে থাকে। যৌতুক সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখায় যৌতুককে কমপক্ষে তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৫২]

---

৪৮. ইমাম আল-আল-দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল মাসাবিহ (কলকাতা, এম বশি হাসান এন্ড সন্স, তাবি), পৃ. ২৪২
৪৯. আল-কুরআন, ১০:২৭
৫০. Menski, Werner, æDowry: A survey of the Issues and the Literature In Werner Menski (ed) South Asian and the Dowry Problem (Gems no. 6, 1998), P. 41.
৫১. Ibid, P. 41.
৫২. Ibid, P. 42

প্রথমত, বিবাহ অনুষ্ঠানে কনেকে প্রদত্ত অথবা নিজেদের সংসারে বা যৌথ পরিবারে ব্যবহারের জন্য কনে যে উপঢৌকন, অলংকার, গৃহস্থালি ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার্থে বিয়ের সময় দু'টি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতীক হিসেবে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়কৃত সমমূল্যের উপহার সামগ্রী। পারিবারিক মর্যাদার উপাদান হিসেবে এ ধরণের ব্যয় বা লেনদেনকে যৌতুক সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কেননা, বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে কনের পিতামাতাকে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে অন্যান্য অনেক ধরণের ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং এ ধরণের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে অনেকে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়। এ ধরণের ব্যয় নব দম্পত্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে তেমন একটা আর্থিক সুবিধা বয়ে আনে না বিধায় তা যৌতুকের অন্তর্গত করা যথার্থ।

তৃতীয়ত, যৌতুক হচ্ছে এমন সম্পত্তি যা বিবাহের শর্ত হিসেবে অথবা বিবাহ পরবর্তী সময়ে স্বামী, বেশির ভাগ সময়ে তার পরিবার কর্তৃক প্রত্যাশিত অথবা এমনকি দাবিকৃত সম্পত্তি।

এ ধরণের যৌতুক বিবাহের প্রতিদান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে এবং আইনের পাঠ্যবই এবং ভারত ও বাংলাদেশের যৌতুক বিরোধী আইনে এ ধরণের অর্থেই যৌতুককে বুঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে, যৌতুকের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলঃ যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্যপক্ষকে অথবা বিবাহের যে কোন পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কেউ কর্তৃক বিবাহের সময়, বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে বিবাহের প্রতিদান হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা দিতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির মূল্যবান নিদর্শনপত্র বুঝায়।[৫৩]

লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের আইনে যৌতুকের সংজ্ঞায় বর বা তার পিতামাতা কিংবা আত্মীয় স্বজন কর্তৃক দাবিকৃত কোন সম্পত্তি, নগদ অর্থ বা দ্রব্যাদির অর্থ বা দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যৌতুক হচ্ছে বিবাহের কারণে প্রদত্ত এমন নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রি যা প্রদান না করলে বিবাহের কোন প্রশ্নই উঠবে না। যৌতুক প্রথার সাথে জড়িত প্রধান বিষয়টি হচ্ছে, বাধ্যবাধকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ধারিত অর্থ, সম্পত্তি বা দ্রব্যাদি যা কনের পরিবার হতে শর্ত হিসেবে দাবি করা হয়। বাংলাদেশে, বিশেষত, গ্রাম্য এলাকায় যৌতুক এখন বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে।[৫৪]

যৌতুকের ধারণাঃ যৌতুককে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-(১) প্রত্যক্ষ যৌতুক ও (২) পরোক্ষ যৌতুক।

---

৫৩. ধারা-২, The Prohibition Act, 1980 as amended by the dowry prohibition, (Amendment) Ordinance, 1984. The Dowry Prohibition (Amendment) Ordinance, 1984 যৌতুকের সংজ্ঞায় æat, before or after marriage" এর পরিবর্তে" at the time of marriage or at time প্রতিস্থাপন করেছে।

৫৪. Quote in Rambilass Bisraams æWhy does not exist among Indian South Africans" Werner Menski (ed) পূর্বে উদ্ধৃত ৬৩

প্রত্যক্ষ যৌতুক: প্রত্যক্ষ যৌতুক বলতে সাধারণত বিবাহ সম্পাদনের বিনিময়ে কন্যাপক্ষ বর পক্ষকে কোন কিছু দেয়ার সরাসরি প্রস্তাব করা এবং দেয়া অথবা কন্যাপক্ষের নিকট সরাসরি কোন কিছু চাওয়া এবং নেওয়াকে বুঝায়। এ ধরণের যৌতুক নগদ অর্থও হতে পারে কিবা পণ্য সামগ্রি বা অন্য কিছু ও হতে পারে। নগদ অর্থের মধ্যে টাকা-পয়সা, ডলার, পাউন্ড বা অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য সামগ্রির মধ্যে রেডিও, টু ইন ওয়ান, টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট, আলমারি, পাখা, ফার্নিচার, স্বর্ণালংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। অন্যকিছুর মধ্যে বিদেশ ভ্রমণ করানো, ঘর-বাড়ি করে দেয়া, ভাই-ভাতিজা-ভাগিনার চাকুরি দেয়া, বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রাইভেট গাড়ি চাওয়া, টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করে দেয়া ইত্যাদির সরাসরি প্রস্তাব করা বা চাওয়া।

পরোক্ষ যৌতুক:

বিবাহ সম্পাদনের বিনিময়ে ছেলের পক্ষ কর্তৃক যদি যৌতুকের সমার্থবোধক কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পাদনকারীকে কোন কিছু দেয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিংবা বিবাহ সম্পাদনকারী কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বা কারো নাম ব্যবহার করে মেয়ের পিতার নিকট কোন কিছু চাওয়া হয়, তাহলে তা হবে পরোক্ষ যৌতুক। এ ধরণের যৌতুক নগদ অর্থও হতে পারে, আবার পণ্য সামগ্রী বা অন্য কিছু ও হতে পারে।

এ ধরণের যৌতুকে সাধারণত যৌতুকের সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন: বখশীশ, খরচাপাতি, খুশি করানো, সুদৃষ্টি, সম্মানী, ম্যানেজ, কমিশন, নেগোশিয়েইট, এক্সট্রা, ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি। যৌতুকের উপাদান, ধরণ, প্রকৃতি, সময়, অবস্থা, পাত্র পদ্ধতি ইত্যাদির বিভিন্ন ভেদে যৌতুকের আরো বিবিধ শ্রেণী বিভাগ হয়েছে। লোক ও পদমর্যাদা ভেদে এর পরিমাণ ওঠানামা করে।

যৌতুকের উৎপত্তি:

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রাচীনকালে যৌতুক বা উপহার প্রদান প্রথা আদিম অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে একটা কিছু যৌতুক দেয়া হত। বিনিময়ে অতিথিও কিছু উপঢৌকন দিতেন। প্রাচীন রোম, গ্রীস, মধ্যযুগীয় ইউরোপসহ অনেক দেশেই যৌতুক দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তখন বিভিন্ন সমাজে দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মেয়ের বিয়ে দেয়া হত। বিয়েতে কন্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব দেয়ার ঘটনাও চালু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজে রত্নালংকার, দাস-দাসী, গরু-মহিষ, হাতি প্রভৃতি যৌতুক দেয়ার প্রথা ছিল।[৫৫] বিবাহে যৌতুকের আদান-প্রদান বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষণীয়। ঋগবেদের ১০ম মন্ডলে বলা হয়েছে, সূর্যকন্যা সূর্যারত বিবাহে প্রচুর যৌতুক প্রদান করা হয়েছিল। সূর্যার পতিগৃহ গমনকালে সেই যৌতুকসহ আগে আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই যৌতুকের অঙ্গীভূত গাভীসমূহ অর্জনী তাড়িয়ে নিয়ে যায়।[৫৬] এই মন্ডলেই ৩৯ সূত্রে কন্যাকে বসনে-ভূষণে

---

৫৫. আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০, পৃ.১০৮

৫৬. কামন্ত ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পফুলফলৈঃ শুভৈ।
ন তু নামাপিগৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু। (৫/১৫৭)

সজ্জিত করে জামাতার হাতে অর্পণ করার উল্লেখ আছে।[৫৭] মনুসংহিতায় যৌতুক প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। নবম অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে মায়ের যৌতুকলব্ধ ধন কুমারী কন্যার প্রাপ্য এবং উপুত্রকে সমস্ত ধন প্রাপ্য দৌহিত্রের।[৫৮]

এছাড়া মনুসংহিতায় ব্রাহ্ম দৈব এবং প্রজাপদ্য বিবাহ কন্যাকে অলংকৃত করে সম্প্রদান করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।[৫৯] মনু অবশ্য কন্যার বিবাহ পণ-গ্রহণকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন, শুধু নিষেধ নয়, বলেছেন-যে পিতা অপত্য বিক্রয় করে অর্থাৎ বিয়েতে পণ গ্রহণ করে সে এবং গোহত্যাকারী সমান পাপী।[৬০] মনু আবার একথাও বলেছেন যে, বিয়েতে কেবল পিতাই কন্যাকে যৌতুক প্রদান করবে তা নয়, বরপক্ষেরও উচিৎ কন্যাকে উপহার প্রদান করা এবং সে উপহার কন্যাকে দিয়ে দিলে কন্যা বিক্রয় হয় না এবং পিতার পণ গ্রহণে দোষ হয় না।[৬১]

বাৎসায়নের কামসূত্রেও যৌতুক এবং পণ প্রথার উল্লেখ আছে। এমনও বলা হয়েছে যে, যদি কন্যার অপ্রতুলতা দেখা দেয় কিংবা পিতা-মাতা বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হন তাহলে অর্থ দিয়ে দূতী নিয়োগ করে কিংবা সরাসরি কন্যার পিতা-মাতাকে অর্থ দিয়ে সম্মত করাতে হবে। [৬২]

প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে মানবিক কারণে যেহেতু পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের কোন অধিকার নেই সেহেতু বিয়ের সময় কন্যাকে সম্পত্তি ধরণের ‘কিছু’ প্রদান করা হত। মধ্য যুগে এসে তা বৃহৎ শক্তির কাছে ক্ষুদ্র শক্তির কন্যা দান ও ভূমি দানের আকার লাভ করে এবং মধ্যযুগের শেষোর্ধে কৌলিন্য প্রথার জাত্যাভিমান পণ প্রথায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তা আরো তীব্র আকার ধারণ করে যার চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে যৌতুকের আগ্রাসী ছোবলে আমাদের প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হতে হচ্ছে। খ্রিস্টপূর্বকালে আরব, পারস্য, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে বিয়ের সময় মেয়ের সাথে দুগ্ধবতী উট অথবা ছাগল দেয়া চল ছিল।

আমাদের দেশে গত দেড় দশক আগেও যৌতুকের চাহিদা বলতে সাধারণত নগদ কিছু টাকা, খাট-বিছানা, মেয়ের জন্য দু’একটা গহণা বুঝাত। কিন্তু সে চাহিদা এখন কেবল জিনিসেই বাড়েনি–সংখ্যায়ও বেড়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়েতে এখন খাট-বিছানার পাশাপাশি আলমারী, টেলিভিশন, হোন্ডা, ফ্রিজ, ভি.সি.আর, ডি.ভি.ডি প্লেইয়ার, ল্যাপটপ, মূল্যবান মোবাইল সেট ইত্যাদি চাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চবিত্তদের চাহিদা এর কয়েক ধাপ উপরে। সেখানে পাত্রের বাড়ির ‘স্ট্যাটাস মেইনটেইন’ করার কথা বলা হয়।

---

৫৭. সূর্যায়া বহতুধ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যস্তে গার্বোজুন্যো: পর্যুহ্যতে। (১০/৮৫/১৩)

৫৮. এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মক্ষাম ভৃগবো নরথম।
ন্যমৃক্ষাম ঘোষণাং ন মর্যে নিত্যং সূনুং তনয়ং দধানা: (১০/৩৯/১৪)

৫৯. মাতৃস্তু যৌতুকং যৎ সাৎ কুমারীভাগ এব স:।
দৌহিত্র এব চ হরেদ পুত্রস্যাখিলং ধনম্ । (৯/১৩১)

৬০. ঐ. (৯/১৩১)

৬১. ন কন্যায়া: পিতা বিদ্বান গ্রহ্ণীয়াচ্ছুল্ক মণ্বপি। (৩/১৫)

৬২. অর্হণং তৎকুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম। (৩/৫৪)
প্রাচুর্যেণ কন্যায়া বিবিক্তদর্শনস্যালাভে ধাত্রেয়িকাং প্রিয়হিতাভ্যামুপগুহ্যোপসর্পেৎ। (২/৫/১)

আর এ স্ট্যাটাস মেইনটেইন করতে গিয়ে কন্যাপক্ষের তালিকায় সবকিছুই অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্তের বেকার যুবকেরা চাকরি, বদেশে যাওয়ার খরচ এবং ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু যৌতুক হিসেবে আদায় করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুকের প্রভাব ও কারণ:

যৌতুক মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হলেও তা বহু সামাজিক ও মানসিক সমস্যার জন্ম দেয়। এটি হৃদয়হীন, অমানবিক ও কলংকিত নিষ্ঠুর প্রথা হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করছে। সমাজ জীবনে যৌতুক প্রথার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ কয়েকটি দিক হল–

১. যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি অহরহ ঘটছে। ফলে সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবারে শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

২. কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতা-মাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। যার ফলে আমাদের সমাজে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যার পিছনে যৌতুক প্রথার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।

৩. যৌতুকের লোভে আমাদের গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বর-কনের বয়সের অসাদৃশ্যপূর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় অসম্পূর্ণ মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ব লাভের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি সন্তান-সন্ততিদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৪. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের অন্যতম প্রতিবন্ধক হচেছ যৌতুক প্রথা। যার প্রভাবে সমাজে অবৈধ যৌন সম্ভোগ এবং পতিতাবৃত্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. যৌতুকের লোভে অনেক শিক্ষিত ছেলে অশিক্ষিত ও অসুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে। পরিণামে দাম্পত্য কলহের শিকার হয়ে স্ত্রীকে অকালে স্বামীর হাতে প্রাণ দিতে হয় না হয় চরম নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

৬. নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে যৌতুক। অন্যদিকে হয়রানির শিকার বা অপমানিত হচ্ছে অনেক পুরুষ। সে পুরুষ কন্যার পিতা। ফলে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ উভয়ই নিদারুণ চাপ ভোগ করছে সর্বনাশা যৌতুকের নিষ্পেষণে।

৭. বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক এই যৌতুক প্রথা। বেশিরভাগ আত্মহত্যার কারণ দাম্পত্য কলহ ও দারিদ্র্য। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করেই এসবের সৃষ্টি।[৬৩]

---

৬৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৯৮

'কর্মজীবী নারী'র তথ্য অনুযায়ী ২০০৬-২০০৭ সালে শুধু যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ৩৩৬ জন নারীকে। হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ৫৫ জনকে, আত্মহত্যা করেছে মোট ৪১ জন। 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' এর তথ্য অনুযায়ী যৌতুকের কারণে ২০০২-০৯ সালের মে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে ১৪৮৯ জনকে এবং একই সময়ে যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ৯১৮ জন। 'বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি' সূত্রে জানা যায়, ২০০৮ সালে যৌতুক সংক্রান্ত অভিযোগ ছিল ৭৮১ টি। কার্যদিবস অনুযায়ী গড়ে প্রায় ৩ জন আসে। এর মধ্যে মামলা দায়ের হয়েছে ৯২টি।[৬৪]

প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায়, ২০০৩ সাল থেকে ২০০৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত যৌতুকের জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ২৬২টি, নির্যাতিত হয়েছে ১২৪ জন, এসিডে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ১৪ জনকে, এসিডদগ্ধ হয়েছে ১২ জন, আত্মহত্যা করেছে ৯ জন। অথচ ঐ নির্যাতনের মামলা হয়েছে মাত্র ৬টি আর যৌতুকের জন্য আত্মহত্যার মামলা হয়েছে ৫টি।[৬৫]

২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP)'র রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এক দশকে বছরে ৫০ শতাংশ নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০১ সালে সার দেশে অন্তত ১২৮ জন মহিলা খুন হয়েছে। স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে ১৮ জন। আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪০ জন। যৌতুক দিতে না পারায় তালাক প্রাপ্ত হয়েছে ১৫ জন। একই সময়ে যৌতুকের কারণে সারা দেশে মামলা দায়ের হয়েছে মোট ২৭৭১ টি।[৬৬]

এভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে যৌতুক প্রথা এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের যৌতুক প্রথার কারণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, অসম বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যৌতুক প্রথা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

ক. যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে অতীতে থাকলেও তখন বর্তমানের ন্যায় গণদারিদ্র্য না থাকায় এটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হত না। বর্তমানেও সমাজে যদি দারিদ্র্য না থাকত তবে এটি প্রকট সমস্যারূপে চিহ্নিত হত না। বর্তমানেও আমাদের সমাজে ধনী পরিবারের পিতা-মাতার নিকট যৌতুক আভিজাত্য, সৌখিনতা, আদর, সোহাগ, গৌরবজনক এবং আনন্দের প্রকাশ মাত্র।

খ. পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও সম অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায় যৌতুক প্রথার মাধ্যমে তা পূরণের হাতিয়ার হিসেবে সমাজে যৌতুক প্রথা বিস্তার লাভ করেছে।

---

৬৪. দৈনিক সমকাল, ১লা নভেম্বর, পৃ. ১০, ২০০৯।

৬৫. দৈনিক সংগ্রাম, পিআইডি ইউনিসেফ ফিচার, ৮ই মে, ২০০৪।

৬৬. দৈনিক সংগ্রাম, পিআইডি ইউনিসেফ ফিচার, ৮ই মে, ২০০৪।

গ. আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে অনেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যের অভাবে সমাজের উঁচু শ্রেণীতে উঠতে পারছে না। এসব ধনী অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হওয়ার আশায় বিপুল পরিমাণ যৌতুকের বিনিময়ে অভিজাত ও বংশমর্যাদা সম্পন্ন পরিবারে কন্যার বিয়ে দিয়ে থাকে অথবা নিজের পুত্র সন্তানকে বিয়ে করায়।

ঘ. ধনী ও নব্যধনী যারা সম্পদের অসম বণ্টন ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে রাতারাতি সম্পদশালী হয়েছে, তাদের মধ্যে যৌতুক প্রদানের যে প্রতিযোগিতা ও অর্থহীন অহমিকাবোধ রয়েছে তা বাংলাদেশে যৌতুক প্রথাকে তীব্রতর করেছে। এসব সম্পদশালী ব্যক্তিদের জামাই ক্রয়ের প্রতিযোগিতা যৌতুকের দাবিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে।

ঙ. বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরনির্ভরশীল জীবন যাপন করতে হয়। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে। এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও তাদের মতামতের কোন মূল্য দেয়া হচ্ছে না। পরনির্ভরশীল ও মর্যাদাহীন জীবনধারা যৌতুকের প্রবণতা সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক।

চ. অনুকরণপ্রিয়তা মানব চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। উচ্চ ও সম্পদশালীদের যৌতুক প্রদানের প্রবণতার অনুকরণে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণিতে যৌতুকের দাবি সম্পসারিত হচ্ছে।

ছ. দৈহিক খুঁত, অধিক বয়স, সৌন্দর্যের অভাব প্রভৃতি কারণে পিতা-মাতা প্রচুর যৌতুকের বিনিময়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হয়।

ঙ. যে সব পরিবারে কন্যা একমাত্র সন্তান অথবা পুত্র সন্তানের মধ্যে মাত্র একজন কন্যা সন্তান সে সব পরিবারে পিতামাতা ও ভাইদের আপন স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ বিপুল পরিমাণ যৌতুক প্রদানের মাধ্যমে কনের বিয়ে হয়।

চ. আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত ছেলে তার অভিভাবকদের নগদ প্রাপ্তির লোভ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হিসেবে যৌতুক প্রথাকে গণ্য করার ফলে এ হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য বরপক্ষের আর্থিক অসচ্ছলতাই দায়ী।

ঞ. স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবার প্রভৃতির মাধ্যমে রাতারাতি কালো টাকার মালিকানা লাভের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে যৌতুক। কালো টাকা যৌতুক প্রথা বিস্তারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। [৬৭]

মূলত আমাদের মত দারিদ্র্য-পীড়িত এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থাই যৌতুকের মূল উৎস। নারী সমাজের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা এবং অশিক্ষাই যৌতুকের মূল কারণ।

---

৬৭. মা. আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা: ১৯৯৯, পৃ. ১৫১

যৌতুকের বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশ সরকার নারী নির্যাতন রোধে বদ্ধপরিকর। তাই যৌতুক বন্ধের জন্য দেশে একাধিক আইন করা হয়েছে। যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০তে বলা হয়েছে যৌতুক প্রদান ও যৌতুক গ্রহণ দুই-ই দন্ডনীয় অপরাধ। এই আইনে কোনভাবে যৌতুক দাবি করা হলে ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও আর্থিক জরিমানা কিংবা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০০০ এ বিবাহ স্থির রাখার শর্তে অর্থ ও বিলাস-সামগ্রী বা অন্য কোন সম্পদ আদান-প্রদানকে আইনের আওতায় নেয়ার সংশোধনীতে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে জখম করলে ১-৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও আর্থিক দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে।[৬৮]

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অমানবিক যৌতুকের বিরুদ্ধে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৬৯]

ইসলাম ও পরিবার প্রথাঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা তার সহজাত প্রবৃত্তি। পরিবার হচ্ছে সমাজের একটি চিরন্তন ও শাশ্বত সংগঠন। মূলত পরিবারই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি এবং সমাজ গঠনের মৌল অংগ সংগঠন। এখান থেকেই মানব জাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপকাঠামোতে পরিবর্তন আসছে। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে এর বিধানগুলো প্রণীত হয়েছে। সে কারণেই পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইসলামের ধারণা খুবই সুস্পষ্ট। এর খুঁটিনাটি বিষয়াবলির আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সমাধান এখানে স্থান পেয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা "মানুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।"[৭০] নারী ও পুরুষকে দু'টি ধারায় সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানব সমাজ। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তীব্র ও প্রবল আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হলো তাদের প্রাকৃতিক দাবি। একজনের সান্নিধ্য অন্যজনের জন্য বৈধ পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের এই বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের। এর মাধ্যমে তাদের বংশধারায় সৃষ্টি হয়েছে বহু পরিবার, সৃষ্টি হয়েছে সমাজ। আর এ মিলন যদি হয় বাধাহীন পন্থায় তবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহ যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন, সেগুলোকে অনুশীলন করতে হলে মানুষ একা থাকতে পারে না। সঙ্গী ও সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সেজন্য মানুষকে বাধ্য হয়ে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে পরিবার গঠন করতে হয়। নারী-পুরুষের মাঝে বৈধ পন্থায় সম্পর্ক স্থাপনের নাম হচ্ছে বিয়ে। বিয়েই হচ্ছে একটি পরিবার গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

---

৬৮. আল-কুরআন, ৫১: ৪৯

৬৯. আল-কুরআন, ৪:২৯

৭০. আল-কুরআন, ৪:২৯

ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য:

ইসলামে বিবাহ হচ্ছে একটি পবিত্র বন্ধন এবং দেওয়ানী চুক্তি। এটি সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি, পারিবারিক জীবন সূচনার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ এবং নর-নারীকে নীতি বহির্ভূত ও নীতি বিগর্হিত সম্পর্ক হতে রক্ষা করার একটি কার্যকর উপায়। বিবাহের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং সন্তান-সন্ততির জন্মদানে বৈধতা নয়, বরং মানসিক শান্তি, সুখ ও আনন্দ এর উৎস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কোন মামুলি সম্পর্ক নয়। এটা কোন সাময়িক বা অস্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়; বরং বিয়ে হল একটি পবিত্র চুক্তি। যার সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষের যেমন স্বতন্ত্র সত্তা এবং তর নৈতিক জীবন স্বীকৃত, তেমনি নারীরও। আল্লাহর নামে শপথ করে পুরুষ তাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করে থাকে। আল-কুরআনে বিবাহকে 'মিছকাল গালিজান' (দৃঢ় প্রতিশ্রুতি) স্থায়ী বন্ধনরূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৭১]

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জীবন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট হতে শান্তি লাভ করতে পার এবং উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালবাসা, সহানুভূতি ও দয়ার।"[৭২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন: "তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি পায়।[৭৩]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর হয়, চোখের শীতলতা দান করে।"[৭৪]

বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে হাদীসে ধর্মভীরু ও সততার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "নারীকে চারটি গুণের জন্য সাধারণত বিয়ে করা হয়। তার অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারিতা। তুমি দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করে সফল হও।"[৭৫] রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন: "দুনিয়ার সবটাই সম্পদ। আর সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে সৎকর্মশীল নারী।"[৭৬]

---

৭১. আল-কুরআন, ৩০:২১
৭২. আল-কুরআন, ৭:১৮৯
৭৩. আল-কুরআন, ২৫:৭৪
৭৪. ইমাম আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব ইসলামিয়, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৪
৭৫. মুসলিম শরীফ, কিতাবুন নিকাহ্।
৭৬. ওলিউদ্দিন মুহাম্মাদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, বশির এ্যান্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২৬৮

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উপরোক্ত হাদিস দু'টির মর্মার্থ লঙ্ঘন করে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র যৌতুকের জন্য অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি নেই এমন মেয়েকে বিয়ে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বেকার ও গরীব যুবকদের বিয়ে করার এবং সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার আর্থিক সংগতি না থাকলেও যৌতুকের লোভে তারা বিবাহ করে থাকে এবং ভালো অংকের যৌতুক আদায়ের মাধ্যমে সংসারে সচ্ছলতা আনার প্রয়াস পায়, যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। কেননা প্রিয় নবী (স.) বলেছেন, "হে যুবকবৃন্দ, তোমাদের যে কেউ শক্তি সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিৎ। কেননা বিয়ে চোখকে বেশি নিচু রাখে এবং লজ্জাস্থানকে বেশি পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় তার রোযা রাখা কর্তব্য।"[৭৭]

ইসলামে মোহরানা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা:

ইসলামে পরিবার সমস্ত খরচ বহন এবং স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষ বা স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে। এমনকি স্ত্রী ধনবতী হলেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বও স্বামীর উপর ন্যস্ত। আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও অর্থ ব্যয়ের কারণে পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে (পুরুষকে) অপরের (নারীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে।"[৭৮]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলে করীম (স.) স্ত্রীদেরকে সুন্দর ও উপযুক্তভাবে খাদ্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লক্ষণীয় যে, ইসলাম স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এর দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে এবং উক্ত বিধান লঙ্ঘনপূর্বক বরপক্ষ বিয়ের সময় বা বিয়ের পরে কনের অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক দাবি করে। উদ্দেশ্য, সংসারে সচ্ছলতা আনা এবং নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা। অথচ ইসলামী বিধানে বিয়ের সময় একমাত্র যে আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন ওঠে তা হল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত দেনমোহর বা মোহরানা। পবিত্র কুরআনে যৌতুক দানের কোন কথা আদৌ বলা হয়নি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক শুধু স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন, বরকে কোন যৌতুক প্রদানের হুকুম করেননি।

মুসলিম পরিবারের পুরুষদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানের উপর ভরণ-পোষণ ছাড়াও বিয়ের জন্য আর্থিক সচ্ছলতা অপরিহার্য। কারণ স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা আদায় করতে হবে। মোহরবিহীন বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। মোহর বলা হয় সেই সম্পদকে যা বিয়ের সময় বর থেকে কনেকে বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হয়। সাধারণ কথায় ইসলামী নিয়ম অনুসারে মুসলিম পরিবারের বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনকালে নির্ধারিত এবং বর কর্তৃক স্বীকৃত ও কনেকে প্রদেয় অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমোহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৭৯] মুসলিম নারীর সামাজিক নিরাপত্তায় দেনমোহরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ধর্মীয় এ বিধানটিকে "মুসলিম

---

৭৭. আল-কুরআন., ৪:৩৪।

৭৮. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত সরকারী নিকাহনামা ফরমে মোহরকে দেনমোহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৯. দ্রষ্টব্যঃ The dissolution of Muslim Marriages Act. 1939 (VII of 1939); The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Viii of 1961); The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act. 1974 (LXII of 1974); The Family Court Ordinance, 1985 (XVIII of 1985).

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯", "মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১", "মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন ১৯৭৪", "পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫", ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে আইনগত বাধ্যবাধকতার কাঠামোগতরূপ প্রদান করা হয়েছে।[৮০]

সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অথচ সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান পরিবারের মূল যোগসূত্র বিয়ের অন্যতম ইসলামী শর্ত 'দেনমোহর'। মূল আরবি শব্দ 'মাহ্‌র,' যাকে হিব্রু ভাষায় 'মোহর' এবং সিরীয় ভাষায় মাহ্‌রা বলা হয়। মাহ্‌র এর বাংলা অর্থ বিয়েতে কন্যার প্রাপ্ত যৌতুক। এর অন্য অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব, উপহার বা চুক্তির মাধ্যমে নয় বরং স্বেচ্ছাকৃত দান, যা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ হিসেবে গণ্য।[৮১] মোহর প্রকৃত অর্থে একটি প্রাচীন আরবীয় সংস্কৃতি। পৌত্তলিক আরবে বিয়েতে দেনমোহরকে একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং দেনমোহর পরিশোধের পরই শুধু যথার্থ রীতিসিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হত। মোহরবিহীন বিবাহ বন্ধনকে খুবই জঘন্য এবং অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য করা হত; আরব্য রমণীরা একে মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করত এবং ঘৃণার সাথে এমন বিয়ে প্রত্যাখ্যান করত।[৮২]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে মোহর হিসেবে নির্ধারিত অর্থ-সম্পদ কনের অভিভাবক, অর্থাৎ পিতা, ভাই প্রমুখের হাতে প্রদান করা হত, যেহেতু মোহর ছিল বিনিময় মূল্য হিসেবে বিবেচিত। বিয়ে উপলক্ষে এ সময়ে কনে নিজে যা পেত তা ছিল সা'দাক, দেনমোহরের কোন অংশই তাকে দেয়া হতো না। তবে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সম্ভবত দেনমোহরের আংশিক কনেকে দেয়া শুরু হয়।[৮৩]

ইসলামী বিধান মোতাবিক মোহর স্বামীর পক্ষ হতে কনেকে প্রদানের সার্বজনীন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। দেনমোহর এবং সা'দাকের পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে বিনিময় মূল্য হিসেবে দেনমোহরের সনাতনী মূল বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তি ঘটেছে। ইসলাম ঐতিহ্যগত আরবীয় বিয়ে প্রথা বহাল রেখেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেছে। পবিত্র কুরআন স্ত্রীকে পণ্যসামগ্রী এবং দেনমোহরকে পণ্যের বিনিময় মূল্য হিসেবে গ্রহণ করেনি; বরং একে স্ত্রীর জন্য উপহার এবং একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে যা স্ত্রী প্রতিক্ষেত্রেই আদায় করতে পারবে।[৮৪] স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ স্বামীর উপর ইসলামী আইন দেনমোহর পরিশোধের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যা এতই গুরুত্ববহ যে, বিবাহের সময় নির্ধারিত না হলেও আইন পরবর্তীকালে তা নির্ধারণের ব্যবস্থা রেখেছে।[৮৫]

---

৮০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫০

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৬

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ

৮৩. Reubon Lay, Social Structure of Islam, Cambridge University Press, London-1979, p. 114.

৮৪. Encyclopedia of Islam, New edition, Leiden 1991, Vol iii, p. 137.

৮৫. গাজী শামসুর রহমান, পারিবারিক আদালত আইন, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকাঃ ১৯৯৮, পৃ. ৪৩-৪৪

আর যদি কেউ কোন দেনমোহর নির্ধারণ না করে কিংবা মোহর না দেওয়ার শর্ত নির্ধারণ করে কোন মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে সে মোহরে মিছাল পাবে যদি স্ত্রীর সাথে 'মিলন' হয়ে থাকে কিংবা স্ত্রী রেখে মারা যায়।[৮৬]

প্রকৃতপক্ষে, মোহর হল স্ত্রীর বিয়ের মর্যাদা স্বরূপ স্বামীর উপর ধর্ম তথা আইন আরোপিত একটি পবিত্র দায়িত্ব বা আমানত।[৮৭] ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ মোহরের বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন মুসলিম বিয়ে সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে এতটা গুরুত্বদান করেননি।

পবিত্র কুরআনে মোহর সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "এবং তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্টচিত্তে তাহারা কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।"[৮৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।"[৮৯]

অন্য আয়াতে এসেছে, "তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করিবে।"[৯০] মোহর যেহেতু স্ত্রীর সম্পত্তি, তাই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ঐ সম্পত্তি স্ত্রীর দখলেই থাকবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করিও না।'[৯১]

এমনকি পুরুষ যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তবু অবশ্যই তাকে অর্ধেক মোহর প্রদান করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথবা মাহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক।"[৯২]

---

৮৬. মোহরে মিছাল বলতে এমন মেয়ে লোকের মাহরকে বুঝানো হয়েছে, যে তার অনুরূপ এবং সে অনুরূপ মহিলাটি স্ত্রীর পিতার বংশীয় হতে হবে। আর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তুল্যতা বিবেচিত হবে: (ক) বয়স অর্থাৎ প্রচলিতভাবে যে বয়স গৃহীত; (খ) রূপ, সুতরাং পিতৃবংশীয় ঐ মহিলা সমতুল্য হবে যে রূপে ও রঙে তার সমকক্ষ; (স.) সম্পদ (ঘ) শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা, সভ্যতা-ভদ্রতা, সততা ইত্যাদি। (ঙ) স্থান ও কাল (চ) কুমারিত্ব।

৮৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, ইন্টারলাইন পাবলিশার্স, ঢাকা: ১৯৮৫, পৃ. ৪৩০

৮৮. আল-কুরআন, ৪:৪

৪০. আল-কুরআন, ৫ : ৫

৮৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৪

৯০ আল-কুরআন,৪:২০

৯১. আল-কুরআন, ২ : ২৩৭

৯২. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আলী আল বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, দারুল কুতুবুল ইসলামী, বৈরুত-লেবাননঃ ১৯৯৩, পৃ. ৩৯৩

স্ত্রীর স্বেচ্ছায় মোহর লাঘবকে ইসলাম অনুমোদন করলেও জোর করে মোহর কমিয়ে নেয়াকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম মোহরকে স্বামী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছে। মোহর নগদ অর্থ কিংবা সম্পত্তি আকারে হতে পারে। আবার মোহরের পরিমাণ স্তূপীকৃত স্বর্ণ হতে পারে। মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল দশ দিরহাম।[৯৩] প্রচলিত মুসলিম আইনে মোহর হচ্ছে স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর সম্মানার্থে আইন কর্তৃক আদিষ্ট কর্তব্য। তবে মোহর প্রকৃতার্থে শুধু বিনিময় মূল্য নয়। মোহর নির্ধারণ করা হবে এমন অর্থ বা সম্পত্তি যা আইনের নীতি বহির্ভূত হবে না।[৯৪] পাশাপাশি, মোহর হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহিলা বা কনের নিজস্ব সম্পত্তি বা প্রাপ্য। এটি কোন অবস্থাতেই কনের মা-বাবা বা অভিভাবক পাবে না। যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবে ক্রীতদাসীকে বিয়ে করলে তার মুক্তির জন্য বিধান ছিল।[৪৬] প্রায়োগিক দিক থেকে, স্বামী কর্তৃক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদকালীন স্ত্রীর নিরাপত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত মোহর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঢালস্বরূপ এবং সমাজে অন্যায় প্রতিরোধকারী। মোহরের পুরো অংশ আদায়ের পরই স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। কাজেই তালাকের আগেই তাকে মোহর আদায়ের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়। তবে একজন পুরষের পক্ষে যতটা কষ্টদায়ক একজন মহিলার বেলায় এই তালাক বিবাহ বিচ্ছেদ তার চেয়েও মর্মন্তুদ। তাই মোহরকে বলা যায় দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা স্বরূপ।

এক্ষেত্রে মোহরের অর্থ পুরোপুরি আদায় হলে নিরাপত্তা বাড়বে। স্ত্রী হিসেবে তিনি এ মোহর অর্থকরী কার্যক্রমে খাটাতে পারবেন অথবা গচ্ছিত রেখে নিজের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করতে পারবেন।[৯৫] ইসলামী আইনে দেনমোহরকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর দেনা বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে স্ত্রীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে এবং স্বামীর তালাকের উপর বাধা সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলিম স্বামী জানে যে তালাক দেয়া মাত্র স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহর দাবি করতে পারে। তাই তালাকের ব্যাপারে তাকে সবসময় সংযত থাকতে হয়।[৯৬] বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কাবিননামায় বৈবাহিক চুক্তিপত্র) যে পরিমাণ অর্থ উল্লেখ থাকে সে পরিমাণ অর্থ দেনমোহর সংক্রান্ত মামলায় দাবি করা যায়। এক্ষেত্রে বিবাদী কাবিননামায় লিখিত অর্থের পরিমাণ ঠিক নয় বলে অস্বীকার করলেও আদালত স্ত্রীর দাবি গ্রাহ্য করে থাকে। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারা বিবাদীকে বাঁধা প্রদান করে।[৯৭]

---

৯৩. হাবিবা খাতুন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,৩১ সংখ্যা,জুন ১৯৯৮, পৃ.৫১

৯৪. হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৯৫. শহীদ আখতার, নারী প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য, এসোসিয়েশন ফল সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা), ঢাকা: ১৯৮০, পৃ. ১০৬

৯৬. গাজী শামছুর রহমান, নারী প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য, এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা), ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১০৬

৯৭. Rafiqul Huda Chowdhury and Nulufer Rahman Ahmed, Female Status in Bangladesh, BIDS, 1980, P. 26.

মোহর বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামী আইন অনুসারে বিয়ের আগে, বিয়ের সময় এবং বিয়ের পরে মোহর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এমনকি বিয়ের পর পুনঃনির্ধারিত দেনমোহরের পরিমাণও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

মোহর মূলতঃ একটি বৈবাহিক চুক্তি। মোহর পরিশোধ না হওয়া বৈবাহিক চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর। তাই মোহর ব্যবস্থার সুষ্ঠু অনুশীলন সুনিশ্চিত করে নিজেদের পবিত্রতা ও সংহতি রক্ষা করা আজ আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। মোহরানা পরিশোধিত অংশ দিয়ে স্ত্রী ব্যবসা করতে পারে, তা হতে মুনাফা অর্জন করতে পারে বা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারে। বর্তমানে আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হওয়ায় মোহরানার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্যক অবগত না হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ করা হতে স্বামী বিরত থাকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার মোহরানা না পাওয়া পর্যন্ত যে স্বামীর সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি নিজের দখলে রাখতে পারে, ইসলামের এ বিধান জানে এমন নারীর সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল।

যৌতুক ও নবী করীম (স.):

বর্তমান কালের সমৃদ্ধশালী আরব রাষ্ট্রসমূহে বায়েনাহ নামে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। পাত্রের গৃহে কনে যে অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ে আসে তাকে বায়েনাহ বলে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ স. তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা.) এর সাথে তার মেয়ে ফাতিমা (রা.) কে বিয়ে প্রদানের সময় তাঁকে কিছু দ্রব্যসামগ্রি উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) নিজেই বলেছেন যে, রাসূলে করীম (স.) তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমার বিয়ের সময় পাড়ওয়ালা একটি শাড়ি/চাদর, একটি পাকা মাটির পানি রাখার পাত্র, সুগন্ধযুক্ত চামড়ার একটি বালিশ এবং আটা পেষার একটি যাতা উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, নবী করীম (স.) কিন্তু হযরত আলী (রা.) কে বিবাহের সময় কোন কিছুই উপহার হিসেবে দেননি। তিনি তাঁর মেয়েকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপহার সামগ্রি দেয়ায় অনেকে যৌতুক প্রদানকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাত হিসেবে গণ্য করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।[৯৮]

তবে এটিকে অবশ্যই পালনীয় সুন্নাত হিসেবে গণ্য করার আদৌ কোন সুযোগ নেই । কেননা, নবী করীম (স.) এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অন্যান্য বিয়েতে এ ধরণের কোন উপহার দেয়া হয়নি। এমনকি মুহাম্মাদ (স.) এর কোন সাহাবীও এ প্রথার উপর কোন গুরুত্ব দেয়নি। তবে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) স্বেচ্ছায় তাঁর কন্যা ফাতিমার বিবাহের সময় যে দ্রব্য সামগ্রী দিয়েছিলেন তাকে যৌতুক হিসেবে বিবেচনা করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। বিবাহের সময় প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ যৌতুক হিসেবে বিবেচনা করতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ করা অত্যাবশ্যক। প্রথমত, পাত্র পক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান এবং দ্বিতীয়ত বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত বা প্রতিদান হিসেবে তা প্রদান। যাহোক, দাবি করে যৌতুক নেয়ার প্রথা কুরআন, হাদীস বা ইসলামী পন্ডিতদের লেখায় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

---

৯৮. Quote in (Huda) Shahanaz æBow to be Wed Bengladeshi Women And the Muslim Marriage Contract”, and unpublished Phd thesiss 1996, P. 317.

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম যৌতুক প্রথা স্বীকার করে না এবং সেমত বিয়ের সময় যৌতুকের শর্ত আরোপ করা, বিয়ের পরে যৌতুক দাবি করা এবং যৌতুক আদায়ে ব্যর্থ হয়ে স্ত্রীর উপর নানা ধরণের নির্যাতন চালানো ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও যৌতুকের লোভে বিয়ে করা, এমনকি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর উপর ন্যস্ত করায় স্ত্রী-পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের নিকট হতে যৌতুক আদায় করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা ইসলামের বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিয়ের সময় একটি মাত্র শর্ত শরীয়াতসম্মত, আর তা হচ্ছে, মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য মোহরানা প্রদানের অঙ্গীকার।

যৌতুক সমস্যা নিরসনে করণীয়ঃ

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণও বটে। প্রকৃতপক্ষে যৌতুক প্রথা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে এটি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত। সে সমাজ প্রতিটি মানুষের কাজ, আশ্রয়, চিকিৎসা, নিরাপত্তা তথা বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারবে, সেই সমাজে যৌতুকপ্রথা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না। মেয়েরা পণ্য নয়; বিবাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম ও নয় এবং মেয়েরাও মানুষ, সমাজে তাদের সমমর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে-এরূপ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তেমন সমাজেই। আধা সামন্তবাদী ও আধা পুঁজিবাদী সমাজে সেটা আদৌ সম্ভব নয়। এটা মনে রেখে সচেতনভাবে জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমেই যৌতুক প্রথা দূরীকরণ সম্ভব। মেয়েদের মৌলিক অধিকারহীন বৈষম্যতাড়িত সমাজে যৌতুক প্রথা দূর করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ থেকে যৌতুক প্রথার ন্যায় নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও অমানবিক অভিশাপ উচ্ছেদের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

১. যৌতুক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম কাজ হওয়া প্রয়োজন যৌতুক দাবির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যৌতুক গ্রহণ যে সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ সেটি সবাইকে বুঝাতে হবে। যৌতুক দাবি ও গ্রহণকে নীচুতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে হবে।

২. কন্যার পিতামাতার প্রতি সমাজকে সংবেদনশীল হতে হবে। বয়োপ্রাপ্তির পর কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পিতা-মাতাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা না দিয়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৩. যৌতুক সমস্যা নিরসনে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কেননা, কর্মসংস্থানপ্রাপ্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌতুক স্বাভাবিকভাবেই কম হয়।

৪. মহিলাদের গৃহকর্মের অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। গৃহ শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে মহিলারা চাকুরি না করলেও তাদের শ্রমকে উৎপাদশীল বলে ধরে নেয়া হবে।

৫. সমাজে মহিলা ও পুরুষের বিয়ের বয়সসীমা সম্পর্কে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিকোণ না রেখে কিছুটা সমতা রক্ষায় সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

৬. যে পিতা তার নিজ পুত্রের জন্য যৌতুক দাবি করে তাকে নিজ কন্যার যৌতুক প্রদানে প্রস্তুত হতে হয়। অতএব, সচেতনভাবে যৌতুক পরিহার করার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

৭. অবিবাহিত যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ জাতীয়ভাবে নিতে হবে। আত্মনির্ভরশীলতা তাকে যৌতুক গ্রহণ হতে বিরত রাখবে।

৮. যৌতুক এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশের গণমাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৯. যৌতুকের নিন্দনীয় সমস্যা ও প্রতিকারের বিষয় নিয়ে জাতীয়, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সভা, সেমিনার, বিতর্ক, ওয়ার্কশপ, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে বাধ্যতামূলকভাবে যৌতুক সমস্যা ও প্রতিকারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১১. প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অঙ্গীকারে যৌতুক প্রতিরোধকল্পে শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের এগিয়ে আসতে হবে।

১২. সারাদেশে ইউনিয়ন বা মহল্লা পর্যায়ে, সরকারের সমাজকল্যাণ, যুব ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিবাহ সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। যে সংস্থার কাজ হবে বিবাহ করতে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি রেজিষ্ট্রি করা এবং সংস্থার উদ্যোগে যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া যৌতুকবিহীন বিয়ের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৩. ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ প্রচার।

১৪. নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

১৫. সর্বোপরি যৌতুক নিরোধ আইনকে আরো শক্তিশালী করে যৌতুক দাতা ও গ্রহীতাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল: ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার

ভেজালের স্বরূপ:

ভেজাল একটি বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দ। এর অর্থ হলো নিকৃষ্ট, খাঁটি নয় এমন নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ, গন্ডগোল, ঝামেলা, বিশৃঙ্খলা। নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত, কৃত্রিম, মেকি।[১] এর আরবি প্রতিশব্দ-মাগশূশ, মুঝাইয়্যাফ এবং গাশশাহ্।[২] ইংরেজিতে একে adulterant, contaminant, ipure, trouble, tangle, hitch, snag, spurious, corrupt[৩] প্রভৃতি শব্দে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিকৃষ্ট পদার্থ যা উৎকৃষ্ট পদার্থের সাথে মিশানো হয়। কিংবা নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত খাঁটি বা বিশুদ্ধ নয় এমন যে কোন বস্তুকে ভেজাল বলে।[৪] পবিত্র কুরআনে ভেজালের প্রতিশব্দ 'খাবাছাত' এবং এর বিপরীত শব্দ হিসেবে 'ত্বয়্যিবাত' এর উল্লেখ রয়েছে। অতএব, ভেজাল মানে অপবিত্র, নিকৃষ্ট খাবার-পানীয় যা অকল্যাণকর ও অস্বাস্থ্যকর।[৫] এ ভেজালের মহাসমারোহ চলছে বিশ্বব্যাপী নানা কৌশলে, মুখরোচক ও দৃষ্টিনন্দন পদ্ধতিতে, তবে বস্তুর তারতম্য ও স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানে ভেজালেরও বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে ভেজালের যে বিভৎস চিত্র ধরা পড়েছে, তা দেশবাসীকে একদিতে হতবাক করেছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হাজারো অজানা আশংকা। এসব ভেজালের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. খাদ্য-দ্রব্য:

ক. বিভিন্ন আড়তে সংরক্ষিত মৃত মুরগি, গরুর গোশত ও পঁচা ডিম। যা বিভিন্ন ধরণের ফাস্টফুড ও ঝাল জাতীয় খাদ্য-দ্রব্যে ব্যবহার করা হয়।

খ. হোটেল রেস্তোরায় সংরক্ষিত অনেক দিনের পঁচাবাসী খাবার পরিবেশন।

গ. ফরমালিন জাতীয় বিষাক্ত ক্যামিক্যাল মিশ্রিত মাছ সরবরাহ।

ঘ. নাপাক শুকরের চর্বি হতে প্রাপ্ত তেলে ভাজা মিষ্টিদ্রব্য যেমন-সেমাই।

ঙ. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কৃত্রিক উপায়ে পাকানো ও সংরক্ষিত ফলমূল ওশাক-সবজি।

চ. নির্ধারিত মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও গুড়ো দুধ সহ শিশুদের খাদ্যদ্রব্য।

ছ. নিম্নমান কিংবা ক্ষতিকারক উপকরণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরণের খাদ্য।

জ. সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে তৈরি খাবার।

ঝ. দুধের সাথে পানি মিশানো কিংবা পাউডার ও দুধের মিশ্রণ।

---

১. মোসলেম উদ্দিন, আধুনিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ জুন, ১৯৮৫, পৃ. ৬৩৯

২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, একবিংশতম মুদ্রণ,মে ১৯৯৭, পৃ. ৫৪৯

৩. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, বাংলা-ইংরেজি-আরবী অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৪১৩

৪. Editorial Board, Bengali English Dictionary (Dhaka : Bangla Academy, tenth reprint, April 1999, P. 621

৫. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

৬. মহান আল্লাহর বানী, "তিনি তাদের জন্য যাবতীয় তাইয়্যেবাত বা পবিত্র ও উৎকৃষ্টকে বৈধ করেন এবং খাবাইস তথা নাপাক নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন।" সূরা আরাফ: ১৭৫

২. পণ্য-দ্রব্যঃ

ক. নিম্নমানের উপাদানের তৈরি পণ্য-দ্রব্য।

খ. নিম্নমানের পণ্যদ্রব্য উচ্চমানের বলে চালানো, কিংবা অভ্যন্তরে নিম্নমানের পণ্য রেখে বহিঃর্ভাগে উত্তম পণ্য সাজানো।

গ. ওজনে কম-বেশি করা বা পরিমাণে হের-ফের করা।

ঘ. দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয়ের পূর্বে দুধ আটকিয়ে রাখা।

মোটকথা আমাদের খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীতে ভেজালমুক্ত বস্তু খুঁজে পাওয়া একান্তই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এভাবে ভেজালের সমারোহে আমরা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছি।[৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজালঃ

ইসলাম কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে মানুষের জন্য যা হিতকর নয়, অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট বস্তু, পণ্য বা বিষয় হতে বিরত থাকতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজাল পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, অবৈধ। নিম্নে ভেজাল সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলোঃ

ক. ভেজাল একটি জঘন্যতম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা

কোন কিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা সবসময় একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বিক্রেতাকে খোঁজে যাতে ক্রয়কৃত পণ্য সঠিক, গুণগত মান সংরক্ষিত এবং সাশ্রয়ী হয়। কিন্তু পণ্যে ভেজাল দেয়াটা বিক্রেতার প্রতি অবমাননা ও অবমূল্যায়নের শামিল। অতএব, এটি একটি বড় ধরণের প্রতারণা। এ মর্মে রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, "এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছুই নেই যে, তুমি এক ব্যক্তির সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেবে যে তোমাকে বিশ্বাস করে।"[৮]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, "যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৯] উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ভেজাল ব্যবসায়ী ইসলামী আদর্শের গন্ডি বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে।

খ. ভেজাল এক প্রকার ঘাতকঃ

পণ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতার ফলে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অস্বাস্থ্যকর ও বিভিন্ন রোগের নিয়ামক শক্তিরূপে পরিণত হয়। ফলে এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্য মানুষ দংশিত হয়ে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে। খাবার হতেই মানুষের ব্লাড বা রক্ত তৈরি হয় এবং তা হতেই সব রোগের উৎপত্তি ঘটে। অতএব, এটা ত্রুটিমুক্ত ও ভেজালমুক্ত না হলে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে তিলে

---

৭. ভেজাল বিরোধী অভিযান চলাকালীন সময়কার পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সচিত্র প্রতিবেদন।

৮. ইমাম আবু দাউদ, সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল আদাব। বাবুল ফিল মাআরীদ বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৫, হাদীস নং ৪৯৭১। তবে হাদিসটি দুর্বল।

৯. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, কায়রো : দারুল হাদীস, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৯৯৮, হাদীস নং ১৬৪

তিলে নিঃশেষিত হয়ে যাবে আমাদের আগামী প্রজন্ম। পবিত্র কুরআন এ ধরণের গুপ্ত হত্যাকে সর্বাধিক জঘন্যতম অন্যায় ও অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে, "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা, হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল।"[১০]

গ. ভেজাল মানবতা বিধ্বংসী জঘন্য অপরাধঃ

মানবিক সত্ত্বা মানুষের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বা। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের মাঝে রয়েছে এক সুদৃঢ় বন্ধন, যা অভিন্ন দেহসত্ত্বার রূপ পরিগ্রহ করে।[১১] অতএব একজন ব্যক্তি যখন তার দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা ও কষ্ট অনুভব হওয়াকে কামনা করে না, তেমনি ভেজাল খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য পরিবেশনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতিসাধন মানবতা বিরোধী জঘন্য অন্যায়। এতে শুধু ব্যক্তি অপরের ক্ষতিতে সচেষ্ট হয় না, বরং নিজেও অন্যের ভেজালে আচ্ছাদিত হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয় । কেননা, সে তো এ সমাজেরই একজন সদস্য। অথচ আল্লাহ এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।"[১২] তাছাড়া মহান আল্লাহর রীতি হলো, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।"[১৩] এ মর্মে হাদীসে এসেছে, "নিজের কিংবা অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।"[১৪]

ঘ. ভেজাল মিশ্রিত ব্যবসা জুলুমের নামান্তরঃ

যে সব বিক্রেতা পণ্যে ভেজাল দেন তারা তাদের এই ভেজাল দ্রব্যকে ঠিক নির্ভেজাল পণ্যের ন্যায় সমমূল্যেই বিক্রি করতে চেষ্টা করেন। এতে ক্রেতাসাধারণ এক ধরণের জুলুমের শিকার হন।এছাড়াও এ ধরণের লেন-দেনে শঠতা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির সম্ভাবনা থাকে। ফলে এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের এক অপকৌশল। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না।"[১৫]

ঙ. ভেজাল ইসলামী নৈতিকতাকে গলা টিপে হত্যা করেঃ

মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিতে দুটি সত্ত্বার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। একটি হলো নৈতিক সত্ত্বা, অপরটি পাশবিক সত্ত্বা। পাশবিক সত্ত্বার প্রাধান্য মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। অপরদিকে, নৈতিক সত্ত্বা মানুষকে প্রকৃত মানবে পরিণত করে। খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিতকারী নৈতিক গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আত্মস্বার্থ চিন্তা, অর্থলিপ্সা ও নোংরা

---

১০. আল-কুরআন, ৫: ৩২
১১. সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ২৩৪০
১২. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
১৩. আল-কুরআন, ৪০ : ৪২
১৪. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াযীদ আল-কাযউঈনী, সুনান ইবনু মাজাহ্, তাহকীক-মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, তা. বি. হাদীস নং ২৩৪০)
১৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯।

মন-মানসিকতা তার নীতিবোধ ও বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা 'মুনাফাখোরী'[১৬] ও পুঁজিবাদী'[১৭] অর্থ ব্যবস্থার আবর্তে ঘুর্ণায়মান থাকে। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এবং মানুষের কাছে সে একজন প্রতারক, ঘাতক ও জালেম হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা

তাকওয়ার লালন:

একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসাক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার স্মরণে ব্রতী হতে হবে। কেননা, ব্যবসা হলো জীবিকা অর্জনের একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এক্ষেত্রে সর্বদা আল্লাহ-ভীতি অন্তরে পোষতে হবে। যখনই কোন ব্যক্তির মাঝে এ ধরণের ধারণা লালিত হতে থাকে, তখন তার যাবতীয় কাজ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তথা শরীয়াত অনুযায়ী হতে বাধ্য। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুসহ সকল সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। প্রতিটি কথা কর্মের জন্য তাঁর নিকট হিসাব দিতে হবে। অতএব, কোন ব্যক্তিই তখন আর তাঁর অবাধ্য হতে পারে না। কোন ব্যক্তির সাথে অসৎ লেন-দেন ও প্রতারণা করতে পারে না। ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরে এ ধরণের চিন্তার বীজ বপন করে থাকে আর এরই নাম তাকওয়া। এভাবে ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রহরী হয়ে যায়। এ মর্মে কুরআনুল কারীমে এসেছে, "তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।"[১৮] আরেক জায়গাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।"[১৯]

আখেরাতে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া:

প্রত্যেক মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে। একটি ইহকালীন, অপরটি পরকালীন। ভেজাল ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে, ভেজালের মাধ্যমে দুনিয়াতে পার পাওয়া গেলেও পরকালে তার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। কেননা, আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।[২০]

---

১৬. এটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (মুনাফা + খোর < খোরী)। মুনাফা শব্দটি আরবি 'মানফাআ' থেকে বাংলাতে স্থান করে নিয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে লাভ বা লভ্যাংশ। আর 'খোর' বা 'খোরী' শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। যার অর্থ সাধারণত নিন্দার্থে যে খায় বা ভোগ করে। যেমন, সুদখোর, ঘুষখোর। অতএব, প্রচলিত অর্থে: ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে যে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে তাকে মুনাফাখোর বলে। আর এ ধরণের কাজ করাকে বলা হয় মুনাফাখোরী। দ্রষ্টব্য : সহজ বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫) পৃ. ৩৩২।

১৭. পুঁজিবাদের আরবি প্রতিশব্দ র-সমালিয়্যাহ। ব্যক্তি মালিকানাধীন সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবৈধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছেমত সম্পদ উপার্জন ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।

১৮. আল-কুরআন- ৫৭ : ৪

১৯. আল-কুরআন- ৪০: ১৯

২০. আল-কুরআন-৫৭ : ৪

রাসূল (স.) বলেছেন, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব ও গরীব? সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, "আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই।" তিনি বললেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি সে হবে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত সহ হাজির হবে। কিন্তু সে হয় কোন ব্যক্তিকে গালি দিয়েছে, কারোর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারোর মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে বা কাউকে মার-ধর করেছে। এসব লোককে সে তার নেক আমল থেকে পাওনা দিয়ে দিবে। উল্লিখিত অন্যায়জনিত ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে তার নেক আমল সব ফুরিয়ে গেলে এসব পাওনাদারদের গুণাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২১] অপর এক হাদীসে এসেছে, "কিয়ামতের দিন বনী আদমের পা একটুও নড়বে না যতক্ষণে না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। তার জিন্দেগী সম্পর্কে কিভাবে শেষ করেছে, তার যৌবন সম্বন্ধে–কিভাবে সে কাটিয়েছে।তার সম্পদ কোন্ পথে আয় করেছে এবং কোন্ পথে খরচ করেছে, যতটুকু জ্ঞান সে অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটা আমল সে করেছে সে বিষয়ে।"[২২] যারা দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন ধোকাবাজি, প্রতারণা ও অমানবিক কার্যাবলির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অঢেল সম্পদ ও অট্টালিকার মালিক হবে তাদের বাসস্থান নিছক জাহান্নাম। একজন ব্যবসায়ীর মনে সদা এ বিষয়ে অনুভূতি জাগ্রত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি সীমালজ্ঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।"[২৩]

ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ:

ইসলাম ব্যবসাকে হালাল করেছে এবং সুদকে হারাম করেছে। পেশা হিসেবে ব্যবসা করার ব্যাপারে ইসলাম মানব জাতিকে বরাবরই উৎসাহিত করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের ধারক ও বাহক হযরত মুহাম্মাদ স. একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে তার যে দূরদর্শিতা ছিল সে বিষয়ে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর জ্ঞাত হওয়া ও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো আবশ্যক। ইসলামে ব্যবসার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব জীবনে ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়াই নয়, বরং পরকালীন জীবনের সফলতাও এর অন্যতম লক্ষ্য। এজন্যেই পবিত্র কুরআনে বারবার হুশিয়ার উচ্চারণ করা হয়েছে, যেন পারস্পরিক লেনদেনের এ উত্তম অবলম্বনটিকে কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণে কলুষিত করতে না পারে, এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তবে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুবই দয়াশীল।"[২৪] আল্লাহ তাআলা অন্যত্র

২১. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৮১

২২. ইমাম তিরমিযী, সুনান আত তিরমিযী, হাদীস নং-২৪১৬

২৩. আল-কুরআন-৭৯ : ৩৭-৩৯

২৪. আল-কুরআন-৪ :২৯

ঘোষণা করেছেন, "কিন্তু যারা কুফরী করে, তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মত উদরপূর্তি করে; আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।"[২৫]

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের যে নির্দেশনা রয়েছে তাতে, ধোকাবাজি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা শপথ, শঠতা, অবৈধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, ভাল ও খারাপ পণ্যের মিশ্রণ তথা অনৈতিকতা সম্পন্ন কার্যাবলির কোন স্থান নেই। তাছাড়া অবৈধ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে কেউ প্রতারণা, ধোঁকাবাজি কিবা অমানবিক কোন উপায়-উপকরণের আশ্রয় নেয়ার বিষয়ে সবিশেষ ভীতি প্রদর্শন করেছে। মূলত সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতা এ তিনের সমন্বয়ে ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। অতএব, ব্যবসায়ীদেরকে সেসব নীতিমালা ও বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

সৎ ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণঃ

ইসলাম মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রাণি হিসেবে প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণ করেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অধিকার হিসেবে খ্যাত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার পাথেয় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ইবাদতসমূহ পালনের পর যমীনে জীবিকার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে, "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২৬]

অত্র আয়াতে নামাজ আদায়ের পর ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনাদি পূরণে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রিযিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমাতেও নির্দেশ রয়েছে। এমনকি এটাকে জিহাদের মত সুমহান ইবাদতের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে।[২৭]

যাতে প্রতিটি মুসলমান শ্রম, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে গভীর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে পারে।

জীবিকা নির্বাহের উত্তম ও অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, তবে এটি অবশ্যই সৎ উপায়ে ইসলামী পন্থায় হতে হবে। এ মর্মে রাসূল (স.) এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "হযরত রাফে ইবন্ খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞেস

---

২৫. আল-কুরআন- ৪৭ : ১২

২৬. আল-কুরআন- ৬২ : ১০

২৭. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০; এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন্ কাসীর বলেন, "যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রিযিক উপার্জনের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অন্বেষায় পৃথিবীতে ভ্রমণরত।" দ্রষ্টব্য : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরায়শী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক : সামী ইবন্ মুহাম্মাদ সাল্লামা (দারু তাইব লিন্নাশরি ওয়াত্ তাওযী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮/ ২৫৮)

করা হয়েছিল, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, "ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্ধ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়।"[২৮]

ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যবসায়ীর সুউচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবী করীম স. ঘোষণা করেন, "সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দিকীন ও আল্লাহর পথে জীবন বিসর্জনকারী শহীদদের সঙ্গী হবে।"[২৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসা করা সুন্নাত ও সৎকর্মের অন্তর্ভূক্ত একটি মহৎ কাজ। তাছাড়া যেসব ব্যবসায় জুলুম, ওজনে ভেজাল, ধোঁকাবাজি, মুনাফাখোরি, মজুতদারি ও কালোবাজারি রয়েছে সেসব ব্যবসা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ, নৃত্য ও যৌন শিল্প, মদ ও মদজাত পণ্য, গান-বাদ্য, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃত্তি নির্মাণ শিল্প, ওজনে কম-বেশি করা, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে বিক্রি করা, মিথ্যা শপথ করে বিক্রি করা, জুয়া, লটারী, যাদু, জ্যোতিষ গণনা, মদ ও শুকর প্রভৃতির ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেছে।[৩০] শুধু তাই নয়, এসব ব্যবসায়ীদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কেও কুরআন ও সুন্নাতে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী স. হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনের প্রতি উৎসাহদান এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন যে আদেশ তিনি রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে রাসূলগণ, আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করুন; আপনারা যা করেন সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত।"[৩১] আরও বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছি।" অতঃপর রাসূল স. এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলিধূসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে: "হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু, অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?"[৩২] অসৎ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে তিনি বলেন, "যে ব্যবসায়ী লোকেরা, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপীরূপে হাজির হবে। তবে তারা নয় যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করবে।"[৩৩]

---

২৮. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, খ. পৃ. ১৪১

২৯. ইমাম তিরমিযী, জামে আত্ তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৯। তবে আল্লামা আলবানী এটাকে যয়ীফ বলেছেন।

৩০. ইমাম যাহাবী, কিতাবুল কাবাইর, (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্, তা. বি. সংস্করণ) পৃ. ১০২

৩১. আল-কুরআন-২৩ : ৫১

৩২. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ১০১৫

৩৩. ইমাম তিরমিযী, জামে আত্ তিরমিযী, হাদীস নং ১২১০। তবে হাদীসটি দুর্বল।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা:

ব্যবসায়ীগণ ও ক্রেতাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো তারা একে অপরের ভাই। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণন ও সরবরাহ করে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের মহান উদ্যোগ। যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই একটি অংশ। আর এসবের মূলে রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা। একজন ভাই যেমন অপর ভাইয়ের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না, তদ্রূপ ব্যবসায়ীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারলে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত হবে।

উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে লেন-দেন পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এটিই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বৈধ উপায়। রাসূল (স.) বলেন, "সন্তুষ্ট চিত্তে না দিলে কোন মুসলমানের সম্পদ কারো জন্য হালাল হতে পারে না।"[৩৪] পবিত্র কুরআনে এসেছে, "কেবলমাত্র পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।"[৩৫]

ক্রয়-বিক্রয়ে অসত্য ও মিথ্যা শপথের আশ্রয় না নেয়া:

মিথ্যা বলা সাধারণত এক জঘন্য অপরাধ। তদুপরি পণ্য প্রসারে মিথ্যা শপথ অবলম্বন আরো মারাত্মক অন্যায়। ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের পণ্য ক্রেতাসাধারণের হাতে তুলে দেয়ার একটি অন্যতম কৌশল। আর এ ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাসমূহ, রেডিও ও টেলিভিশন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কে কত শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারবে তার চলছে রীতিমত প্রতিযোগিতা। আর সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানানোর ক্ষেত্রে বড়ই পটু। এ জাতীয় মিথ্যুক ও ভেজাল ব্যবসায়ীদেরকে কুরআনে কঠিক শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।[৩৬] তদুপরি রাসূল (স.) মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পণ্য বাজারজাত করা থেকে সতর্ক করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, " ওয়ালিসা ইবন্ আল আশকা বলেন, আমরা যখন ব্যবসা করতাম, রাসূল (স.) তখন আমাদের কাছে এসে বলতেন, "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাচার সম্পর্কে সতর্ক থাক।"[৩৭] আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, "তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" তিনি তিনবার একথাটি বললেন। আমি বললাম, "নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা। কিন্তু তারা কারা হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।"[৩৮]

---

৩৪. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ ইবন্ হাম্বল, খ. ৫, পৃ. ৭৩। হাদীসটি দুর্বল।

৩৫. আল-কুরআন ঃ ৪ : ২৯।

৩৬. মহান আল্লাহ বলেন," যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (আল-কুরআন-৩ :৭৭)। এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে সহীহ বুখারিতে এসেছে: "এক ব্যক্তি বাজারে তার পণ্য বিছিয়ে একজন মুসলমানকে প্রতারিত করার জন্য বলতে থাকে: আল্লাহর শপথ, আমি যে মূল্যে দিয়েছি, সে মূল্যে আমি কিনতে পারিনি।" তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ইমাম বুখারী, সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ১৯৮২)।

৩৭. ইমাম তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ১৩২।

৩৮. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ১০৬।

অপর হাদীসে এসেছে, আব্দুর রহমান বিন শিবল বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ।" তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা কি ব্যবসাকে হালাল করেননি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তারা কথা বললে মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা শপথ করে ও গুনাহ্গার হয়।"[৩৯] মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়ে অভ্যস্ত ব্যবসায়ীগণ শুধুমাত্র পারলৌকিক জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং দুনিয়ার জীবনে তাদের এসব উপায় অবলম্বনে যে ব্যবসা হয় তার অশুভ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

এ মর্মে রাসূল (স.) এর একটি বাণী উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।"[৪০] এছাড়াও এ ধরণের ব্যবসায়ীর উপর সর্বদা আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়ে থাকেন। উপার্জনে বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া তাদের শ্রম পন্ড হওয়ারই অর্থ বহন করে। অতএব এ ধরণের গর্হিত কাজ থেকে ব্যবসায়ীদের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা:

পণ্য দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। বিক্রেতাকে অবশ্যই পণ্যের দোষ-ক্রুটি ক্রেতার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এতে বরকত হাসিল হয়। পক্ষান্তরে তারা যদি তা গোপন করে ও মিথ্যা কথা বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত তুলে নেয়া হয়। কোন মুসলমানের জন্য এ ধরণের দোষ গোপন করা সমীচীন নয়। রাসূল স. বলেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। এটা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এমন কোন বস্তু বিক্রয় করবে যাতে কোন ক্রুটি আছে, অথচ সে তা প্রকাশ করবে না।"[৪১]

এ ধরণের জঘন্য কাজ কোন মুসলমানতো দূরের কথা, মানুষ নামের কেউই তা করতে পারে না। এ মর্মে উকবা ইবন্ আমের বলেন, "জেনে-শুনে কোন ক্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রি করা কোন ব্যক্তির জন্যই বৈধ হতে পারে না। যতক্ষণ না এ ব্যাপারে ক্রেতাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়।"[৪২]

দ্রব্যমূল্য নিয়ে কোনরূপ ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করা:

ইসলাম পণ্যদ্রব্যকে তার যথাযথ মালিকের নিকট সোপর্দ করতে বদ্ধ পরিকর। সেক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার সুযোগ সন্ধানি ও শোষণের অবকাশ না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে ইসলাম। কারণ, যদি এমনটি হয়, তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এগুলো প্রতারণারও অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে ইসলাম প্রতারণার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির যাবতীয় পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করেছে। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে —

---

৩৯. মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪২৮

৪০. ইমাম বুখারী , সহীহ বুখারী , হাদীস নং ১৩০৩।

৪১. সুনানু ইবন্ মাজাহ্, হাদীস নং-২২৪৬।

৪২. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাবু ইযা বাইয়ানাল বা'য়িয়ানি ওয়ালাম ইয়াকতুমা ওয়া নাসাহা।

ক. মজুতদারি:

ইসলামের পরিভাষায় মজুতদারিকে 'ইহতিকার' বলা হয়। ইমাম ইবন্ তাইমিয়াহ্ (রহ.) মজুতদার এর সংজ্ঞায় বলেছেন, "মজুতদার সে ব্যক্তি যে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে তার মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আটক রাখে এবং সে এ কাজে ক্রেতাদের প্রতি জুলুম করে।"[৪৩] ইসলামের দৃষ্টিতে মজুতদারি জঘন্য অপরাধ। বিশ্বনবী (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখল, সে আল্লাহ হতে মুক্ত হয়ে গেল এবং আল্লাহ ও তার থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।"[৪৪] মজুতদারের ঘৃণ্য মানসিকতা স্পষ্ট করে মহানবী (স.) বলেন, "নিকৃষ্ট মানুষ হলো মজুতদার। মূল্যহ্রাসের সংবাদ পেলে তার খারাপ লাগে, আর মূল্য চড়া হলে আনন্দিত হয়।"[৪৫] অন্য হাদীসে এসেছে, "সরবরাহকারী রিযিকপ্রাপ্ত হয় আর মজুতদার হয় অভিশপ্ত।"[৪৬]

খ. তালাক্কী:

গ্রাম-গঞ্জ হতে কৃষকরা সামগ্রী নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার আগেই তাদের থেকে পাইকারীভাবে সব সামগ্রী খরিদ করে নেয়াকে 'তালাক্কী' বলে। গ্রামের কৃষকরা এতে প্রতারিত হতে পারে এবং যথাযথ মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বাজার প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা ব্যাহত যেন না হয় এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় যেন বাজার দাম নিয়ন্ত্রিত না হয়, সে লক্ষ্যে মহানবী (স.) তালাক্কীকে নিষেধ করেছেন।[৪৭]

গ. দালালি বা নাজাশ:

প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে অধিক মুনাফা লাভের নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের উচ্চ মূল্য হাকানোকে নাজাশ বা দালালি বলে।[৪৮]এটি এক ধরণের প্রতারণা। এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। তাই ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লামা তাকী ওসমানী এর সংজ্ঞায় বলেন, "কোন ব্যক্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অপরকে প্রতারিত করার জন্য এবং অধিক মূল্যে ক্রয়ে প্ররোচিত করার নিমিত্তে গ্রাহক সেজে চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করাকে নাজাশ বলে।"[৪৯]

---

৪৩. ইমাম আহমাদ আব্দুল হালীম ইবন্ তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, (মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হিজরী-১৯৯৫ খ্রি.) খ. ২৮, পৃ. ৭৫

৪৪. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, খ. পৃ. ৩৩ (শুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।)

৪৫. ইমাম বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ সায়ীদ যাগলূল, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি. খ. পৃ. ৫২৫, হাদীস নং-১১২১৫)

৪৬. ইমাম আব্দুর রাযযাক আস সানআনী, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, সম্পাদনা: হাবীবুর রহমান আল আযামী, বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী, খ. ৮ পৃ. ২০৪

৪৭. মানছুর বিন ইউনুছ আল-বাহুতী, কাশফুল কিনা আন মানতিল ইকনা, বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি. খ. ৩ পৃ. ১৮৭

৪৮. দালালি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ brokery, brokerage এবং আরবিতে একে 'ছামারাহ্, উমূলাহ্, 'আসসামসার' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্র. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, তিন ভাষায় পকেট অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনা, ২০০১, পৃ. ১৯৩)। কোন ব্যক্তি স্বীয় আচরণ ও কারসাজির মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ে যদি কোন মধ্যস্থতা করে, যার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটে, তখন তাকে দালালি বলে।

৪৯. আল্লামা তাকী ওছমানী, তাকমালাতু ফতহিল মুলহিম, করাচি: দারুল উলূম, ১৯৯২, খ. ১. পৃ. ৩৩০

নবী করীম (স.) এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। এটাকে তিনি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, "রাসূল (স.) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।"[৫০] প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা বলেন, "দালাল ব্যক্তি সুদখোর, বিশ্বাসঘাতক।"[৫১] অপর এক হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন কোন ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের দর কষাকষির সময়ে দর করতে।"[৫২]

বিক্রেতা ও ভোক্তাদের মাঝে দালাল বা middle man এর অনুপ্রবেশের কারণে দ্রব্যের দাম কিছুটা বেড়ে যায়। এ কারণে রাসূল (স.) এটাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটালে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আগুনের হাড়ের উপর তাকে বসিয়ে শাস্তি দিবেন।"[৫৩]

(ঘ) নকল পণ্য ও ভাল পণ্যের মিশ্রণ:

অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য নকল অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একদা একটি খাদ্য স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপটির মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর হাত ভিজে গেল। রাসূল (স.) বিক্রেতাকে বললেন, "এটা কী?" সে বলল, এগুলোকে বৃষ্টিতে পেয়েছিল। রাসূল (স.) বললেন, তুমি কেন ভাজা অংশকে বাহিরে রাখছ না যাতে লোকেরা তা দেখতে পারে। জেনে রাখ, যারা প্রতারণা করে তারা আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৫৪]

বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ:

ইসলাম মানুষকে হালাল উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সব ধরণের অসততা, পণ্য দ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা রোধকল্পে 'আল-হিসবা'[৫৫] ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যে বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকে 'অলিউল হিসবাহ্' বলা হয়।

---

৫০. ইমাম বুখারী, সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-১৫১৫।

৫১. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫. পৃ. ২৭

৫২. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৫১৫।

৫৩. ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫. পৃ. ২৭

৫৪. ইমাম তিরমিযী, জামে আত্ তিরমিযী, হাদীস নং-১৩১৫।

৫৫. আল-হিসবা' একটি আরবি শব্দ। পরিভাষায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বাধাদান এ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ। এ দায়িত্বের নির্বাহী প্রধানকে 'মুহতাসিব' বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দান করেন। ড. আবুল ওয়াফা মোহাম্মাদ আবুল ওয়াফা, আল তাতাউরুল তারিখী লিহিমায়াতিল মালিল আম, সূত্র তারিখিল ইকতিসাদ লিল মুসলেমীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম রাসূল (স.) বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি (স.) সায়ীদ বিন আল-আসবিন উমাইয়্যাহ্কে মক্কার বাজার দেখাশুনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।[৫৬] শুধু তাই নয়, স্বয়ং রাসূল (স.) ও এ দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি (স.) বাজারে যেতেন এবং খাদ্যদ্রব্য পর্যবেক্ষণ করতেন।[৫৭]

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে খুলাফায়ে রাশেদীন এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা.) নিজেই বাজারে ঘুরে বেড়াতেন এবং এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়িক তৎপরতা রোধে ভূমিকা রাখতেন। এমনকি তিনি নিজে গিয়ে তাদের শাস্তিস্বরূপ প্রহার করতেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাদেরকে গাধায় চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে আনতেন এবং সাবধান করে দিতেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন ওতবাহকে বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।[৫৮]

ইসলামী দন্ডবিধির প্রয়োগঃ

ইসলাম সহনশীল ও মানবতার ধর্ম। এটা মানুষকে সর্বপ্রথম নৈতিকভাবে উজ্জীবিত করে। যাতে সে আপন ইচ্ছায় অন্যায় অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তবে একথা সত্য যে, উপদেশ-নসীহত সকলের জন্য সবসময় ফলপ্রসূ হয় না। তাই প্রয়োজনে ইসলাম অপরাধ নির্মূলের জন্য শাস্তি বিধান রেখেছে।এক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.) এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শাসনদন্ড দিয়ে মহান আল্লাহ এমন লোকদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেন, কুরআনের উপদেশ-নসীহাত যাদের জন্য ফলপ্রসূ হয় না।"

ইসলাম শাস্তিযোগ্য অপরাধ সমূহের তিন ধরণের শাস্তির বিধান রেখেছে। (১) হুদুদ (২) কিসাস (৩) তাযীর।[৫৯]

---

৫৬. আশ-শাহওয়ী, আল-হিসবাব্ ফিল ইসলাম, দারুল উরুবাহ্ প্রকাশনী, পৃ.১৭

৫৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১০১।

৫৮. আশ-শাহ্ওয়ী, প্রাগুক্ত।

৫৯. (১) হুদুদঃ যে অপরাধের বিধান সরাসরি কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে এবং যা আল্লাহ্র হকের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই হুদুদ। যেমন-ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, চুরি, পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি, ধর্মত্যাগ ও মদ পান ইত্যাদি।

(২) কিসাসঃ যে সব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়াতের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কিসাস'। যথাঃ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ও জখমের বিনিময়ে জখম করা।

(৩) তাযীরঃ যে সব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নায় নির্ধারণ করা হয়নি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, এসব শাস্তিকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'তাযীর' বলে। এটি কথা দ্বারা হতে পারে, আবার কর্ম দ্বারাও হতে পারে। যেমন, ধমক দেয়া, ভর্ৎসনা করা, নসীহত করা, বেত্রাঘাত করা, শারীরিক অন্য কোন শাস্তি, বন্দী করে রাখা, নির্বাসন দেয়া, চাকুরি হতে অব্যাহতি দেয়া, জরিমানা ইত্যাদি।

যেহেতু পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল এক প্রকার প্রতারণামূলক ও মানব বিধ্বংসী অপরাধ, সেহেতু এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। যাতে এ অপরাধ নির্মূল সহজসাধ্য হয়। এটি মূলত তাযীর জাতীয় একটি অপরাধ। অতএব, ভেজালের পরিমাণ, আকৃতি-প্রকৃতি, পরিমাপের ভয়াবহতা ও অন্যান্য পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে ভেজাল প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। যে সব ভেজাল দুরারোগ্য ব্যধি সৃষ্টি করে মানুষকে ক্রমশ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড নির্ধারণ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যার ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য ও সাধারণ তার জন্য সাধারণ পর্যায়ের শাস্তি যেমন, বেত্রাঘাত, জেল ও জরিমানা দেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি দায়িত্বশীলদের কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করলে কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

প্রস্তাবনা:

ভেজাল একটি প্রতারণামূলক ও ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতি যা পণ্য দ্রব্যের গুণগতমান ধক্ষংসের প্রয়াস চালায়। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এটি মানুষের জীবন নাশের হুমকিতেও পরিণত হতে পারে। আজ আমাদের দেশের সর্বত্রই ভেজালের ছড়াছড়ি চলছে। ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে মানবতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ইসলামী নৈতিকতার লালনের মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করা সম্ভব। তদুপরি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা নিশ্চিত করতে পারলে ভেজাল প্রতিরোধ সম্ভব বলে আশা করা যায়।

ক. ভেজাল বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান দান ও উপলব্ধিতে নিয়ে এসে তাদেরকে সচেতন করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তাদের চিহ্নত করে সামাজিকভাবে বয়কটের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল স. বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে (শাস্তি প্রয়োগ করে) বাধা দেয়। এ ক্ষমতা যদি তার না থাকে তাহলে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে (জনমত গঠন করে) তা বন্ধের প্রয়াস চালাবে। আর এ ক্ষমতাও যদি না থাকে, তবে সে অন্তরে এ কর্মকে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ইমানদারের পরিচয়।"[৬০]

খ. ব্যবসায়ীদের মাঝে ইসলামী নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা। এজন্য সরকারীভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মাধ্যমে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এছাড়া মসজিদের ইমাম সাহেবগণকে এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দান।

গ. ব্যবসায়ী লাইসেন্স প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা। কোন অসাধু ব্যবসায়ী যেন লাইসেন্স না পায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া অর্থাৎ অসাধু প্রমাণিত হলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা।

ঘ. পণ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিরীক্ষার জন্য সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মনিটরিং সেল গঠন করা এবং সরকারের কাছে তাদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

ঙ. ভেজাল নিরূপনের জন্য সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করা। উন্নত বিশ্বে সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ভেজাল নিরূপনের যে নিত্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে তা আমদানি করে আমাদের দেশে চালু করা।

---

৬০. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯

চ. ভেজাল প্রমাণে শাস্তিস্বরূপ ইসলামী দন্ডবিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশুদ্ধ খাদ্য সংশোধন বিল-২০০৫ এর সাথে ইসলামী শরীআহ্ নীতির সংযোজন একান্ত আবশ্যক।

ছ. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তদারক ও পর্যবেক্ষণ কমিটির গঠন করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ও খাদ্য দ্রব্যের গুদামজাত রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা।

জ. যেহেতু ভেজাল একটি বড় ধরনের প্রতারণা, যাতে খরিদ্দারকে ধোঁকায় ফেলে বেশি মুনাফা লাভ হয়। সেহেতু এ ধরনের অপরাধীকে প্রতারণা মামলার আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত প্রস্তাবনা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন ঘটলে এবং ইসলামী শরীয়াহ্ নীতি অনুসৃত হলে ভেজাল নামক এ অভিশাপ থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই রক্ষা পাবে।

ব্যভিচার ও যৌনতা প্রতিরোধে ইসলাম

ব্যভিচার এর সংজ্ঞা:

ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ 'যিনা'। আভিধানিক অর্থ অবৈধ যৌন সংযোগ, (আল-ফুজূর) বা পাপাচারিতা, (আদ দ্বীক্ব) সংকীর্ণতা, (আর রকিয়্যু 'আলা শাইয়িন) উপরে উঠা ইত্যাদি।[১] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Adultery, Going astray, deviation from the proper course, transgression, exception to a rule.[২]

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী আইনের পরিভাষায়, "যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইবনে রুশদ্ আল-হাফীদ (মৃ. ৫৯৫ হি.) যিনার পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "যিনা এমন যৌন মিলনকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বিবাহ বা রূপক বিবাহ ছাড়া এবং দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।"[৩]

আমর ইবনে হাযম যিনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "যিনা হলো হারাম জেনে যার তাকানোও বৈধ নয়, তার সাথে সংগম করা, অথবা যে প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ তার সাথে সংগম করা।"[৪]

সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদী বলেন, "একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত স্বামী স্ত্রী হওয়া ছাড়াই যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়াকে যিনা বলে।"[৫]

অতএব, ব্যভিচার বা যিনা হলো, বৈবাহিক কিংবা দাসত্বের মালিকানা সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর মাঝে যৌন সংগম হওয়া।

---

১. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত: দারুল ফিকর, খ. ৫, তা. বি., পৃ. ২৩১; ইবনে মানযূর, লিসানুল 'আরাব, বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি/১৪১৩ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৭; আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৫৭; আল-ফীরুযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪১৩ হি./ ১৯৯১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৩১; ড. যাইদ ইবনে আব্দুল করীম, আল-উফূ আনিল উকূবাতি ফিল ফিকহিল ইসলামী, রিয়াদ: দারুল আসিমাহ্, ১৪১০ হি., পৃ. ৩২০।

২. Ashu Tosh Dev, Students' Favorite Dictionary, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986, P. 973.

৩. ইবনে রুশদ্ আল-হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ, বৈরূত: মা'রিফাহ্, ১৯৭৮ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৪৩৩

৪. আমর ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, মিসর: আল-জমহুরিয়া 'আরাবীয়াহ্, ১৯৭০ খ্রি,/ ১৩৮৭ হি. খ. ১১ পৃ. ২২৯

৫. তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৭০

ক. ব্যভিচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন:

বাংলাদেশে যিনা-ব্যভিচার তথা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে মোঘল আমলে ভারত উপমহাদেশে ইসলামী ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইন ছিল। বৃটিশ শাসনামলে বিভিন্নভাবে ফৌজদারি আইন সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ The Indian Penal Code, 1860 প্রণীত হলে ইসলামী ফৌজদারি আইন দেশের সাধারণ আইনের মর্যাদা হারায়। পাকিস্তান আমলের পর বাংলাদেশের নতুন চাহিদায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুনভাবে আইন প্রণীত হয়ে আসছে। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ অপরাধ দমনে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে পৃথক একটি আইন The Cruelty to Women (Deterrent Punishment Ordinance, 1983) পাশ হয়।

নারী নির্যাতন দমন করার জন্য ফৌজদারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। নারীর সাথে শিশুর জন্যও ১৯৯৫ সালে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ জন্য পাশ করা হয় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫। নারী ও শিশুর শরীর ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য ২০০০ সালে নতুন একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাশ হয়।

সাধারণভাবে বিবাহ-বহির্ভূত দৈহিক মিলনে তথা নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রচলিত আইনে এই অবৈধ সর্ম্পককে প্রকৃতিভেদে চারভাগে বিভক্ত করে তাদের সংজ্ঞা ও শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

(১) ধর্ষণ (Rape)

(২) ব্যভিচার (Adultery)

(৩) প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে দৈহিক মিলন। (Cohabit ion caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)

(৪) অজাচার (Incest)

ধর্ষণ (Rape):

সাধারণত বিবাহ বহির্ভূত নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ বলা হলেও প্রচলিত আইনে ধর্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। ১৮৬০ সালের দন্ডবিধিতে ধর্ষণকে নিম্নরূপে The Penal Code, 1860, Section-375 সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কোন পুরুষ নিম্নোক্ত পাঁচটির যেকোন অবস্থায় কোন স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসংগম করলে সে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে। প্রথমত: স্ত্রী লোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতীত; তৃতীয়ত, স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই কিন্তু মৃত্যুর বা আঘাতের ভয় দেখায়ে তার সম্মতি আদায় করা হলে; চতুর্থত, স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমেই কিন্তু পুরুষটি জানে যে, সে স্ত্রীলোকটির স্বামী নয় এবং এও জানে যে, স্ত্রীলোকটি তাকে এমন অন্য একজন পুরুষ বলে ভুল করেছে যে পুরুষটির সাথে সে আইন সম্মতভাবে বিবাহিত হয়েছে বা বিবাহিত বলে বিশ্বাস করে; পঞ্চমত, স্ত্রীলোকটির সম্মতিক্রমে কিংবা সম্মতি ব্যতীত, যদি স্ত্রীলোকটির বয়স ১৪ বছরের কম হয়, এক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম হচ্ছে, কোন পুরুষের নিজ স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়, যদি স্ত্রী ১৩ বছরের কম বয়স্কা না হয়।[৬]

ধর্ষণ বিষয়ক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি কোন পুরুষ বিবাহ্ বন্ধন ব্যতীত ১৪ বা তার অধিক বয়স্কা কোন নারীর সাথে তার সম্মতিতে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য করা হবে না। তবে মহিলাটির স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করা হলে তা ধর্ষণের শামিল। ধর্ষণের এই সংজ্ঞায় বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষতিগ্রস্ত মহিলার বয়স যদি ১৪ বছরের কম হয় তাহলে সম্মতি প্রদান করলেও এর আইনগত কোন মূল্য নেই। এছাড়া বিবাহিতা স্ত্রীর বয়স যদি ১৩ বছরের কম হয় তবে তার সাথে স্বাভাবিক সহবাসও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।[৭]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ ধারায় বর্ণিত ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির দন্ড নিম্নরূপ:

- ধর্ষণে শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ড।
- ধর্ষণ বা ধর্ষণ পরবর্তী কার্যকলাপে মৃত্যু ঘটলে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড।
- দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটলে তার শাস্তি প্রত্যেকের মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড।
- ধর্ষণে মৃত্যু ঘটানো বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ড।
- ধর্ষণের চেষ্টার শাস্তি ৫-১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ড।[৮]

---

৬. A man is said to commit `Rape' who except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions: First, against her will. Secondly, without her consent. Thirdly, with her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt. Fourthly, with her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifthly, with or without her consent, when she is under fourteen years of age. Explanation: penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape. Exception: Sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under thirteen years of age is not rape. The Penal Code, 1860, Section 375.
মুহাম্মদ সাইফুল আলম, দন্ডবিধি, ঢাকা : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স, তা. বি., পৃ. ৩১২-৩১৩; অধ্যাপক এ.টি.এম কামরুল ইসলাম, দন্ডবধি, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, তা. বি. পৃ. ১৮৯-১৯০।

৭. The Penal Code, 1860, Section 375; মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, দন্ডবিধি, পৃ. ৩১৫-৩২০; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৯।

৮. প্রাগুক্ত।

ব্যভিচার (Adultery):

The Penal Code, 1860, Section-497 এ বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর সম্মতি তথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যভিচার বলা হবে।[৯] প্রচলিত এই আইনে ব্যভিচারের জন্য পুরুষকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও মহিলাকে অপরাধী বলা হয়নি বা তার কোন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই আইনে শুধু পুরুষ লোকটির শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর শাস্তি সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড। ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারিণী মহিলাকে ব্যভিচারের সহযোগি হিসেবে দন্ডিত করা যায় না।[১০]

৩. প্রতারণামূলকভাবে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক দেহিক মিলন

(Cohabit ion caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)

The Penal Code, 1860, Section-493 এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন পুরুষ কর্তৃক প্রতারণামূলকভাবে কোন নারীকে তার সাথে বৈধ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে তার সাথে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দৈহিক মিলন ঘটালে ঐ পুরুষটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত করে। এ অপরাধের শাস্তি সর্বাধিক ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।[১১]

অজাচার (Incest):

মুসলিম পারিবারিক আইনে যে সকল নারীকে বিবাহ করা অবৈধ এমন নিকটাত্মীয়ের সাথে দৈহিক মিলনকে অজাচার বলে। ইসলামী আইনে এরূপ ব্যভিচার অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অত্যন্ত ঘৃণিত অপকর্ম। কন্যা, পুত্রের কন্যা, বোন, বোনের কন্যা, ইত্যাদির সাথে এরূপ ঘটনা একপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক হতে পারে । ইংল্যান্ডসহ অনেক পাশ্চাত্যদেশে এ ধরণের ঘটনা শাস্তিযোগ্য হলেও বাংলাদেশে তা শাস্তিযোগ্য নয়।

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইনঃ

ইসলামী আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরানো। তাই যে সব কারণে ব্যভিচারের মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয় ইসলাম প্রথমে সেগুলোকে বন্ধ করতে চায়। ইসলাম প্রথমে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে তার হৃদয়ের মাঝে মহান আল্লাহর ভয় বসিয়ে দেয়। তার মধ্যে আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এরপর ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন তথা জৈবিক চাহিদা পূরণের পথকে সুগম ও সহজ করেছে। ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। বরং মানব সমাজের

---

৯. *The Penal Code, 1860, Section 497*; মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, দণ্ডবিধি, পৃ. ৪২৫-৪২৬, অধ্যাপক এ. টি. এম. কামরুল ইসলাম, দণ্ডবিধি, পৃ. ২৪৭।

১০. *The Penal Code, 1860, Section 497.*

১১. "Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, shall be punished with imprisonment of either to ten years, and shall also be liable to fine." *The Penal Code, 1860, Section 493.*

প্রসার ও শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও মিলনকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। যিনি মানুষের মধ্যে জৈবিক প্রবণতা ও শক্তি দিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন। এজন্য মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা দমন করা নয়, বরং সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করাই ইসলামের কাম্য। কেউ এক স্ত্রীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল না হলে স্বামীর জন্য তালাক এবং স্ত্রীর জন্য 'খুলা'র সুযোগ রয়েছে। আর অমিলের সময়ে পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত আপীল করার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে, নয়তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মূল করে দেয় যেগুলো যিনার আগ্রহ সৃষ্টি করে। ফৌজদারি আইনে শাস্তি প্রদানের পূর্বে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ এবং নারীদের সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয়। ঘরের বাইরে চলার পথে নারী-পুরুষদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হয়েছে, যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় পৌঁছতে না পারে। ভিতরে-বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্টু প্রকৃতির লোক বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার উপর জোর দেয়, তাদেরকে চরম শাস্তি দেয়ার সাথে সাথে বহু সংখ্যক লোকের মানসিক অবস্থার সংশোধনের লক্ষ্যেই এ শাস্তির বিধান দিয়েছে। এ শাস্তি নিছকক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় এবং এটি একটি কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যভিচারীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র নয়।

ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে সতর্কীকরণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কবীরা গুণাহসমূহের একটি। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে অতি গর্হিত পন্থা আখ্যা দিয়ে বলেছেন, "তোমরা অবৈধ যৌন-সংযোগের কাছেও যেও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[১২] এ আয়াতে বলা হয়েছে-যিনার কাছেও যেও না।" এর অর্থ হলো, যিনার প্রাক্কালীন কার্যাবলি এবং যিনা সহজ ও সম্ভব করে যে কার্যাবলি তা তোমরা নিজেও করো না এবং সমাজেও হতে দিও না।[১৩]

আল্লাহ তাআলা যিনা-ব্যভিচারের নিষিদ্ধতার ভয়াবহতার উল্লেখ করার জন্য শিরক, নরহত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের অপরাধরূপে চিহ্নিত করে বলেন, "আল্লাহর নেক বান্দা তারা যারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ

১২. আল-কুরআন, ১৭:৩২

১৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, দিল্লী: ইতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউস-১৯৯৩ খ্রি. খ. ৫, পৃ.৪৬৩

ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।"[১৪] এ আয়াতে আল্লাহর সাথে শরীক, অবৈধ হত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের জঘন্য অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহমানের বান্দারা এ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটিও করতে পারে না-করলে তাঁর অনুগত বান্দারূপে গণ্যই হতে পারে না।[১৫] যিনা-ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ আরো বলেন, "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[১৬]

আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্য ও মুমিনদের উপস্থিতিতে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "ব্যভিচারীদের শাস্তি দেবার সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।"[১৭] মহান আল্লাহর এই নির্দেশের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্যে এবং মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে কার্যকর করলে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী লোকদের অন্তরে এক প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার হবে এবং তারা এ ধরনের আর কোন অপরাধ করার সাহসই পাবে না।[১৮]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসেও যিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সেই জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের প্রচলন হবে সেই জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে।"[১৯] আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রসূল, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তুমি এ কারণে তোমার সন্তানকে হত্যা করেছ যে, সে খাদ্যে তোমার সাথে অংশীদার হবে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে যিনা করা।[২০] রাসূলুল্লাহ্ (স.) যিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, "যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়বে, ততদিন তারা কল্যাণেই থাকবে। আর তাদের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার প্রসার লাভ করলে আল্লাহ তাদের মধ্যে শাস্তি নাযিল করবেন।"[২১]

---

১৪. আল-কুরআন, ২৫: ৬৮
১৫. মা'আরিফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ, ৬, পৃ. ৫০৫
১৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩
১৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২
১৮. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৩, খ. পৃ. ১১২-১১৩
১৯. শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আল্-খতীব তাবরীযী, আল-মিশকাতুল মাসাবীহ্, দেওবন্দঃ মি'রাজ বুক ডিপো, তা. বি. , পৃ. ৩১০
২০. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ আস্ সারিকু হিনা ইয়াসরিকু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২৯/২০০৮, পৃ. ৫৬৬
২১. আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ তাববারা, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, অনু. মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ১১৩

হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচার ইহ্জগতেও শাস্তির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও এর গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।"[২২]

কোন ব্যক্তির মধ্যে ব্যভিচার ও ঈমান একত্র হতে পারে না। আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। আর চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ্যপান করে না।"[২৩] মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় ব্যক্তি কারা সেই সম্পর্কে মহানবী (স.) তাঁর সাথীদের কাছে বর্ণনা দিয়ে বলেন, "চার শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না । তারা হলো, (১) শপথকারী ব্যবসায়ী, (২) গরীব অহংকারী, (৩) বৃদ্ধ ব্যভিচারী (৪) অত্যাচারী শাসক।"[২৪]

ব্যভিচারীদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) সতর্ক করে বলেন, "হে লোক সকল, তোমরা যিনাকে ভয় কর, কেননা যিনার মধ্যে ছয়টি মন্দ পরিণাম রয়েছে। তিনটি দুনিয়াতে এবং তিনটি আখিরাতে। দুনিয়াতে তিনটি হলো– (১) সৌন্দর্যহানি (২) দারিদ্র্য (৩) অকালমৃত্যু । আর আখিরাতের তিনটি হলো (১) আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি (২) হিসাবে মন্দ পরিণাম এবং (৩) জাহান্নামের শাস্তি।"[২৫]

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যিনা-ব্যভিচারের কারণে মানবজাতির মূল ভিত্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ইসলামী আইনে যিনাকে কবীরা গুনাহ্ ও 'হদ্দ' তথা বিধিবদ্ধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অবৈধ যৌন সঙ্গম দাম্পত্য প্রেম ও পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করে। যিনা এমন এক ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামী আইনে ব্যভিচারের শাস্তি:

সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। ইসলামের এই বিধান যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে অবশ্যই সমাজ থেকে ব্যভিচারের মত নিকৃষ্ট অপরাধ উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। অপরাধ হিসেবে ব্যভিচারের দুটি স্তর রয়েছে। ব্যভিচারীরা হয় বিবাহিত হবে অথবা অবিবাহিত। বিবাহিতের ব্যভিচার অবিবাহিতের চেয়ে জঘন্য। বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি অবিবাহিত ব্যভিচারীদের চেয়ে কঠোরতম করা হয়েছে, কারণ, বিবাহিত ব্যক্তিদের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থাকায় সে এইসব বিষয়ের স্বাদ পূর্বেই গ্রহণ করেছে এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা

---

২২. মাআ'রিফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

২৩. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ: ইসমুয যুনাহ্ ওয়া কওলিল্লাহি তাআলা: ওয়ালা ইয়ায়নূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

২৪. ইমাম নাসায়ী, আস-সুনান বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ্, ১৪২০ হি. ,হাদীস নং ২৫৭৫, খ. ৫, পৃ. ৯১; ইমাম বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, বৈরূত: দারুল কিতাবুল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০ হি. হাদীস নং ৪৮৫৩

২৫. আস্-সুয়ূতী, জামি'উল কাবীর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২৭৩৫৭; আবূ বকর বায়হাকী, শুআবুল ঈমান; আল্-খারায়িতী, মাবাদিউল আখলাক্ব; ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। অপরদিকে, অবিবাহিত ব্যক্তি তার জৈবিক চাহিদা পূরণের কোন উপায় নেই, সে যদি উত্তেজনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপদগামী হয়, সে অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য লঘু শাস্তি প্রদান করে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। [২৬] এখানে উভয় স্তরের শাস্তি বর্ণনা করে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তিঃ

যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত নয়, তারা যদি যিনার অপরাধ করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো।"[২৭]

আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী স্বাধীন, জ্ঞানী, বালেগ ও অবিবাহিত হলে আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ি তাকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। অবশ্য এরপরও শাস্তির অংশ হিসেবে অপরাধীকে একবছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে কি না, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি অভিমত দলীলসহ উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম অভিমতঃ অপরাধীকে শুধু একশ বেত্রাঘাত আর তাযির স্বরূপ নির্বাসনের শাস্তিঃ

অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও যুফার র. বলেন, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে কেবল বেত্রাঘাত করতে হবে। আর তাদেরকে নির্বাসনে দেয়া বিচারকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। বিচারক যদি মনে করেন তাদেরকে নির্বাসন দেয়া প্রয়োজন, তাহলে তা করতে পারেন। যেমনভাবে তাদেরকে বন্দী করে রাখা বৈধ যতক্ষণ না সে তওবা করে। "[২৮] হানাফী আলিমগণের মতে, অবিবাহিত যিনাকারদের নির্বাসনের শাস্তি হলো 'তাযীর'[২৯] যা বিচারকের বিবেচনাধীন।

---

২৬. সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যীলালিল কুরআন, তা.বি.খ. ১৪, পৃ. ৯১; তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ৭৯

২৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২

২৮. আহ্কামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ফিকহুল ইসলামী, খ. ৬, পৃ. ৩৯; ফিকহুস সুন্নাহ্, খ. ২. পৃ. ৫৫৬; আল-বাদাই আস্ সানাই, খ. ৭, পৃ. ৩৯

২৯. 'তাযীর' এটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, ভদ্র বানানো, নিবৃত্ত করা, সংস্কার করা, উপদেশ দেয়া, সংশোধন করা, শৃঙ্খলা বিধান করা, ইজ্জত-সম্মান করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। শরীয়াতের পরিভাষায়–এটা অনির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহর কিবা মানুষের অধিকার সম্পর্কীয় প্রত্যেক পাপের কারণে ওয়াজিব হয়। তাযীর ইসলামী দণ্ড যা অনির্ধারিত প্রত্যেক অন্যায়ের জন্য, শরীয়াত তার কোন শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে রচনা করে না। সুতরাং ইসলামী শরীয়াতে যে সব অপরাধে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি বা কাফফারার ব্যবস্থা নেই বরং ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর মনোনীত বিচারক অপরাধ ভেদে শাস্তি নির্ধারণ করে থাকেন এমন শাস্তি কেউ তাযীর বলে। যেমন- ঘুষ গ্রহণ, সুদী কারবার করা আমানতের খেয়ানত করা, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা, অপরাধীদের আত্মগোপনে সাহায্য করা ইত্যাদি। এছাড়া যেসব অপরাধের হদ্দ সুনির্দিষ্ট কিন্তু তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়নি তাও এ তাযীর হিসেবে গণ্য। দ্র. ইবনে মানযুর আল আফ্রিকী আল মিসরী, লিসানুল আরাব, বৈরূত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৫৬১; ড. যায়িদ ইবনে আব্দুল করীম, আল আফউ আনিল ওকুবাত ফীল ফিকহিল ইসলামী, রিয়াদ : দারুল আস্মা, ১৪০০ হি., পৃ. ২৮২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৪১২; কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, তা.বি., খ. ৫, পৃ.৩৪২

এটি 'হদ্দ'[৩০] নয়। তাঁরা এ মতের সমর্থনে দলীল ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম দলীলঃ অবিবাহিত যিনাকারদের নির্বাসন করা 'হদ্দ' না হবার দলীল মহান আল্লাহর বাণী (ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো।)[৩১] এই আয়াতে যিনাকারীদের প্রাপ্য শরয়ী শাস্তি এটাই অনিবার্য করে। আর এটাও প্রমাণ করে যে, এ শাস্তিই পূর্ণ হদ্দ। অতএব আমরা যদি বেত্রাঘাতের সঙ্গে নির্বাসনকে 'হদ্দ' ধরে নেই তাহলে তা হবে শরীয়াতের অকাট্য দলীলের উপরে খানিকটা বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু তা বৈধ নয়। কারণ এতে পবিত্র কুরআনের উপরে একটি অতিরিক্ত হুকুম চাপিয়ে দেয়া হয়। যার অর্থ হয়, "কুরআনের হুকুমকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।" অথচ 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা কুরআনের হুকুম রহিত করা জায়েয নয়।[৩২]

দ্বিতীয় দলীলঃ একবার মদপানের অপরাধে খলীফা ওমর ইবনে খাত্তাব রা. রবীআ ইবনে উমাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে খায়বারে নির্বাসিত করেছিলেন। তখন সে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং খ্রিস্টান হয়ে যায়। উমর (রা.) তখন এ সম্পর্কে অবগত হয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি আর কখনো কোন মুসলমানকে নির্বাসিত করবো না।"[৩৩]

তিনি যিনার শাস্তিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেননি। বস্তুতঃ নির্বাসন যদি 'হদ্দ' বা শরীয়াতের নির্ধারিত বিধান হতো তাহলে হযরত উমর রা. এরূপ শপথ করতেন না।

তৃতীয় দলীলঃ আলী (রা.) অবিবাহিতদের যিনার শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন, "তাদের দু'জনকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে নির্বাসিত করা হবে না। কেননা তাদেরকে নির্বাসিত করাতে ফেতনা আছে।"[৩৪]

চতুর্থ দলীলঃ উবায়দুল্লাহ্ নাফে (র.) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, "তাঁর এক দাসী যিনা করে, তাকে তিনি বেত্রাঘাত করেন কিন্তু নির্বাসনে পাঠাননি।"[৩৫]

পঞ্চম দলীলঃ আবূ হুরাইরা, শাবিল ও যায়িদ ইবনে খালিদ (রা.) দাসীদের যিনার শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচার করে, তখন তাকে বেত্রাঘাত করবে। এরপরও ব্যভিচার করলে, তাকে বেত্রাঘাত করো। অতঃপর তাকে বিক্রি করে দাও, যদিও দাফিরের (সামান্য মূল্যের) বিনিময়ে হয়।"[৩৬]

---

৩০. 'হদ্দ' এটি আরবী শব্দ। এর বহুবচন হুদূদ। আভিধানিক অর্থ-প্রতিরোধ, বাধাদান, চৌহদ্দী, দুটি বিষয় বা বস্তুর মধ্যকার প্রতিবন্ধক, যা একটিকে অপরটি হতে পৃথক রাখে। শরীয়াতের পরিভাষায়, আল্লাহর অধিকার লংঘনের দায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা কম বেশি বা মাফ করার অধিকার কোন মানুষের নেই এমন শাস্তিকে 'হদ্দ' বলে। ইসলামী শরীয়াতে হদ্দযোগ্য অপরাধ সাতটি।
যথা- ক. ব্যভিচার খ. ব্যভিচারের অপবাদ গ. চুরি ঘ. ডাকাতি ঙ. মদপান চ. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচণ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছ. মুরতাদ তথা ইসলাম ধর্মত্যাগী ব্যক্তি । দ্র. আল-'উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ ১২৩-১২৪ ; আব্দুর রহমান আল জাযায়িরী, কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ্, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা.বি. খ. ৫ পৃ. ১১-১২, সম্পাদন পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি. খ. ৫, পৃ. ২৬৩-২৬৭; সম্পাদনা বোর্ড, গাজী শামছুর রহমান, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ২০৩-২০৪

৩১. আল-কুরআন, ২৪ : ২

৩২. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৬; আল-বাদাই আস সানাই, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯

৩৩. তাফসীরে মাযহারী, তা. বি. খ. ৮, পৃ. ৫১০; আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪

৩৪. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ৫০৯

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. প্রাগুক্ত।

এ হাদীস পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়ঃ

ক. নির্বাসন দেয়া যদি 'হদ্দ' হতো তাহলে বেত্রাঘাতের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তা বর্ণনা করতেন।

খ. এ হাদীস দ্বারা ব্যভিচারিণী দাসীকে নির্বাসনের শাস্তি দেয়ার নির্দেশ বাতিল প্রমাণিত হয়। আর যখন দাসীর নির্বাসনের শাস্তি বাতিল হলো, তখন আযাদ ও মুক্ত মহিলার নির্বাসনের শাস্তিও বাতিল হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "দাসীরা যদি ব্যভিচার করে, তবে তাদের উপর বিবাহিতা আযাদ মহিলাদের শাস্তির অর্ধেক শাস্তি হবে।"[৩৭] সুতরাং যখন দাসীর বেত্রাঘাত আযাদ মহিলাদের হদ্দের অর্ধেক এবং নবী (স.) দাসীদের শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাতের কথা বলেছেন কিন্তু দেশান্তরের কথা বলেননি তাতে প্রমাণিত হলো যে, আযাদ মহিলার 'হদ্দ' হলো বেত্রাঘাত, নির্বাসন 'হদ্দ' নয়।[৩৮]

গ. দাসী যিনা করলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে বিক্রয় করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসন করা জরুরী হলে দাসী তখন বিক্রেতার হাতে থাকবে না এবং ক্রেতাও তাকে হস্তগত করতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তিনি বিক্রেতাকে এমন বস্তু বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ দিবেন যে, ক্রেতা তাকে বিক্রেতা থেকে হস্তগত করতে সক্ষম হবে না। [৩৯]

দ্বিতীয় অভিমতঃ একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসনঃ

ইমাম ইবনে আবী লায়লা, মালিক, আওযায়ী, সাওরী, হাসান ইবনে সালিহ্, শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) অবিবাহিত যিনাকারদের শাস্তি সম্পর্কে বলেন, অবিবাহিত ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাতের পর উভয়কে একবছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে।"[৪০] নির্বাসিত হতে হবে এত দূরে যেখানে কসর করতে হয়। ইমাম শাফিঈ (র.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, দাসকে অর্ধ-বছর নির্বাসন দিতে হবে।[৪১] ব্যভিচারিণীকে একাকী নির্বাসন দেয়া যাবে না, বরং তাকে তার স্বামী বা তার কোন মাহরামের সাথে নির্বাসন দিতে হবে। এ মতের সমর্থনে তাঁরা নিম্নোক্ত দলীলসমূহ উপস্থাপন করেন।

---

৩৭. আল-কুরআন, ৪:২৫

৩৮. আহকামুল কুরআন, তা. বি. খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৫

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; নিহায়াতুল মুহ্তাজ, তা. বি., খ. ৭; পৃ. ৪২৮-৪২৯, ফিকহুল ইসলামী, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৩৯; ইমাম শাফিঈ, কিতাবুল উম্ম, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৩ হি., খ. ৬, পৃ. ১৪৬; মহিউদ্দীন ইয়াহিয়া আন-নবূবী, রাওযাতুত তালিবীন ওয়া 'ইমদাতুল মুফতীন, বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হিজরী, খ. ১০, পৃ. ৮৭, সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ্, বৈরূত, শিরকাতু মানার লিলদাওলীয়াহ্, ১৯৯৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৫৫৫; ইব্রাহীম আহমাদ আল আনসারী আল-ওয়াকাফী, তিলকা হুদূদাল্লাহ্, পাকিস্তান : দারুল ইলম, ১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ৫৯।

৪১. প্রাগুক্ত।

প্রথম দলীল: উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত-অবিবাহিতার যিনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন দন্ড।"[৪২]

দ্বিতীয় দলীল: আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইবনে খালিদ (রা.) বলেন, "একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল, আমার ছেলে এই লোকটির মজুর ছিল। ছেলেটি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এই অপরাধের দরুন আমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে 'রজম' পাথর নিক্ষেপে হত্যা। তখন আমি এ শাস্তি হতে পুত্রকে বাঁচাবার জন্য একশত বকরী ও আমার একটি বাঁদী মুক্তিপণ হিসেবে তাকে দিয়েছি। কিন্তু পরে আমি আলেমগণের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানালেন, আমার পুত্রের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর 'রজম' এর শাস্তি। একথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করবো। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। তোমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও যদি সে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে 'রজম' করো। উনাইস রা. তাকে জিজ্ঞেস করলে সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলো। অতঃপর তিনি তাকে রজম করেন।"[৪৩]

তৃতীয় দলীল: একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, খলীফা আবূ বকর (রা.) অবিবাহিত যিনাকারকে বেত্রাঘাত করার পর সিরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো অপরাধীকে বেত্রাঘাত করার পর ফিদাকের দিকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।[৪৪] অতএব, উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে বলা যায়, অবিবাহিত যিনাকারের উপর একশত ও সেইসাথে একবছরের নির্বাসনের শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

তৃতীয় অভিমত: একশ বেত্রাঘাত ও শুধু পুরুষ যিনাকারীকে নির্বাসন

ইমাম মালিক ও আওযায়ী (র.) এর অভিমত হলো, "পুরুষ যিনাকারীকে বেত্রাঘাতের পর নির্বাসন দিতে হবে, কিন্তু মহিলা এবং দাসীকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। আর যাকে দেশান্তর করা হবে তাকে ঐ স্থানে বন্দী অবস্থায় রাখতে হবে।"[৪৫]

৪২. ইমাম মুসলিম, আস্ সহীহ্ লি-মুসলিম, লাহোর : শায়খ গোলাম আলী ইনাদ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৭৩; তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ৫০৮; আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩

৪৩. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৩-৫০৪; ফিকহুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০; আল উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৪. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০৩

৪৫. আহ্কামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ফিকহুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৯; ফিকহুস সুন্নাহ্।

দলীল ও যুক্তি: ব্যভিচারিণী মহিলাকে একাকী বিদেশে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিতা হয়ে পড়বে। আর শরীয়াতের বিধান মত নির্বাসন দেয়া হলে একজন মাহরাম[৪৬] পুরুষ তার সঙ্গে নিতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন ঈমানদার মহিলার পক্ষে পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করা জায়েয নয়।"[৪৭] আর কোন মাহরাম পুরুষকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে অপরাধী নয় এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। অথচ তা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। কেননা, কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "কোন বোঝা বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করতে বাধ্য হবে না।"[৪৮] মজুরী বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যদি কাউকে এভাবে অন্যের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয় তাহলেও তা হবে এমন একটা দায়িত্বের বোঝা চাপানো যা শরীয়াত সমর্থন করে না। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট যে, বিদেশে নির্বাসনের শাস্তি কেবলমাত্র পুরুষ যিনাকারীকেই দেয়া যেতে পারে; কোন মহিলা যেনাকারকে নয়।

---

৪৬. আল-কুরআন, ৪: ২৩-২৪; আল-কুরআন, ২ : ২২১; ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, খ. ৫. পৃ. ৮৮-৯২; আন্ওয়ারুত তানযীল, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২৫-২৬

মাহ্রাম : মহান আল্লাহ্ মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য বৈবাহিক পন্থার প্রচলন করেছেন। খোদায়ী বিধান অনুযায়ী পুরুষের পক্ষে যে সব নারীকে বিবাহ করা হারাম তথা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরীয়াতের পরিভাষায় তাদেরকে মাহরাম বলা হয়। মাহ্রাম তিন প্রকার: (১) মাহ্রাম বিন নসব (বংশ ও রক্ত সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ) (২) মাহরাম বির রাযাআত (স্তন্য সম্পর্কীয় কারণে নিষিদ্ধ) (৩) মাহ্রাম বিস সিহরিয়্যা (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ) ।

মাহ্রাম বিন নাসব সাত প্রকার। যথা- ১. মাতাবর্গ ২. কন্যাবর্গ ৩. ভগ্নিবর্গ ৪. ফুপুবর্গ ৫. খালাবর্গ ৬. ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্গ ৭. ভগ্নীর কন্যাবর্গ। মাহ্রাম বির রাযা'আত দুই প্রকার। যথা- ১. দুধমাতাবর্গ ২. দুধভগ্নিবর্গ । উল্লেখ্য যে , বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে যে সাত প্রকার পুরুষ ও নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম করা হয়েছে, দুগ্ধ পানের কারণেও উক্ত সাত প্রকার পুরুষ ও নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। মাহ্রাম বিস সিহরিয়্যা পাঁচ প্রকার। যথা -১. স্ত্রীর মাতৃবর্গ ২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যাবর্গ, ৩. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ, ৪. বিমাতাবর্গ ৫. পুত্রবধুবর্গ। উপরোক্ত চৌদ্দশ্রেণী ব্যতীত আরো যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তারা হলো-১. অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী ২. মুশরিক নারী ৩. তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ৪. সমলিঙ্গের সাথে বিবাহ ৫. অমানবের সাথে বিবাহ (জ্বীন-পরী বা মানবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন প্রাণীকে) ৬. লি'আন তথা নিজ স্ত্রীকে যেনার অপবাদ আরোপ করলে ৭. মুহাররামাত বিল মিলক তথা স্বাধীনা মহিলা কোন ক্রীতদাসকে বিবাহ করা । ৮. মুহাররামাত বিল জগল তথা চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকতে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ। ৯. স্ত্রীর বোন, খালা, ফুপু, বোনের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়েদেরকেও স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় বিবাহ্ করা হারাম। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, কোন পুরুষ দুইজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে একসাথে বিবাহাধীন রাখতে পারবে না যাদের একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অপর জনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

৪৭. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়: আত্-তাকসীর, অনুচ্ছেদ: ফী কাম ইয়াকসিরুস সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪৮. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭

অবিবাহিত যিনাকারীদের শাস্তি সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন পূর্বক আমরা বলতে পারি যে, ইমাম বা বিচারক যদি অপরাধীকে একশ বেত্রাঘাত করার পর নির্বাসনে পাঠানো প্রয়োজন মনে করেন তবে নির্বাসিত করাও জায়েয আছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) হতে নির্বাসন করা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে, তা এরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি: ইসলামী আইনে বিবাহিত ব্যভিচারীদের শাস্তি কী হবে এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১. 'রজম' বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা।

২. অবিবাহিতদের অনুরূপ শুধু একশত বেত্রাঘাত।

৩. একশত বেত্রাঘাত ও 'রজম'। নিচে সকল দলের অভিমত দলীল সহ উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অভিমত: বিবাহিত ব্যভিচারীদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা:

আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিবাহিতা নারী (মুহসিন)[৪৯] ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে হত্যা।[৫০] নিচে এ অভিমতের সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম দলীল: উমর রা. বলেন, "মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদ স. কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর যে সব আয়াত নাযিল করেছেন, তাঁর মধ্যে 'রজম' সম্পর্কিত আয়াতও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) 'রজম' করেছেন এবং আমরাও তার ইনতেকালের পরে 'রজম' করেছি। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে কিংবা গর্ভ প্রকাশ পেলে, অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে 'রজম' করার বিধান আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান।"[৫১]

উমর (রা.) বলেন, আমরা রজমের আয়াত পাঠ করেছি ও সংরক্ষণ করে রেখেছি। আয়াতটি হলো, "আশশাইখু অশশাইখাতু ইযা ঝানাইয়া ফারজুমহুমা " উমর (রা.) আরো বলেন, লোকেরা বলবে, উমর আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে, এ আশংকা আমার না থাকলে আমি আল-কুরআনের টীকায় তা অবশ্যই লিখে দিতাম।"[৫২] উমর রা. সাহাবীগণের এক সমাবেশে এ ভাষণটি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কেউ তা অস্বীকার করেননি। অতএব, বোঝা গেল, 'রজম' এর আয়াত আল-কুরআনের আয়াত হবার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। আলিমগণ বলেন, 'রজম' সম্পর্কিত আয়াতের তিলাওয়াত মানসুখ হলেও তার হুকুম মানসুখ হয়নি।

---

৪৯. মুহসিন: মুহসিন শব্দটি 'ইহছান' শব্দ হতে উৎপন্ন। এর মাসদার হলো হিসান (হা-ছোয়াদ-নূন)। এর আভিধানিক অর্থ, প্রতিরোধ বা বাধাপ্রদান করা, দুর্গে প্রবেশ করা ইত্যাদি। তাই মুহসিন শব্দের অর্থ দূর্গে বা কিল্লায় প্রবেশকারী। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত ইহসান শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। ১. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া। ২. বিবাহিত হওয়া ৩. সতী-সাধক্ষী হওয়া। ৪. শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস করা ইত্যাদি। শরীয়াতের পরিভাষায় 'মুহসিন' বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যার মধ্যে সাতটি গুণ পাওয়া যায়। যথা- ক) বুদ্ধিমান হওয়া খ) বালিগ হওয়া গ) স্বাধীন হওয়া ঘ) মুসলমান হওয়া ঙ) সঠিক পদ্ধতিতে বিবাহ হওয়া চ) সহীহ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সঙ্গম সংঘটিত হওয়া ছ) সহীহ্ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়ে তারা উভয়ে স্বাধীন, বুদ্ধিমান, বালেগ ও মুসলমান হবে। দ্র. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮২, ৩০৬; আনওয়ারুত তানযীল, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬; আহকামুল্ কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

৫০. ফিকহুস সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৬; আল-বাদাই আস- সানাই, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯; কিতাবুল উম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৯; ফিকহুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০; আবদুল কাদির আওদা, তাশরীউল জানায়ীল ইসলামী, বৈরূত : মুওয়াসসাতুর রিসালা, ১৯৯৩ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩৮৪

৫১. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১২

৫২. ফিকহুস সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৭

দ্বিতীয় দলীলঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল তাকে হত্যা করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা যাবে। (১) জীবনের পরিবর্তে জীবন অর্থাৎ কিসাস; (২) বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে এবং (৩) যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করা যায়।"[৫৩]

তৃতীয় দলীলঃ আবু কিলাবা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো তিনটি কারণের একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। (১) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে; (২) যে ব্যক্তি বিবাহের পর ব্যভিচার করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং ইসলাম ত্যাগ করেছে।[৫৪]

চতুর্থ দলীলঃ আবু হুরাইরাহ্ রা, ইবনে আবক্ষাস ও জাবির (রা.) বলেন, মাইয ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি যেনা করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। মাইয ইবনে মালিক (রা.) স্বেচ্ছায় চারবার যেনার কথা স্বীকার করেন। তখন রাসূল (স.) তাঁর কথা যাচাইয়ের পর তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দেন।[৫৫]

পঞ্চম দলীলঃ এ ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) গামেদ গোত্রের এক মহিলাকে 'রজম' করেছিলেন। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছিল যে, সে ব্যভিচারের কারণে গর্ভধারণ করেছে। মহিলাটির গর্ভস্থিত উক্ত সন্তানটির জন্মলাভ করার পরে বুকের দুধ ছাড়ানোর সময় এলে তিনি তাকে 'রজম' করেন।[৫৬]

ষষ্ঠ দলীলঃ উসমান (রা.) কে যেদিন শহীদ করা হয়, সেদিন তিনি ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের বলছি, তোমরা কি একথা জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তিনটি কারণের কোন একটি পাওয়া না গেলে কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো জায়েয নেই। আর তা হলোঃ (১) বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার করা (২) ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করা এবং (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। আল্লাহর কসম, আমি কখনো ব্যভিচার করিনি, জাহেলী যুগেও না, আর ইসলাম গ্রহণ করার পরেও না। যখন হতে আমি রাসূলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমি কখনো ইসলাম ত্যাগ করিনি। আর অন্যায়ভাবে আমি কোন মানুষকে কখনো হত্যা করিনি। বল, আমাকে তোমরা কোন্ অপরাধে হত্যা করতে চাও?"[৫৭] উপরোক্ত দলীলসমূহ ও অসংখ্যা হাদীসের ভিত্তিতে একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, বিবাহিত ব্যভিচারীদের শরীয়াতের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

---

৫৩. ফিকহুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫
৫৫. ফিকহুস সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৭; আল-উকূবাতু ফিল ফিকহীল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫–৮৬
৫৬. প্রাগুক্ত।
৫৭. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় অভিমত: বিবাহিত যেনাকারদের শাস্তি শুধু একশ বেত্রাঘাত: বিবাহিত পুরুষ ও নারী যেনা করলে তাদের শাস্তি কী হবে এ প্রসঙ্গে খারিজীরা[৫৮] 'রজম'কে অস্বীকার করে বলেন, "যিনাকার বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করতে হবে।"[৫৯] খারিজীরা এ ব্যাপারে তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম যুক্তি: 'রজম' একটি কঠিন ও নির্মম শাস্তি। যদি এট শরীয়াত সম্মত হতো তাহলে অবশ্যই কুরআনে এ শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ থাকত। যেনার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে পার্থক্য করেননি, বরং বলেছেন, 'আঝঝানিয়াতু"[৬০] এ আয়াতটি সার্বিক, ব্যভিচারী মহিলা ও পুরুষ, বিবাহিত হোক কিবা অবিবাহিত হোক উভয় সমান।[৬১]

দ্বিতীয় যুক্তি: দাসীর শাস্তি স্বাধীনার অর্ধেক। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "দাসীদের উপর মুহসানাহ্ বা আযাদ মহিলাদের শাস্তির অর্ধেক শাস্তি হবে।"৬২ যদি মুহসিনের শাস্তি 'রজম' নির্ধারণ করা হয়, তাহলে দাসীর শাস্তি রজমের অর্ধেক কিভাবে প্রদান করা যাবে।

তৃতীয় যুক্তি: সূরা নূরে ব্যভিচারের শাস্তির কথা এসেছে, তা আমভাবে সকল যিনাকারীর জন্য প্রযোজ্য কিন্তু এটাকে শুধু অবিবাহিতের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট করা কুরআনের বিধানের খেলাফ।[৬৩]

আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে খারিজীদের দলীলের জবাব

প্রথম জবাব: আল-কুরআনে রজমের বিধান উল্লেখ না থাকলেই যে তা শরীয়াত সম্মত নয়– এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ্ও শরীয়াতের দলীল। সুন্নাহ্র অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "রসূল তোমাদের যা দেন, তোমরা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"[৬৪] অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ আরো বলেন, "সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৬৫]

---

৫৮. খাওয়ারিজ: এটি আরবী শব্দ। খাওয়ারিজ শব্দটি বহুবচন। একবচন খারিজ। আভিধানিক অর্থ, দলত্যাগী, বহির্ভূত, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি। খারিজীরা ইসলামের সর্বপ্রথম বিপথগামী সম্প্রদায়। মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা ও ইসলামের সঠিক আক্বীদা থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে খারিজী বলা হয়। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে আলী রা. ও মু'আবিয়া রা. এর মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধে সালিশকে কেন্দ্র করে আলী রা. এর দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। এজন্যই তাদেরকে খারিজী বলা হয়ে থাকে। এদেরকে হারুরীয়াহ্ও বলা হয়। তাদের আকীদা হলো, ১. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির ২. আবূ বকর রা. ও উমর রা. কে বৈধ খলীফা মনে করলেও উছমান ও আলী রা. কে তারা অবৈধ খলীফা মনে করে। ৩. তারা আল-কুরআনকেই কেবল ইসলামী আইনের উৎস মনে করে। হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। সুতরাং তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী অথবা বিদ্রোহী। এটি তাদের সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহ্র সিদ্ধান্ত। দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল, খ. ১. ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৪৯-৫২; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী, ইসলামী আক্বীদাহ্, ঢাকা : আল-আকাবা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩১-৩৩২

৫৯. আল-উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৮৯; আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩

৬০. আল-কুরআন, ২৪: ২

৬১. রদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৩; কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২৭০; মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, পৃ. ২৯৪-২৯৫

৬২. আল-কুরআন, ৪ : ২৫

৬৩. ড. আহমাদ ফাতহী বাহানসী, আল-উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

৬৪. আল-কুরআন, ৫৯:৭

৬৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৬৩

মহান আল্লাহ্ বলেন, "যারা রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"[৬৬] রসূলুল্লাহ্ স. এর সুন্নাতেই স্পষ্টভাবে 'রজম' উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর ওফাতের পরে খুলাফায়ে রাশেদুন এ আইন কার্যকর করেছেন। 'রজম' এর বিধান মুতাওয়াতির সূত্রেই রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে প্রমাণিত। তবে এসব হাদীস শব্দগতভাবে মুতাওয়াতির না হলেও অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির।[৬৭]

দ্বিতীয় জবাবঃ খারিজীদের দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায় যে, তাদের এই মতামত সঠিক নয়। কারণ আয়াতে আযাব দ্বারা 'জালদ' বুঝানো হয়েছে, 'রজম' নয়। মহান আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন যে, রজমের অর্ধেক বা অর্ধমৃত্যু একটি অসম্ভব বিষয়। সুতরাং বিবেক এটাই দাবি করে যে, এর দ্বারা 'জালদ' উদ্দেশ্য, 'রজম' নয়।[৬৮]

তৃতীয় জবাবঃ খারিজীদের দাবি, যেনার ব্যাপারে কুরআনের বিধান হচ্ছে আম ('আম)। কিন্তু এটাকে নির্দিষ্ট করা কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত। তাদের এ দাবি অজ্ঞতামূলক ও অযৌক্তিক। কেননা, আল-কুরআনে অসংখ্য বিধান 'আম' ভাবে এসেছে, আর সুন্নাহ্ সেটাকে 'খাস' করেছে। যেমন, চুরির আয়াত। এটি 'আম', যদি কেউ তুচ্ছ জিনিস যেমন পয়সা, সূচ ইত্যাদি চুরি করে তবে খারিজীদের দাবি অনুযায়ী তার হাত কাটতে হবে। কিন্তু কী পরিমাণ সম্পদ চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে তা সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ্র স. এর বাণী, "এক দিনার বা দশ দিরহাম ছাড়া চোরের হাত কাটা যাবে না।" [৬৯]

তৃতীয় অভিমতঃ একশ বেত্রাঘাত ও 'রজম': বিবাহিত পুরুষ ও নারী যেনা করলে তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, হাসান ও ইবনে মানজার র. বলেন, সূরা নূরের ২ নং আয়াত অনুসারে অপরাধীকে প্রথমে বেত্রাঘাত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে 'রজম' করা হবে। আলোচ্য আয়াত শুধু অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, আর মানসূখ বা রহিতও হয়নি। অত্র আয়াতে যে বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'হদ্দ' এর অংশ বিশেষ, পূর্ণ হদ্দ নয়। 'হদ্দ' এর আর এক অংশ হাদীসে উল্লেখ আছে। অতএব, যেনাকারী অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। আর বিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং পরে তাকে 'রজম'ও করতে হবে। নির্বাসনে দেয়া সম্পর্কিত হাদীসে যেমন আলোচ্য আয়াতের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং হাদীস আয়াতের সম্পূরক, অনুরূপভাবে 'রজম' সম্পর্কিত হাদীস ও আয়াতের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং এক্ষেত্রেও হাদীস আয়াতের সম্পূরক। অতএব, আয়াত ও হাদীস উভয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব।[৭০] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) স্বীয় মতের সপক্ষে নিম্নের দলীলসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম দলীলঃ উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত ও একবছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশত করে বেত্রাঘাত ও 'রজম' করতে হবে।[৭১]

---

৬৬. আল-কুরআন, ২৪: ৬৩

৬৭. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫১২; আল-উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৯০

৬৮. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ১২৫-১২৭

৬৯. শারহু ফাতহিল কাদীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১১; মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৭০. ইবন্ হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, রিয়াদঃ দারুল ইফতা, ১৪০১ হি., খ. ১২, পৃ. ১১৯; আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ১২১; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ, ১৪০১ হি. পৃ. ১২০

৭১. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ৫১৭

দ্বিতীয় দলীল: আলী রা. কূফায় সুরাহা হামদানী নামক এক মহিলাকে যেনার অপরাধে বৃহস্পতিবার একশত বেত্রাঘাত করেন এবং শুক্রবার তাকে 'রজম' করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তাকে বেত্রাঘাত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস অনুসারে তাকে 'রজম' করেছি।[৭২]

হাম্বলীদের দলীলের জবাব:

প্রথম জবাব: ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ (র.) বলেন, আল্লাহর বাণী 'আঝ্‌ঝানিয়াতু অঝঝানী ফাজলিদূ কুল্লা অহিদিম্মিনহুমা মিআতা জালদাহ্' এ আয়াতটি অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট। বিবাহিতদের ব্যাপারে মানসূখ বা রহিত। উবাদা ইবনে সামিত ও সালামা ইবনে মুহাবক্কাক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের হুকুমও অনুরূপ। অর্থাৎ অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট বা বিবাহিতদের ব্যাপারে মানসূখ। মানসূখ হবার দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (স.) মাইয কে রজম করেছিলেন, তিনি গামেদ ও জুহায়না গোত্রীয়া দুই মহিলাকেও 'রজম' করেছিলেন এবং বিভিন্ন সূত্রে তাদের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন একটি সূত্রেও একথা বর্ণিত হয়নি যে, তাদের কাউকে প্রথমে বেত্রাঘাত করা হয়েছে এবং পরে 'রজম' করা হয়েছে। এছাড়া যায়িদ ইবনে খালিদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) উনাইস (রা.) কে বলেন, হে উনাইস, এ তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর নিকটে যাও, যদি সে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে 'রজম' করো। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে একথা বলেননি, প্রথমে তাকে বেত্রাঘাত কর এবং পরে তাকে 'রজম' করো।

আবূ ওয়াকিদ আল-লায়ছী (রা.) বলেন, একবার আমরা 'জাবিয়া' নামক স্থানে খলীফা উমর (রা.) এর দরবারে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্ত্রী ব্যাভিচার করেছে এবং সে নিজেও তার স্বীকার করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খলীফা আমাকে কিছু সংখ্যক লোক'সহ তার নিকট বিষয়টি জানার জন্য পাঠালেন। সে এ বিষয়ে স্বামীর কথাই সত্য বলে স্বীকার করল। আমরা উমর (রা.) এর নিকট সংবাদটি পৌঁছে দিলে তিনি তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন। 'রজম' করার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেননি।[৭৩]

দ্বিতীয় জবাব: আলী (রা.) হামাদানী গোত্রের এক মহিলাকে প্রথমে বেত্রাঘাত করেছিলেন, তারপর তাকে 'রজম' করেছিলেন তার জবাবে আমরা বলতে পারি যে, সম্ভবত তার কারণ ছিল যে, হামাদানী গোত্রের মহিলা বিবাহিতা ছিল, আলী (রা.) এর কাছে প্রথমে তা প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে তিনি তাকে প্রথমে বৃহস্পতিবার বেত্রাঘাত করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যখন প্রমাণসহ জানতে পারেন যে, সে বিবাহিতা, তখন তিনি তাকে পরের দিন 'রজম' করেন। আলী (রা.) যে একথা বলেছিলেন, "আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং রসূল (স.) এর হাদীস মোতাবিক 'রজম' করেছি তার এ কথার অর্থ হলো, অবিবাহিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব হামাদানী গোত্রের মহিলার যখন বিবাহিতা হওয়া প্রমাণিত হয়েছে তখন আমি তাকে 'রজম' করেছি।[৭৪] ইমাম তাহাবী (র.) জাবির (রা.) এর সনদে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি যেনা করেছিল। রসূলুল্লাহ (স.) কে প্রথমে জানানো হলে প্রথমে তাকে একশ বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু পরে রসূলুল্লাহ্ (স.) কে জানানো হলো যে লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে 'রজম' করা হলো।[৭৫] অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, বিবাহিত ব্যাভিচারীদের শাস্তি রজমই, বেত্রাঘাত নয়। আর এর উপরে ইজমা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রজমের দলীল দ্বারা বেত্রাঘাতের দলীলসমূহ রহিত হয়ে গেছে।

---

৭২. আল-'উকূবাতু ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৭৩. প্রাগুক্ত।
৭৪. প্রাগুক্ত।
৭৫. প্রাগুক্ত।

ব্যাভিচারের শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার শর্তাবলী: ইসলামী আইনে যেনা হলো হদ্দ জাতীয় অপরাধ। পৃথিবীর কোন মানুষই এ অপরাধের শাস্তিতে কম-বেশি বা মাফ করার অধিকার রাখে না। মহান আল্লাহ্ ব্যাভিচারদের জন্য 'হদ্দ' ঘোষণা দিয়ে মানব জাতির কল্যাণসাধন করেছেন। ব্যাভিচারের অশুভ পরিণতি সমাজব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য অপরাধে নেই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তারপর অর্থ-সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এ কারণেই ইসলাম ব্যাভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের চাইতে কঠোরতর করেছে।

ইসলামী আইনে ব্যাভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর হওয়ায় এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীতেও অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এই অপরাধ প্রমাণের জন্য চারজন দেখা সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সন্দেহের কারণে তোমরা হদ্দকে রহিত করে দাও।"[৭৬] যদিও শর্তসমূহের অনুপস্থিতিতে 'হদ্দ' মাফ হয়ে যাবে কিন্তু তাযীর মাফ হবে না। অন্যান্য অপরাধে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ব্যাভিচারের 'হদ্দ' জারী করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী। যদি কোন নারী ও পুরুষের মাঝে যেনা সংঘটিত হয় আর তা সত্য বলে প্রমাণিত হয় তারপরও ব্যাভিচারের এই শাস্তি কার্যকর করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এই শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কেবল শাস্তি কার্যকর করা যাবে, অন্যথায় নয়।

অপরাধী জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হবে: রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তিন ব্যক্তি থেকে আমলনামা লেখার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: (ক) নাবালেগ–যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়: (খ) ঘুমন্ত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (গ) বিবেক-বুদ্ধিহীন পাগল-যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"[৭৭]

অপরাধী মুসলমান হবে: ব্যাভিচারের অপরাধে 'রজম' করার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন অমুসলিম পুরুষ যদি কোন মুসলমান নারীর সাথে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে অমুসলিম পুরুষকে হত্যা করতে হবে। যেহেতু সে অঙ্গীকার ও চুক্তি লংঘন করেছে।[৭৮]

সন্দেহমুক্ত হওয়া: রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "সন্দেহের কারণে তোমরা হদ্দকে রহিত করে দাও।"[৭৯]

বিতর্কিত ফাসিদ নিকাহ্ অজ্ঞতাবশত না হওয়া: শরীয়াতের দৃষ্টিতে যে সমস্ত নিকাহ্ ফাসিদ তা যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হয়ে থাকে তবে এসকল ক্ষেত্রে তাদের উপর 'হদ্দ' এর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদের এরূপ বিবাহের কার্যক্রম হারাম হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত হয়ে থাকে তবে তাদের উপরে 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।[৮০]

---

৭৬. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫২৬
৭৭. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৪০৪, খ. ৪, পৃ. ২৪৪
৭৮. ড. মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬
৮০. মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

বলাৎকারের যেনা না হওয়াঃ যাকে ব্যাভিচারে বাধ্য করা হয়েছে সে শাস্তিযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ্ নারীদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য করতে নিষেধ করে বলেন, "তোমাদের দাসীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব সম্পদের লোভে তাদের ব্যাভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [৮১]

পশুর সাথে যেনা সংঘটিত হওয়াঃ ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, যুফার, মুহাম্মাদ, মালিক এবং উছমান আল-বাত্তা রা. বলেন, পশুর সাথে যেনাকারীর উপর হদ্দ বা যেনার শাস্তি প্রয়োগ হবে না। তবে তাকে তাযীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করতে হবে।"[৮২] ইমাম আওযায়ী রা. বলেন, তার উপর হদ্দ লাগাতে হবে।[৮৩]

সংগমের যোগ্যতাসম্পন্নের সাথে যেনা হওয়াঃ যার সাথে ব্যাভিচার করবে, তাকে সংগমের উপযুক্ত হতে হবে। যদি সে ছোট বালিকা হয়, তাহলে যেনাকারীর উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে না, বরং তার উপরে তাযীরী শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, তেমনিভাবে মেয়েটির উপর কোন শাস্তিই কার্যকর করা যাবে না।[৮৪]

যেনা হারাম হওয়া সম্পর্কে যেনাকারীর অবগত থাকাঃ যদি কোন ব্যক্তি যেনা হারাম হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে আর অজ্ঞতাবশত সে যেনা করে, তবে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।[৮৫]

ইসলামী রাষ্ট্র হওয়াঃ যেনার হদ্দ কার্যকর করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র হতে হবে। কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রই একমাত্র যেনার 'হদ্দ' কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে। অপরাধের শাস্তিসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ্ স. এর যুগে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কখনই কোন 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়নি। অতএব, কেউ ব্যক্তিগত বা সামাজিক পর্যায়ে এ দন্ড কার্যকর করতে পারে না। তবে পিতা-মাতা ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শিক্ষামূলক দন্ডবিধি (তাযীর) কার্যকর করতে পারে, তওবা পড়াতে পারে, উভয়কে লজ্জা দিতে পারে। আর এরূপ কুকর্মে নিরুৎসাহিত করার জন্য অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যাভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্বঃ একজন নারী ও একজন পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই যে যৌন মিলন করে তা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ব্যাভিচার বলা হলেও প্রচলিত আইনে তা কোন ব্যাভিচার বা অপরাধই নয়। প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে ব্যাভিচার (Adultery) ও ধর্ষণ (Rape) এর নিজস্ব সংজ্ঞা ও শাস্তি নির্ধারিত আছে। The Penal Code, 1860 তে ব্যাভিচারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছেঃ "কোন ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্মতি বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যাভিচার বলে।" [৮৬]

---

৮১. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

৮২. আহ্কামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩

৮৩. প্রাগুক্ত।

৮৪. ফিকহুস সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৯; মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

৮৫. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, কাওয়ানিল আহকাম আশ্-শরী'আহ্ ওয়া মাসায়েল আল-ফুরুল ফিকহিয়্যাহ্, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৩৮৫

৮৬. The Penal Code, 1860, Act XLV of 1860, Section 497.

প্রচলিত আইনে ব্যাভিচারের জন্য কেবল পুরুষকে অপরাধী করা হয়। ব্যাভিচারে অংশগ্রহণকারিণী নারীকে ব্যাভিচারের সহযোগী হিসেবে দন্ডিত করা হয় না। ব্যাভিচারী পুরুষের শাস্তি সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড।[৮৭]

প্রচলিত আইনে ধর্ষণ এর সংজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে ১৪ বছরের অধিক বয়সের নারীর সাথে তার সম্মতি ব্যতিরেকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন মিলন হচ্ছে ধর্ষণ।"[৮৮] এ আইনে ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত অপরাধের শাস্তি হলো যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনধিক দশ বছরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড। ধর্ষণের সংজ্ঞায় বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দন্ডবিধি অনুযায়ি ১৩ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সাথে সহবাসও ধর্ষণ। স্বামীর শাস্তি অনধিক ২ বছরের কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড।[৮৯] ব্যাভিচার ও ধর্ষণ সম্বন্ধে উপরোক্ত সংজ্ঞা ও তাদের শাস্তি পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি: **প্রথমত,** প্রচলিত আইনে নারী-পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা বা ব্যাভিচার করলে তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। আর যেনার লাইসেন্স থাকলে এটা কোন অপরাধই নয়। এতে যেনা বন্ধ হওয়ার তো কথাই নয় বরং এতে সমাজে যেনা-ব্যাভিচার বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে ব্যাভিচারীদেরকে যদি শাস্তি প্রদান করা হয় তবে সমাজ থেকে অবশ্যই ব্যাভিচারের মত ঘৃণিত অপরাধ বিদূরিত হবে। ইসলামী আইনে দু'টি মূলনীতি লক্ষ্য করা যায়। আর তা হলো, অপরাধ প্রতিরোধ ও সমাজ রক্ষা করা। তাই ইউরোপ, আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, তাদের সমাজে ব্যাভিচার এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পক্ষান্তরে সৌদি আরব, ইরানসহ যে সমস্ত মুসলিম দেশে ইসলামী আইন চালু আছে সেখানে যেনা-ব্যাভিচারের হার অতি নগণ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানকালের প্রগতিশীল বলে দাবিদার একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলাম প্রবর্তিত ব্যাভিচারের শাস্তিকে বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ তাদের স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নিদেরকে যদি কেউ ধর্ষণ করে তবে সেই অপরাধীকে তারা কঠিন শাস্তি প্রদানের পক্ষপাতী। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাভিচারীদের প্রতি দরদ দেখানোর অর্থ হলো, গোটা সমাজের উপরে জুলুম করা, মানবতাবোধ ও মানব শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করা। এই অপরাধীদের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শন হল কৃত্রিম। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদী। মহান আল্লাহ নিজেই যখন সে সব অপরাধীর জন্য উক্ত শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন বুঝতে হবে, তাদের ও গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই সে শাস্তির ব্যবস্থা তিনি দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফির।"[৯০] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ি ফায়সালা করে না তারাই জালিম।"[৯১] অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ি যারা ফায়সালা করে না তারাই দুর্নীতিবাজ।"[৯২]

---

৮৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, ঢাকা : অরণি প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৪৬২

৮৮. নারী ও শিশু নির্যাতন দমম আইন ২০০০ (২০০০ সালের ৮ নং আইন), ধারা ২ (ঙ)।

৮৯. The Penal Code, 1860, Section 479.

৯০. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪

৯১. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

৯২. আল-কুরআন, ৫ : ৪৭

মহান আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন, তাঁর বান্দাদের জন্য কিসে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব, চরম অহংকারী, জ্ঞানপাপী ও সত্যবিমুখ কোন ব্যক্তিই কেবল এই বাহ্যিক শাস্তির অবস্থা দেখে একে কঠিন ও বর্বরোচিত শাস্তি বলে মন্তব্য করতে পারে। কারণ, এরাতো সেই সব মানুষ যাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি চলছে এবং এর প্রসারের জন্য তারা সামাজিকভাবে সব ধরণের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তাদের মানব প্রকৃতি অধঃপতনের গহ্বরে পতিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত আইনে বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন মিলনকে অবৈধ করা হয়নি। এই আইনে বংশীয় পবিত্রতা ও পারস্পরিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, অবৈধ সন্তান মানবিক অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এবং তার জীবন ধারণ ও লালন-পালনের সুযোগ-সুবিধা তার জন্য সহজ হয় না। তার স্বাভাবিক জীবন পথে অনেক বাঁধা-বিপত্তি ও অপমান এসে দাঁড়ায়। যদিও পিতা-মাতার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তায় না, তবুও সন্তানের জন্য এমন একটি ঠিকানা প্রয়োজন যেখানে তার পিতামাতার অভিভাবকত্ব ও স্নেহ-মমতার স্বাভাবিকত্বে জীবন গড়া সহায়ক হয়। ইসলামী আইন বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া নারী-পুরুষের যৌন মিলন তথা ব্যাভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে পারস্পরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে এবং পবিত্র বংশধারার ধারাবাহিকতা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের যৌন চাহিদা পূরণ এবং বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাচীনকাল থেকে যে বৈবাহিক প্রথা চলে আসছে তা কেবল ইসলামী আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, প্রচলিত আইনে ব্যাভিচারের জন্য শুধু পুরুষের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন নারী যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন মিলন করে সে ক্ষেত্রে নারীকেও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ সমাজের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, যেনা-ব্যাভিচারে নারীদের ভূমিকা রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ তাআলা যিনার শাস্তি বর্ণনায় ব্যাভিচারিণী নারীকে প্রথমে এবং ব্যাভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করে বলেন, "ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।"[৯৩] অতএব, প্রচলিত আইনে ব্যাভিচারিণীদেরকে শাস্তি না দিয়ে শুধু ব্যাভিচারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করায় সমতা বা ইনসাফ করা হয়নি। অথচ ইসলামী আইনে এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে সমান অপরাধী বলে উল্লেখ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে।

চতুর্থত, প্রচলিত আইনে শুধু ধর্ষণকারীকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রচলিত আইনে ধর্ষণকারীকে বিবাহিত বা অবিবাহিত হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তির পার্থক্য করা হয়নি। একজন অবিবাহিত পুরুষ যার জৈবিক চাহিদা মেটানোর কোন উপায় নেই, সে যদি উত্তেজনা বশতঃ বা কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে বিপথগামী হয়, সে অবস্থায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করলে তার সংশোধন হবার সুযোগ থাকে না। ইসলামী আইন এ ক্ষেত্রে অবিবাহিত ধর্ষণকারীকে একশ বেত্রাঘাত দিয়ে তাকে ভবিষ্যতে সংসার গড়ার সুযোগ দিয়েছে এবং তার সংশোধনের পথ খোলা রেখেছে এবং প্রচলিত আইনের তুলনায় তাকে লঘু শাস্তিই দিয়েছে যদিও ইসলামের কোন শাস্তিই আল্লাহর চোখে লঘু বা গুরু নয় বরং যে অপরাধের যে রকম শাস্তি হওয়া উচিৎ সেই শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

---

৯৩. আল-কুরআন ২৪ : ২

পঞ্চমত, প্রচলিত আইনে স্ত্রীর সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিলেও ইসলামী আইন এরূপ কোন কঠোরতা আরোপ না করে বৈবাহিক পবিত্র বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পথকে সুগম করেছে। তাই ইসলামী আইন অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের চেয়ে অধিক যৌক্তিক।

ষষ্ঠত, প্রচলিত আইনে ব্যাভিচারীকে স্বীয় অপরাধের জন্য কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অপরাধী কারাভোগের মাধ্যমে সংশোধিত হয় না। উল্টো, কারাগারে অপরাধীচক্রের সঙ্গে বসবাসের ফলে সে আরো নতুন নতুন অপরাধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফলে পরবর্তীতে তার দ্বারা আরো বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়। উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনায় ইসলামী আইন প্রচলিত আইন থেকে অধিক যুগোপযোগী।

ইসলামী নৈতিকতা ও বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন

সংজ্ঞাঃ পর্ণোগ্রাফি বলতে প্রকাশ্যে যৌনতা উৎপাদন ও প্রদর্শন করাকে বুঝায়। পাশ্চাত্য জগত স্বতন্ত্র শিল্পের দাবি নিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের চিত্তবিনোদনের জন্য আইনের স্বীকৃতিসহ আবির্ভূত প্রকাশ্যে যৌনশিল্প উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাত ও বিপণন করে। এটা সত্য যে, আদিকাল থেকেই নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের উপস্থাপন নানাভাবে হয়েছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্যে নানাভাবে শিল্পসম্মত উপায়ে যৌনতা উপস্থাপিত হয়েছে। যৌনতার শিল্পসম্মত উপস্থাপন শিল্প, সাহিত্য ও জীবনবোধকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু টেলিভিশন, ভিডিও ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর 'প্রাপ্ত বয়স্কদের চিত্তবিনোদন' বা মনোরঞ্জনের কথা বলে পর্ণো ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশে পর্ণোগ্রাফির বিপুল চাহিদা সৃষ্টির পাশাপাশি পর্ণো বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক কার্যকারিতাকে যৌক্তিকভাবে দৃশ্যমান করে তোলা হচ্ছে। অথচ সমাজের ওপর তার ফলাফল মারাত্মক নেতিবাচর। পর্ণোগ্রাফি কোমলমতি শিশুদের সুন্দর মনকে অজ্ঞাতসারে বিষিয়ে তুলছে। পর্ণোগ্রাফির ক্ষতিকর প্রভাবে ধর্ষণ, যৌন অপরাধ এবং নারী-পুরুষের বিপথগামী আচরণ বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও অনেক দিন ধরে অশ্লীল ছবি ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী চলছে এবং মুঠোফোনের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পর্ণোগ্রাফি বা অশ্লীল ছবির উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও প্রদর্শনীকে অনুমোদন করে না। এখানকার জনসাধারণের অধিকাংশের ধর্ম ইসলামে পর্ণোগ্রাফিসহ সব রকমের অশ্লীলতা নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি পরিস্থিতিঃ

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি মহামারী আকার ধারণকরেছে। ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে পর্ণো ভিডিও ও স্থির ছবি আপলোড এবং ডাউনলোড, রাস্তার পাশে প্রকাশ্য পর্ণো সিডি বিক্রি, পত্রিকার দোকানে পর্ণো ম্যাগাজিন বিক্রি এবং মোবাইলের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ায় পর্ণোগ্রাফি এখন খুবই সহজলভ্য হয়ে গেছে। দেশের যুব সমাজের একটি বিশাল অংশ এ ঘৃণ্য কাজটিকে বিনোদন হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পর্ণোগ্রাফির চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশে পেশাদার পর্ণোগ্রাফি-অভিনেত্রী বা তারকা অনুল্লেখ্য; বরং এসব পর্ণোগ্রাফির চিত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, নাট্য ও চিত্র অভিনেত্রী এবং গৃহবধূর সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেম-ভালবাসা থেকে উদ্ভূত বিবিন্ন পরিবেশে মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগে শারীরিক মেলামেশার ভিডিও এবং স্থিরচিত্র ধারণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ বখাটে তরুণরাই তরুণীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মোটা অংকের টাকা আদায় করে। পরে তা তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়ে হয়রানি করে। বিভিন্ন অসাধু মহল ব্যবসায়িক লাভের জন্য কর্মরত নারীদের ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ করে। হয়রানির শিকার এসব নারীকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে হেনস্ত হয়ে কখনো কখনো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন: পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা আইন রয়েছে। ব্রিটেনে 'অবসিনিটি পাবলিকেশনস অ্যাক্ট ১৮৫৭' এর মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম হলো পর্ণোগ্রাফি। তবে শিশু পর্ণোগ্রাফি, প্রপাশবিকতা ও নিষ্ঠুর যৌনতার প্রদর্শনীর ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ওসব দেশের পর্ণোগ্রাফি আইনের সারকথা হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ স্বেচ্ছায় পর্ণোফিল্মে অংশ নিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ ওয়েবসাইট থেকে বা দোকান থেকে পর্ণোগ্রাফির ভিডিও কিনে তা দেখতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকবার পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে প্রণীত আইনকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং যুক্তি পেশ করেছে যে, ওই আইনগুলো নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে মারাত্মক স্ববিরোধিতা রয়েছে। সেখানে একদিকে পতিতাবৃত্তি অবৈধ, অপরদিকে পর্ণোগ্রাফি বৈধ। এ স্ববিরোধিতা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে শিশু পর্ণো নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশ পশ্চিমা প্রভাবে প্রভাবিত অনেক এশিয়ান সমাজ থেকে ও ভিন্ন। এখানে পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণনকে রোধ করার জন্য সরাসরি কোন আইন এতদিন ছিল না। দন্ডবিধি, ১৮৯৮,[১] সিনেমাটোগ্রাফিক অ্যাক্ট, ১৯১৮,[২] সেন্সরশিপ অব ফিল্মস্ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ (সংশোধিত-২০০৬)[৩] ।

---

১. Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860)

২. The Cinematograph Act, 1918. (Act II of 1918). (As amended by the Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1982), aviv-2 [Definitions-2. In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, - (a) 'cassette' means a magazine or container of ferromagnetic recording tapes having the operating charasteristic of being diretly loaded into magnetic tape recording or re producing machine; (b) 'cinematograph' means a composite equipment inluding a vedio-cassette recorder used for production, projection or exhibition of motion picture film; (c) 'film, in relation to a motion picture, means a thin flexible ribbon of transpatent material having perforations along one or both edges and bearing a sensitized layer or other coating capable of producing photographic images; ans includes unexposed film, exposed but unprocessed film and exposed and processed film; (d) 'place' includes a house, building, tent or vessel; (e) 'perscribed' means prescribed by rules made under this Act; and (f) 'video-cassette recorder' means an electromagnetic equipment for recording and reproducing motion picture and sound signals simultaneously on cassette tapes]3 [cinematograph exhibition to be licensed 3. Save as otherwise provided in this Act, ne person shall give an exhibition by means of cinematograph elsewhere than in compliance with any conditions and restrictions imposed by such license.],5. (2) if any person is convicted of an offence punishable under this Act committed by him in respect of any cinematograph, film or cassette, the convicting court may further direct that the cinematograph, film or cassette shall be fortified to the Government]

৩. The Censorship of Films Act, 1963. Act No. XVIII of 1963 (As amended by President's Order No. 41 of 1972, Ordinance No. LVIII of 1982 and act No. 1 of 2006

এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন-২০০৬,[৪] আইনসমূহের কিছু ধারা নিয়ে পর্ণোগ্রাফির উৎপাদন ও বিপণনকে পরোক্ষভাবে মোকাবিলা করা যায়, যা এ ধরণের একটি সামাজিক বিপদকে প্রতিরোধ করার জন্য খুবই অপর্যাপ্ত। ফলে পর্ণোগ্রাফির বিরুদ্ধে এতোদিন সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে আইনগত যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতনে শিকার নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে হাইকোর্টের নির্দেশনা জরুরী বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলার প্রেক্ষিতে ১৪ মে, ২০০৯ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দীকি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে। নীতিমালার ৪ নং ধারায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়-(ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন-শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা; (খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; (গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; (ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; (ঙ) পর্ণোগ্রাফি দেখানো; (চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি; (ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; (জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা; (ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; (ঞ) যৌন হয়রানির কারণে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; (ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) [৮ অক্টোবর ২০০৬ ইং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।] ধারা-৫৭। (১)-(২) [ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দন্ড; ৫৭(১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরণের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বছর কারাদন্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।]

প্রয়োগ করা; (ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।"[৫]

উক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফিকেও নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অবশেষে মে, ২০১১ মন্ত্রিসভার এক নিয়মিত বৈঠকে পর্ণোগ্রাফি তৈরি ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১' শিরোনামে একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়।[৬] পরবর্তীতে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর জাতীয় সংসদের স্পিকারের অনুমতিক্রমে ২৯ জানুয়ারি-২০১২ সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়।[৭] নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে বিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আইন প্রণয়নের কারণ হিসেবে বিলের শুরুতে বলা হয়, পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের ফলে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে এবং বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতেই বিলটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বর্তমানে চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি সংক্রামক ব্যাধির মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পর্ণোগ্রাফি যুব সমাজকে ধক্ষংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর শিকার হয়ে অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে কিন্তু এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় অপরাধ রোধ ও অপরাধীদের বিচার করার সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।" পরে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। অবশেষে ২৮ ফেব্রুয়ারি-২০১২ বিলটি 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২' আইন হিসেবে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে।[৮] নিম্নে আইনটির উপর একটি সার নির্যাস তুলে ধরা হলো।

পর্ণোগ্রাফির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গী, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য বা চলচ্চিত্র, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজুয়াল চিত্র, স্থিরচিত্র, গ্রাফিক্স বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এবং যার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্য নেই; যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বই, সাময়িকী, ভাস্কর্য, কল্পমূর্তি, মূর্তি, কার্টুন বা লিফলেট এবং উল্লেখিত বিষয়াদির নেগেটিভ ও সফট ভার্সন পর্ণোগ্রাফি হিসেবে গণ্য হবে।[৯]

---

৫. যৌন হয়রানিমূলক শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা, ধারা-৪(১)।

৬. প্রথম আলো, পর্ণোগ্রাফির সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ড, ২ জানুয়ারী, ২০১২।

৭. প্রথম আলো, পর্ণোগ্রাফি বিল উত্থাপন, সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর কারাদন্ড, ২৯ জানুয়ারি-২০১২।

৮. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ছোটন মাহমুদ, মতামত: পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১২ সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২; দৈনিক কালের কণ্ঠ, নিজস্ব প্রতিবেদক, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল সংসদে পাশ, সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ড, ২৯ ফেব্রুয়ারি-২০১২।

৯. পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ (২০১২ সনের আইন), ধারা-২

আইনে বর্ণিত অপরাধ ও তার পরিধি: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌনদ্দীপনা সৃষ্টি, ব্যক্তির ইমেজ বা মর্যাদা নষ্ট করার লক্ষ্যে বা অন্যায় লাভ বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত অশ্লীল সংলাপ, প্রকাশনা, পুরুষ বা নারীর নৃত্য, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন, চলচ্চিত্র বা ভিডিও চিত্র তৈরি এ আইনের আওতায় পড়বে। এসব পর্ণো সিডি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, আমদানি-রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শন অপরাধ। আইনের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে, পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শন করা যাবে না।[১০]

গ্রেফতার, পরোয়ানা ও তদন্ত: বিলে বলা হয়েছে, পর্ণো সিডি তৈরির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার ও তার আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে আলামত জব্দ করতে পারবে। এ আইনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সাত দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্ভব না হলে আদালত একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিবে। হাজির না হলে তার অনুপস্থিতিতে বিচার হবে। পর্ণোগ্রাফির অভিযোগ পাওয়া গেলে তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) বা তার সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আরো ১৫ দিন এবং আদালতের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো ৩০ দিন সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।[১১]

অভিযুক্তের আইনগত নিরাপত্তা:

এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য হবে।[১২] কেউ এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে।[১৩] এছাড়া আইনে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরকারীর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।[১৪]

বিচার ও শাস্তি:

পর্ণোগ্রাফির অপরাধের আইন দ্রুত বিচার আইন-২০০২ এর ধারা-৪ সংজ্ঞানুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হবে। বিচার প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য হিসেবে তল্লাশিকালে জব্দকৃত সফট কপি, রূপান্তরিত হার্ডকপি, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, কম্পিউটার বা অন্য কোন ডিভাইস, এক্সেসরিজ, মোবাইল ফোনের সিম, যন্ত্রাংশ, অপরাধ কাজে ব্যবহৃত অন্য কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম বা বস্তা আদালতে উপস্থাপন করতে হবে।[১৫] কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন বা এ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করে চুক্তিপত্র তৈরি করলে অথবা কোন নারী-পুরুষ বা শিশুকে প্রলোভন দিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির, ভিডিও বা চলচ্চিত্র ধারণ করলে সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম

---

১০. প্রাগুক্ত, ধারা-৪।

১১. পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ (২০১২ সনের ৯ নং আইন), ধারা-৫।

১২. প্রাগুক্ত, ধারা-১০

১৩. প্রাগুক্ত, ধারা-১২

১৪. প্রাগুক্ত, ধারা-১৩

১৫. প্রাগুক্ত, ধারা-৬

কারাদন্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তি-মর্যাদা হানি করলে বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোন সুবিধা আদায় বা কোন ব্যক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোন পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে মানসিক নির্যাতন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি সরবরাহ করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।[১৬]

কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে গণউপদ্রব সৃষ্টি করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি পর্ণোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, সরবরাহ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যে কোন প্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করলে; অথবা এরূপ কোন কার্য সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।[১৭] সর্বোপরি এ আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা সহায়তাকারী ব্যক্তি প্রত্যেকেই একই দন্ডে দন্ডিত হইবেন।[১৮]

শিশুদের ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ শাস্তি:

শিশুদের ব্যবহার করে পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন ও বিতরণকারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এদের জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার বিধান রয়েছে।[১৯]

পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে ইসলামী নৈতিকতা

পর্ণোগ্রাফি একটি সর্বজন স্বীকৃত অশ্লীলতা। মানব সমাজকে পুতঃপবিত্র এবং বিশৃঙ্খলামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামে সকল প্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করেছেন–যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ্, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।"[২০] আল্লাহ্ সকল ধরণের অশ্লীলতা পরিহারের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার

---

১৬. প্রাগুক্ত, ধারা-৮ (১), (২) ও (৩)।

১৭. পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ (২০১২ সনের ৯ নং আইন), ধারা-৮ (৪) ও (৫) এর উপধারা ক, খ ও গ।

১৮. প্রাগুক্ত, ধারা-৮ (৭)

১৯. প্রাগুক্ত, ধারা-৮ (৬)

২০. আল-কুরআন, ৭:৩৩

আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।”[২১] পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতিসমূহ অশ্লীল কাজ সম্পাদন করে তা আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিত। তাই আল্লাহ্ বলেন, “আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।”[২২]

“তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে, আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর যা তোমরা জান না?”[২৩] আল্লাহ মুসলিম জাতিকে মন্দ কাজ থেকে কেবল দূরে থাকতে আদেশই প্রদান করেননি বরং এসব অশ্লীল কাজ থেকে জাতিকে দূরে রাখতে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন, “আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহব্বান করবে, নির্দেশ করবে সৎ কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেক। আর তারাই হল সফলকাম।”[২৪]

অন্যত্র এ কাজকে মুমিনদের পারস্পরিক দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলেন, “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৫] আর এর উল্টো চরিত্রকে মুনাফিকদের কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ সম্পর্কে বলেন, “মুনাফিক নর-নারী একে অপরের অনুরূপ; তারা পরস্পরকে অসৎকর্মের আদেশ দেয় এভং সৎকর্মে নিষেধ করে।”[২৬] আল্লাহ ‘আমর্ বিল মা’রূফ’ এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ) কে মু’মিন ও মুনাফিকদের সাথে পার্থক্যকারী নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ফলে কোন মুসলিম অশ্লীল কোন কাজে জড়িত হওয়া তো দূরের কথা, বরং অশ্লীল কাজে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো তার দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, “তোমাদের কেউ অন্যায়-অশ্লীল কর্ম দেখলে তা শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি সমর্থ না হয় তাহলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে। এতে ও সমর্থ না হলে বিবেক দ্বারা প্রতিহত

---

২১. আল-কুরআন, ১৬:৯০
২২. আল-কুরআন, ৫:৬৫
২৩. আল-কুরআন, ৭:২৮
২৪. আল-কুরআন, ৩:১০৪
২৫. আল-কুরআন, ১৬:৯০
২৬. আল-কুরআন, ৯: ৬৭

করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[২৭] ফলে ইসলাম প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "লজ্জাকর কাজে জড়িও না, সে প্রকাশ্যেই হোক আর গোপনে।"[২৮] ফলে অশ্লীল কর্ম সমাজে ছড়িয়ে দেয়াও মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ বলেন, "যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[২৯] কোন নারীকে কটু কথা বলা, খারাপ ইশারা-ইঙ্গিত করা, হয়রানি করা, গালি দেয়া, ঢিল মারা, পথ রুদ্ধ করা যেমন অশ্লীল কাজ তেমনি নারী-পুরুষের বিকৃত স্থির ছবি বা নগ্ন ভিডিও ধারণ ও ছড়িয়ে দেয়াও কিংবা দেখা ও অশ্লীল কাজ। রসূলুল্লাহ্ (স.) সবধরণের অশ্লীল কাজকে নিষেধ করে বলেন, "অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার প্রসার কোনটির স্থান ইসলামে নেই। নিশ্চয়ই ইসলামে সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে সেই যার স্বভাব-চরিত্র সবার চাইতে সুন্দর।"[৩০] ইসলাম এ অপরাধকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পাশাপাশি এ অপরাধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অযাচিত ও রুচিহীন কয়েকটি কর্মকেও নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে ইসলামের ঐতিহাসিক বিধি-বিধানের প্রায়োগিক দিকসমূহ তুলে ধরা হলো-

স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্তিপূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থাপনা:

ইসলামে বিবাহবন্ধনকে সুস্থ জীবনযাপনের আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদেরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের ও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৩১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যৌনতার একমাত্র বৈধ পন্থা হিসেবে বিবাহ বন্ধনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, যার মধ্যে নারী-পুরুষের জন্য পারস্পরিক স্বচ্ছন্দ এবং প্রশান্তি রয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে ইসলাম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করে এবং তা সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিবাহকেই একমাত্র যৌনতা নিয়ন্ত্রণের সঠিক পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে, কারণ তা দৃষ্টিকে নত করে এবং যৌনাঙ্গকে পবিত্র রাখে।"[৩২] পরস্পরের আচরণ সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ উত্তম।"[৩৩] এ ক্ষেত্রে কখনও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার

---

২৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: বায়ানু আন্নাহই আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযীদু ওয়া ইয়ানকুসু, বৈরূত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা. বি. পৃ. ৪৬

২৮. আল-কুরআন, ৬:১৫১

২৯. আল-কুরআন, ২৪: ১৯

৩০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাহ্ আল-মুবাশশিরীনা বিল জান্নাহ্, অনুচ্ছেদ: আউয়ালু মুসনাদিল বাসরিয়্যিন, বৈরূত : দারু এহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী, তা. বি. পৃ. ৫২১৩

৩১. আল-কুরআন, ২৪:৩২

৩২. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম। অধ্যায়: আন নিকাহ্, অনুচ্ছেদ: ইসতিহরা নিকাহ্ লিমান তাকাত নাফসূহু ইলাহি, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭২

৩৩. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়: আর-রিদাআ, অনুচ্ছেদ: মা জায়া ফি হাক্কিল মার'য়া আলা ঝাওজিহা, বৈরূত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী, তা. বি, পৃ. ৪৪২

সমাধান হবে কিভাবে তিনি তার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রসূলূল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস ভাল লাগবে।"[৩৪] ইসলামে পরিবারই যেহেতু যৌন চাহিদা পূরণের একমাত্র ক্ষেত্র তাই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের যৌন চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তখন সে যেন পরিপূর্ণভাবে সহবাস করে। আর তার যখন চাহিদা পূরণ হয়ে যায় এবং তার স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ থাকে তখন সে যেন তাড়াহুড়া না করে।"[৩৫] এভাবে ইসলামে স্ত্রীর যৌন অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে স্বামীকে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধে শাসকের কাছে অভিযোগ করার অনুমতি ও দেয়া হয়েছে। আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.) এর স্ত্রী মলিন বদন এবং পুরাতন কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর স্ত্রীদের কাছে এলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, এতে আমার কী হবে? কেননা, আমার স্বামীর রাত কাটে নামাজে আর দিন কাটে রোযায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলূল্লাহ্ (স.) এর স্ত্রীগণ বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। উসমান ইবনে মাযঊন (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বললেন, "আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই?" উসমান (রা.) বললেন, কী বলেন হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তখন তিনি বললেন, "তবে কি তোমার রাত নামাজে আর দিন রোজায় কাটে না? অথচ তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে, তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে। তুমি নামাজও পড়বে আর ঘুমাবেও। রোযাও রাখবে আবার ভাঙবেও। তিনি বললেন, তারপর আরেকদিন তার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধি মাখা অবস্থায় এলেন যেন নববধূ।"[৩৬]

আবু জুহাইফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) সালমান এবং আবু দারদা রা. এর মাঝে ভাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সালমান আবু দারদা (রা.) এর সাক্ষাতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদা (রা.) কে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাকে তার ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, খাবার গ্রহণ কর, কারণ আমি রোযা আছি। সালমান (রা.) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাচ্ছি না। কাজেই আবূ দারদা (রা.) খেলেন। যখন রাত হলো, আবু দারদা (রা.) উঠে পড়লেন। সালমান (রা.) বললেন, 'ঘুমাও।' তিনি ঘুমালেন। পুনরায় আবূ দারদা উঠলে সালমান (রা.) তাকে বললেন, 'এখন ওঠো।' কাজেই তারা উভয়ে নামাজ পড়লেন এবং সালমান (রা.) আবূ দারদাকে বললেন, 'তোমার উপর তোমার রবের অধিকার রয়েছে; তোমার উপর তোমার আত্মার অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে; কাজেই প্রত্যেককে তার

৩৪. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আর-রিদা'আ, অনুচ্ছেদঃ আল-ওয়াসিয়াতু বিন নিসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৯৯৪

৩৫. আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, অধ্যায়ঃ আল-নিকাহ্, অনুচ্ছেদঃ আল-ক্বাওলু 'ইনদাল জিমা'আ ওয়া কাইফা ইয়াসনা'উ ওয়া ফাযলুল জিমা'আ, বেরূতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৩ হিজরী. পৃ. ১৮৫৫

৩৬. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিবক্ষান, সহীহ্ ইবনে হিবক্ষান, অধ্যায়ঃ আল-বির ওয়াল ইহ্সান, পরিচ্ছেদঃ মা জায়া ফিত ত্বয়াত ওয়া সাওয়াবিহা, বৈরূতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১

প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিৎ।' পরে আবু দারদা রা. রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, 'সালমান যথার্থই বলেছে।'[৩৭] বাস্তবেই ইসলাম নারী ও পুরুষের যৌন জীবনকে পারিবারিক বন্ধনের সীমারেখায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ করতে নির্দেশনা প্রদান করে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে: স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, স্বামীদের প্রতি বিনম্র সংবেদনশীল, যারা যখন কষ্ট পায় বা কষ্ট দেয়, স্বামীর নিকট এসে হাত ধরে এবং বলে, আল্লাহর শপথ! তুমি প্রফুল্লচিত্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুর স্বাদ নেব না।"[৩৮]

বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ:

ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "সে যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎকাজ কামনা করল ও দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, 'আস'। সে বলল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি আমার প্রভূ; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। সে নারী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেত। আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।"[৩৯]

বস্তুতই যুগে যুগে বিকৃত চিন্তা-চেতনার অনুসারী কিছু সংখ্যক লোক শয়তানের প্ররোচণায় নানা রকম অসামাজিক, অশ্লীল এবং পাশবিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্কও তেমনি একটি ঘৃণিত অশ্লীল অপরাধ। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ইমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দকাজের আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, শোনেন।"[৪০]

---

৩৭. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়: আয-যুহূদ, পরিচ্ছেদ: মা জাআ ফি হিফযিল লিসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৩।

৩৮. ইমাম নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, অধ্যায় : 'ইসতিন নিসা, পরিচ্ছেদ: আল-মুলাইবাতি, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯১, পৃ. ২৫০৫।

৩৯. আল-কুরআন, ১২ : ২৩-২৪

৪০. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার মন্দ, দোষণীয়, অশ্লীল ও অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে বিবাহের প্রস্তাবদান ও তা গ্রহণ করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই বিবাহের আগে সামান্য সম্পর্ক রাখাও বৈধ নয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "আমি যখন কোন একজন যুবক ও যুবতীকে নির্জনে একত্র দেখি তখন আমি বিশ্বাস করি না যে, শয়তান তাদের প্ররোচনা দেয় না।"[৪১] কাজেই শুধু এনগেজমেন্টের কারণেও তারা পরস্পর নির্জনে মিলিত হতে পারে না। কেননা, পরস্পর মেলামেশা, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে অনৈতিক ভাব সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ কর না, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়।"[৪২] কাজেই শুধু এনগেজমেন্ট হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গণ্য তো হয় না অথচ এমতাবস্থায় কখনো কখনো তাদের মাঝে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ব্যাভিচার নিষিদ্ধকরণ:

ইসলাম অশ্লীল কাজ হিসেবে ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ করেছে। এ অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী–এদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।"[৪৩] আল্লাহ্ লজ্জাস্থান হেফাজতকারীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী নারী-পুরুষ–তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৪৪] তাই আল্লাহ্ ব্যাভিচারকে শুধু নিষিদ্ধই করেননি; বরং ব্যাভিচাররের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "ব্যাভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[৪৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তাআলা (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (সেই সাত শ্রেণীর একজন হল) যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী তার সাথে দৈহিক সম্পর্কের আহক্ষান জানায় আর ঐ ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে।"[৪৬] সুতরাং যৌনসংগমকালীন কোন স্থিরচিত্র বা ভিডিও দেখাও ব্যাভিচারে জড়ানোর গুনাহের মত। পর্ণোগ্রাফি ছবি বা অশ্লীল সিনেমা দেখাও ব্যাভিচারের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায়

---

৪১. ইমাম বায়হাক্বী, আস-সুনান আল-কুবরা, অধ্যায়: আল-অসায়া, পরিচ্ছেদ: জিমা'উ আবওয়াবিত তারগীব ফিন নিকাহ্, বাবু তাখসিসিল ওয়াজহি ওয়াল কাফফাইন বি যাওয়াযিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮০।

৪২. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩২

৪৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২

৪৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৪৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৪৬. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: আল-যাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাদলু ইখফাইস সাদাকাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮।

নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, চোখের যিনা দেখা, কানের যিনা শোনা, মুখের যিনা কথা বলা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা পথ চলা।"[৪৭] চোখের মাধ্যমে ব্যক্তি নারীর সৌন্দর্য ও রূপ উপভোগ করে। পরবর্তীতে এরূপ কাজের প্রতি অন্তরে ভাবের সৃষ্টি হয়। আর এ পথ ধরেই শুরু হয় অশ্লীলতা।

ড. মুজাম্মিল সিদ্দিকী বলেন, "পর্ণোগ্রাফির সিনেমা দেখা, এরূপ গান শোনা কিবা গাওয়া, কারো হাত-পা এরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এসব কাজই এমন অপরাধ যা ব্যাভিচার সংশ্লিষ্ট এবং ব্যাভিচারের চূড়ান্ত কাজটি অবৈধ সংগমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।"[৪৮]

সুতরাং পর্ণোগ্রাফিক ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করাও নিষিদ্ধ। কেননা, মুসলিমদের সর্বসময় দৃষ্টি অবনত করার আদেশ করা হয়েছে যেন সে অন্য কারো গোপন অঙ্গ দেখা থেকে বিরত থাকে।

সমকামিতা নিষিদ্ধকরণ:

ব্যাভিচারের আরেকটি বিকৃত রূপ হচ্ছে সমকামিতা। মানব সভ্যতার উন্নয়নে সমকামিতা এক বড় অন্তরায়। কুরআন ও হাদীসের নানা স্থানে সমকামিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনের সাত জায়গায় লূত আ. এর জাতির কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে সমকামিতার অপরাধের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংস করে দেন।[৪৯] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে তার জাতিকে বলল, 'তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো বাসনার বশে নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের নিকটে গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘন করছ।"[৫০] "তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌন কামনা পূর্ণ করছ? তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়।"[৫১] পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "নির্লজ্জতার কাছে ও যেও ন। প্রকাশ্যে হোক কিবা অপ্রকাশ্যে।"[৫২]

'সমকামিতা' যে মারাত্মক ধরণের সীমালঙ্ঘন এবং অশ্লীল কাজ তা পবিত্র কুরআনের (৭ : ৮০, ৮১) এবং (২৬ : ১৬৬) আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া আছে। সে সাথে দুষ্কৃতিকারী এবং (২৯:৩১) আয়াতে জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই 'সমকামিতা'কে ব্যাভিচারের সাথে সম্পৃক্ত না করে সন্ত্রাস বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কারণগুলোর সাথে বিবেচন করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

---

৪৭. ইমাম আহমাদ্ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাহ্ আল মুবাশশিরীনা বিল জান্নাহ্ - মুসনাদু আবি হুরাইরাহ্ রা. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯২।

৪৮. Dr. Muzammil Siddiqi, æThis means that watching pornographic movies, listening to such songs or singing them, using one's hands and feet for this purpose, all these are sins that are related to Zina and then the final act of Zina takes place through haram intercourse." http:// www. soundvision.com/info/life/porn/isporn.asp, accessed on 15th March 2012.

৪৯. সূরা আল-আরাফের ৮০-৮৪ আয়াত, সূরা হুদ এর ৭১-৮৩ আ্য়াত, সূরা আল-আম্বিয়া এর ৭৪ আয়াত, সূরা আল-হাজ্জ এর ৪৩ আয়াত, সূরা আশ-শুয়ারা এর ১৬৫-১৭৫ আয়াত, সূরা আন-নমল এর ৫৬-৫৯ আয়াত, সূরা আনকাবুত এর ২৭-৩৩ আয়াত।

৫০. আল-কুরআন, ৭ ;৮১

৫১. আল-কুরআন ২৭ :৫৫

৫২. আল-কুরআন ৬:১৫১

ইসলামী চিন্তাবিদগণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস ও সীরাত থেকে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর কয়েকটি হাদীসে সমকামিতাকে অভিশাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দু'জনের জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তি ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কোথাও তুমি মানুষদেরকে লূতের জাতির মত পাপ করতে দেখলে তাকে হত্যা করবে। যে এটা করে এবং যে এটাতে সাহায্য করে দুই জনকেই হত্যা করো।"[৫৩]

ইমামগণ সমকামিতার শাস্তি বর্ণনায় বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম দেশে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় এবং শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সৌদি আরব, ইরান, মৌরিতানিয়া, উত্তর নাইজেরিয়া, সুদান, ইয়েমেনে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আফগানিস্তানে সমকামিতার শাস্তি হিসেবে জেল, অর্থদন্ড ও শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়। মিশরে সমকামিতার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। কিন্তু সমকামিতা সেখানে বৈধ নয়। এর জন্য শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা রাখা হয়েছে।

নারী-পুরুষের গোপনাঙ্গ দেখা নিষিদ্ধকরণ:

পোশাক পরিধান করা মানব সভ্যতার পরিচায়ক। আল্লাহর শত্রু শয়তান আদম আ. ও হাওয়া আ. কে আল্লাহর আদেশ লংঘনে প্রলুব্ধ করে উভয়কে বিবস্ত্র করার মাধ্যমে তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, "হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে না ফেলে যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানদেরকে আমি যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।"[৫৪] পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষ উভয়কে পোশাক পরিধানের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে এবং তাকওয়ার পোশাক–এটি সর্বোত্তম ।"[৫৫]

নারী-পুরুষের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীন ও মার্জিত পোশাকই তাকওয়ার পোশাক। আল-কুরআনে সূরা আন-নূর ও সূরা আল-আহযাবে মুসলিম নারীদের জাহেলি যুগের ন্যায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শন করে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় চাদর দিয়ে নিজেদের দেহকে আবৃত করে রাখতে বলা হয়েছে। এ সব আদেশের ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষেত্রে নারীদের ঘরে আটকে রাখার কথা বলা হয়নি; বরং তাদের সৌন্দর্য আবৃত করে রাখার কথা বলা হয়েছে। ঘরের বাইরে পুরুষদেরও নগ্ন হওয়ার জাহেলী নিয়ম-কানুন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

নারী ও পুরুষ উভয়কেই নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা আন্-নূরের ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, "দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি নজর দেয়া শরীয়াতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ।"[৫৬] ইবনে কাসীর

---

৫৩. ইমাম ইবনে মাজাহ্, আস সুনান, অধ্যায়: আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ: মান আমিলা আমলা কাওমি লূত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

৫৪. আল-কুরআন, ৭ : ২৭

৫৫. আল-কুরআন, ৭ :২৬

৫৬. আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাবী, মা'আলিমুত-তানযীল, আল-কুরআন: ২৪:৩০ এর তাফসীর, বৈরূত : দারুল মা'আরেফা, ১৯৮৭, খ. ৪, পৃ. ৩৩

এবং ইবনে হাইয়্যান এ তাফসীরই করেছেন। নারীর প্রতি দৃষ্টি নিষিদ্ধ। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি চোখ রাখাও এর অন্তর্ভূক্ত। তবে অবশ্যই চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ দেখা ব্যতিক্রম। এছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তাঁর গৃহে উঁকি মেরে দেখাও এর অন্তর্ভূক্ত। যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যতগুলো পথ আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গ সংযত রাখা। এ আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যাভিচার।[৫৭] রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "দুই চোখ ব্যাভিচার করে। চোখের ব্যাভিচার হচ্ছে দেখা।"[৫৮]

এ দুটিকে স্পষ্টত: উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যে নারী স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে পোশাক ছেড়ে অনাবৃত হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে সে মূলত আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "কোন নারী বাড়িতে স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সামনে পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয়ে কাউকে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করলে সে যেন আল্লাহ্ ও তার মধ্যকার বন্ধন পর্দাকে ভেঙ্গে ফেলল।"[৫৯] এর মাধ্যমে মূলত স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী হয়ে নিজেকে অপমানিত করে। ফলে আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এমন নারী আল্লাহর রহমান থেকে বঞ্চিত হবে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "দুই শ্রেণীর দোযখবাসীকে আমি এখনও দেখিনি, তাদের এক শ্রেণীর হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে এবং ঐ সব স্ত্রীলোক যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। পর-পুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথা বড় উটের কুজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৬০] কারণ তারা তাদের দেহের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যুব সমাজের যৌন অনুভূতিতে এমন এক সুড়সুড়ি তৈরি করে, যা এক প্রকার যৌন প্রতারণা।

নারী-পুরুষের উগ্র চালচলন সমাজে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে নারীদেরকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে, "প্রত্যেক চোখ যেনা করে। মেয়েলোক যখন সুগন্ধি মেখে কোন বৈঠকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, সেও যিনাকারিণী।"[৬১] যে নারী অনিয়ন্ত্রিত নগ্ন জীবন যাপন করে, সে শুধু নিজের সর্বনাশই করে না, তার চালচলনের প্রভাব তার ভবিষ্যৎ বংশধরের ওপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই পড়ে। ইসলাম জাহিলী যুগেও অন্যান্য জাতির নারীদের এ নগ্নপনাকে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[৬২]

---

৫৭. সংক্ষেপিত ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, মিশরঃ মুআসসাসাহ্ করডোবা, ২০০০, খ. ১০, পৃ. ২১২-২১৭

৫৮. ইবনুল জাওযী,যাম্মুল হাওয়া,অধ্যায়:আল-আদাব,পরিচ্ছেদ: মা যাআ ফি দুখুলিল হাম্মাম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৫

৫৯. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: মা জাআ ফি দুখুলিল হাম্মাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩২

৬০. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: আল লিবাস ওয়ায ঝীনাহ্, পরিচ্ছেদ: আন নিসা আল কাসিয়াত আল-আরিয়াত আল-মায়িলাত আল-মুমীলাত, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১১৪।

৬১. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: মা জায়া ফি কারাহিয়্যাতি খুরুযিল মারআ মুআত্তারাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৮

৬২. ইমাম আবূ দাঊদ, আস সুনান, অধ্যায়: আল-হাম্মাম, পরিচ্ছেদ: আদ দুখূল ফিল হাম্মাম, সিরিয়া: দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ১০৭৯

একইভাবে তা পুরুষের বেলায়ও প্রযোজ্য। পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। আসহাবে সুফফার সদস্য যারহাদ রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের সামনে বসা ছিলেন তখন আমার উরু উন্মুক্ত ছিল। তিনি বলেন, তুমি কি জান না যে, উরুও গোপন অঙ্গ?"[৬৩] মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বহন করে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার কাপড় পড়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার কাপড় ধর, নগ্ন হয়ে পথ চলবে না।"[৬৪] পুরুষের সতর নাভী হতে হাটু পর্যন্ত। তবে গোসলের সময় পুরুষরা উল্লেখিত অঙ্গ খোলা রাখতে পারে। তবে পর্দার আড়ালে গোসল করা উত্তম। ইয়ালা ইবনে মুররা রা. বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.) খোলা স্থানে এক ব্যক্তিকে গোসল করতে দেখলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে মসজিদের মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব, যখন তোমাদের কেউ গোসল করে, তখন সে যেন পর্দা করে।"[৬৫]

বাহয ইবনে হাকীম (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী এবং তোমার ক্রীতদাসীদের ছাড়া সবার দৃষ্টি থেকে তোমার গোপনাঙ্গকে সংরক্ষণ করবে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষ লোকেরা একত্রে অবস্থান করলে? তিনি বললেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন তোমার আবরণীয় স্থান না দেখতে পারে সেই ব্যবস্থা কর। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো লজ্জা করার ক্ষেত্রে বেশি অধিকারী।[৬৬]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেছেন, দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "হঠাৎ কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।[৬৭] আলী (রা.) এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দৃষ্টি গোনাহ।[৬৮] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার যোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন পুরুষ অপর কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গ এবং কোন নারী অপর কোন নারীর গুপ্তাঙ্গ দেখবে না। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অন্য পুরুষের ও কোন

---

৬৩. ইমাম দারেমী, আস সুনান, অধ্যায়ঃ আল-ইসতিযান, পরিচ্ছেদঃ ফী আন্নাল ফাখযা 'আওরাহ্, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১৪০৭, পৃ. ৬১৩

৬৪. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়ঃ আল-হাম্মাম, পরিচ্ছেদঃ মা জায়া ফিত তা'আররুয়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১

৬৫. ইমাম নাসায়ী, আস-সুনান আস সুগরা, অধ্যায়ঃ আল গুসল ওয়াত তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদঃ আল ইসতিতার 'ইনদাল ইগতিসাল, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৪, পৃ. ১০৪।

৬৬. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, অধ্যায়ঃ আল আদাব, অনুচ্ছেদঃ বাবু মা জায়া ফি হিফযিল আওরাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৩

৬৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ বাবু নাযরিল ফাযাআহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১০

৬৮. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, অধ্যায়ঃ আল-আদাব, অনুচ্ছেদঃ মা জায়া ফি হিফযিল আওরাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৫

নারী অপর কোন নারীর সাথে এক কাপড়ে শয়ন করবে না।”[৬৯] তাছাড়া কোন নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা দিতে অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) কোন ব্যক্তির একান্ত পারিবারিক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, “কেউ যদি তোমার গৃহে অনুমতি ব্যতীত হঠাৎ করে উপস্থিত হয় তবে তুমি যদি তাকে কোন পাথর নিক্ষেপ কর, যাতে তার চোখ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে। এতে তার কোন অপরাধ হবে না।”[৭০]

অশ্লীলতা প্রতিরোধে মদ নিষিদ্ধকরণ:

মদ মানুষের মৃত্যুসহ বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের ভয়ংকর দুর্দশার কারণ। সমাজের অসংখ্য সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে মদ। অপরাধ প্রবণতার তীব্র ঊধর্ক্ষগতি, ক্রমবর্ধমান মানসিক বিপর্যয় এবং সংসার ভাঙ্গনের জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে। কুরআনে মদ পানের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, “হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, পাশা খেলা ও তীর ছুঁড়ে ভাগ্য জানা এগুলো শয়তানের নিকৃষ্ট ধরণের জঘন্য কারসাজি। এসব পরিহার কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।”[৭১] মানুষ যখন মদ পান করে, তখন তার বিবেকবোধ স্থবির হয়ে পড়ে। মদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, “মদ সকল মন্দ ও অশ্লীলতার উৎস এবং যাবতীয় মন্দের মধ্যে ওটা সর্বনিকৃষ্ট।”[৭২] আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, “মদের জড়িত এমন দশ শ্রেণীর লোকদের ওপরে আল্লাহর অভিশাপ। তারা হলো, (১) যারা তা তৈরি করে, (২) যাদের জন্য বানানো হয়, (৩) যারা পান করে, (৪) যারা বহন করে এক জায়গা থেকে অন্য আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, (৫) যাদের জন্য নিয়ে আসা হয়, (৬) যারা পরিবেশন করে, (৭) যারা বিক্রি করে, (৮) যারা বিক্রয়লব্ধ টাকা ব্যবহার করে, (৯) যারা কেনে এবং (১০) যারা অন্য একজনের জন্য কেনে।[৭৩]

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতে বারণই করেনি; অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম মনে করে, দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়। কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের উপরে একপ্রকার এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে মনে করে, যার ফলে তারা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে মনে করে অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। ইসলাম পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দের সাথে তার কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। তাই পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান করেছে।

---

৬৯. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, অধ্যায়: কিতাবুল হাম্মাম, পরিচ্ছেদ: মা জায়া ফিত তা‘আররুয়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮১

৭০. ইমাম তাবারানী, আল-মু‘জাম, অধ্যায়: রিওআয়াতুহু আনিল মাক্কীয়্যীন, পরিচ্ছেদ: শুআইবুন আন আবিয যিনাদ আবদিল্লাহ, বৈরুত, মুআসসাহতুর রিসালাহ্, ১৯৮৪, পৃ. ১০১০

৭১. আল-কুরআন, ৫: ৯০

৭২. ইমাম দারু কুতনী, আস সুনান, অধ্যায়: আল-আশরিবাহ্ ওয়া গাইরিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

৭৩. আবূ আব্দুল্লাহ্ আন-নিশাপুরী, আল মুসতাদরাক ‘আলাস-সাহিহাইন, অধ্যায়: আল-আত‘ইমা, পরিচ্ছেদ: ইন্নাল্লাহা লা‘আনাল খামরা ওয়া শারিবিহা, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৮১৫

অশ্লীলতা প্রতিরোধে পর্দার ব্যবস্থাঃ

পর্দাহীনতা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে কিভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্তুতে পরিণত করেছে তা চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি সবকিছুর পেছনেই একটি প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা। আল্লাহ্ নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে অশ্লীলভাবে ঘোরাফেরা করো না।"[৭৪] আল্লাহ্ পুরুষ এবং নারীদের সমবেতভাবে পর্দার আদেশ দিয়ে বলেন, "মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৫]

তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাঃ

বর্তমান যুগে বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে নারীকে তাঁর নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনারয় অধিকতর যোগ্য বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে ও পারে। অর্থনৈতিক চাকচিক্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আধুনিক বিশ্বের নারীদের ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে নারীকে কেন্দ্র করে পর্ণোগ্রাফি তৈরি করে বিভিন্ন দেশে পর্ণোগ্রাফির বিপুল চাহিদা তৈরি করছে। পর্ণো বাণিজ্যের সম্প্রসারণ লক্ষ্যে পৌঁছতে ইতোমধ্যে এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে। সারা বিশ্বের দেশে দেশে পর্ণোগ্রাফি থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে তিন হাজার ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় আড়াই লাখ টাকারও বেশি পর্ণোগ্রাফির পেছনে ব্যয় হচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে পর্ণোইন্ডাস্ট্রি বিশ্ব অর্থনীতিতে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পর্ণোশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ২০০৬ সালে চীনে ২৭.৪০ বিলিয়ন ডলার আয় করেছেন, যদিও পর্ণোগ্রাফির উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও

৭৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩

৭৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

বিপণন চীনে আইনত নিষিদ্ধ। ২০০৬ সালে পর্ণোগ্রাফির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার, জাপানে ১৯.৯৪ বিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩.৩৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে।[৭৬] নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে যথেচ্ছভাবে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং পর্ণোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ।[৭৭]

নানামুখী তৎপরতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থাসহ পৃথিবীব্যাপী নারী এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। নারী-নির্যাতন, শিশু হত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, লিভ টুগেদার, মাদকাসক্তি, কুমারী-মাতৃত্ব ইত্যাদি সমস্যা পাশ্চাত্য সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি তৈরি ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করে 'পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২' শিরোনামে প্রণয়ন সময়োচিত সিদ্ধান্ত। আইনটি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতা হিসেবে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ বলে উল্লেখ করা হয়। পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শনের ফলে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে, বিবিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, বর্তমানে চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি মারাত্মক ব্যাধির মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। নারী-পুরুষ, শিশু ও যুব সমাজকে সামাজিকভাবে সুরক্ষা দেয়ার বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনটি প্রণয়নের প্রাসঙ্গিকতায় প্রকৃত অর্থে ইসলামের শাশ্বত নৈতিকতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে। অশ্লীলতার সকল দুয়ার উন্মুক্ত রেখে শুধু আইন করে অশ্লীলতাকে রোধ করা যায় না। পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মননে ধর্মীয় মূল্যবোধ অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে। একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন পর্ণোগ্রাফি নামক মহামারী থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে পারে।

---

৭৬. শেখ হাফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাবিদ্যালয়, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগটি ভালো, তবে................ দৈনিক প্রথম আলো, তারিখ: ০৮-০১-২০১২

৭৭. দৈনিক জনজন্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "আমেরিকার মেয়েরা যৌন-আবেদনময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে। তাদের সামনে যেসব পণ্য ও ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তার যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান প্রচার মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের যৌন ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে। আমেরিকান সাইক্যালজিকাল এসোসিয়েইশন (এ পি এ) টাস্ক ফোর্স অন দ্য সেক্সুয়ালাইজেইশন অব গার্লজ এ সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। রিপোর্ট প্রণেতাগণ বলেন, টিভি শো থেকে ম্যাগাজিন এবং মিউজিক ভিডিও থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত প্রতিটি প্রচার মাধ্যমেই এই চিত্র দেখা যায়। রিপোর্ট প্রণেতাদের মতে, যৌনরূপদান তরুণী ও মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো পেটের গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং মনমরা ভাব। লিজ গুয়া নামের একজন মহিলা বলেন যে তিনি তার আট বছরের মেয়ে তানিয়ার উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো খুবই আঁটসাঁট, নয়তো খুব ছোট। যৌন আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ ধরণের পোশাক তৈরি করা হয়।"

সুপারিশমালা:

এক. পর্ণোগ্রাফি আয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা হয় পর্ণোগ্রাফি বিজনেসের মাধ্যমে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী একে মানবাধিকার বলে আখ্যা দেয়। এদের কাছে অশ্লীলতা বলতে কিছু নেই। অন্যদিকে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় পর্দা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

দুই. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্ণোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) চাইলেই ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফি রোধ করতে পারে। সব সাইবার ক্যাফেতে নজরদারি বৃদ্ধি এবং তাদের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফি প্রচার ও প্রসার বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা উচিৎ।

তিন. শুধু আইনই যথেষ্ট নয়, আইনের যথাযথ প্রয়োগও জরুরী। আইনের প্রয়োগ করতে পারলেই কেবল পর্ণোগ্রাফি এবং এ সংক্রান্ত সকল অনাচার দূর করা সম্ভব হবে।

চার. পর্ণোওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে একাধিক সংঘবদ্ধ চক্র নানা ধরণের সাইবার ক্রাইম করছে। পর্ণোগ্রাফি রোধে সুনির্দিষ্ট আইনের অবর্তমানে পর্ণোগ্রাফির ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ বা দমন করা যায়নি এবং এর জন্য শাস্তিও দেয়া যায়নি। উক্ত আইনের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফির ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাঁচ. বর্তমানে পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমূলক শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন দমন ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন হতে হবে।

ছয়. নিজ ইচ্ছায় ঐ দৃশ্যে যারা অবৈধ পারফর্ম করে তাদেরকে কোন শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন শাস্তির আওতায় তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

সাত. বাংলাদেশে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন নতুন। ফলে এ আইনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কাও থেকে যায়। অবশ্য এ আইনে কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলা দিলেও তা প্রমাণ হলে তার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনের সুযোগ নিয়ে কোনভাবেই তা যেন কারো উপর অপপ্রয়োগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

আট. কেউ কেউ বিশেষ সুবিধার লোভে পড়ে নিজের অজান্তে এ ভুল পথে পরিচালিত হয়। ফলে পর্ণোগ্রাফিতে যৌনকর্মে এমন সম্মতি ফুটে ওঠে যা বাস্তবে সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রেও এ কাজকে ধর্ষণ হিসেবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।[৭৮]

নয়. সিনেমা, টিভি বিজ্ঞাপন ও নাটক অশ্লীলতামুক্ত করতে হবে। অশ্লীল সংলাপ, অশ্লীল গান, প্রেমের আবেদন, পরকীয়া ইত্যাদির উপাদান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। চরিত্র বিধ্বংসী সর্বপ্রকার বস্তুই নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র, নাটক, সিনেমা, টিভি বিজ্ঞাপনসহ সকল অঙ্গনকে অশ্লীলতামুক্ত রাখতে আইনে উল্লিখিত নৈতিক মূল্যবোধের সুরক্ষা দিতে হবে।[৭৯]

---

৭৮. এডভোকেট সিরাজ প্রামাণিক, লেখক: সাংবাদিক, মানবতাকর্মী, আইন ভাবনা: পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ ও প্রাসঙ্গিক কথা, আজকালের খবর, ২ ফেব্রুয়ারি-২০১২ (তিনি লিখেছেন, আমাদের মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সোহেল রানা বনাম রাষ্ট্র মামলায় (৫৭ ডি এল আরের ৫৯১ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, যৌনকর্মের সময় যদি ভিকটিমটি বাধা না দেয় অথবা বাধা দেয়ার চেষ্টা না করে অথবা কোন চিৎকার না দেয় তাহলে তাতে ভিকটিমের সম্মতি আছে ধরে নিতে হবে। ২৭ আগস্ট-২০০৯ তারিখে ধর্ষণের অভিযোগে আনীত একটি মামলায় আসামী হান্নানকে আদালত খালাস দেন। আদালত বলেন, ওই মামলার ঘটনায় ভিকটিম রুনা খাতুন (১৬) (ছদ্মনাম) প্রতিবেশী আসামী হান্নান শাহ্ তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে তাদের বাড়িতে অন্যদের অনুপস্থিতিতে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে বেশ কয়েকবার যৌনকর্মে মিলিত হয়। যার ফলে ভিকটিম রুনা খাতুন গর্ভবতী হয়। গর্ভবতী হওয়ার পাঁচ মাস পর ভিকটিম তার মাকে জানায় এবং এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদে একটি সালিশও হয়। আসামি হান্নান ভিকটিম রুনা খাতুনকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানানোয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তে আসামিকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ মামলায় বিচারক আসামীকে খালাস দেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ঘটনার সময় ভিকটিমের বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর ছিল। এর আগে তার দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং আসামির সঙ্গে তার একাধিকবার যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া ভিকটিমের সম্মতিরই নামান্তর। এ ধরণের অনাচার আমাদের সমাজে হরহামেশা দেখা যায়। এহেন প্রতারণা করেও এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকেরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকাদের অবশ্যই বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।)

৭৯. Code for Censorship of Films in Bangladesh, 1985 (Dhaka, the 16th November 1985 No. S . R . O> 478-L/85) [Immorality or Obscenity : N. B. (4) In case a picture creates such an impression on the audience as to encourage vice or immorality, even it shows that the vicious to the immoral has been punished for his/her wrong.

দশ. আইনটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মানবাধিকার কর্মী ও স্থানীয় আলিমদের অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ।

এগার. এ দেশের ভাসমান কিছু নারী ও শিশু অবৈধ যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এদেরকে ব্যবহার করে অবৈধ পর্ণো ছবি উৎপাদন করে। ফলে এদের পুনর্বাসন সেবা, বিশেষ শিক্ষা, চাকরির প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় সহায়তাদান প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

বার. সমাজের সভ্য মানুষদের বিনোদনের প্রয়োজন মেটাতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ লাভ করেছে। আর এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিবর্গ অশ্লীল ছবি নির্মাণ করে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রের সর্বজন গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে শর্ত ও নিয়মভঙ্গের উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে 'দি সেন্সরশিপ অব ফিল্ম এক্ট' এ উল্লিখিত আইনের ধারা অনুযায়ী 'অনুমোদিত ছবির প্রত্যয়ন বাতিলকরণ' সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।[৮০]

তের. বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এখানকার অধিবাসী জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা দেশের আইনসমূহকেও দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে। 'দি কোড ফর সেন্সরশিপ অব ফিল্মস্ ইন বাংলাদেশ, ১৯৮৫'তে Religious Susceptibilities অর্থাৎ 'ধর্মীয় সংবেদনশীলতা' এবং

Immorality or Obscenity অর্থাৎ 'অনৈতিকতা বা অশ্লীলতা' দুটি শিরোনামে যথাক্রমে চারটি ও পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে পর্ণোগ্রাফির যাবতীয় অশ্লীলতাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপমহাদেশের প্রযোজিত সিনেমা মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধকরণে এ শর্তসমূহ মাইলফলক।

---

৮০. The Censorship of Films Act, 1963. Act No. XVIII of 19663 (As amended by President's Order No. 41 of 1972, Ordinance No. LVIII of 1982 and Act No. 1 of 2006) aviv 7 [Power to decertify certified films-7. Where the government is of the opinion that a certified film, or class of certified films, should, in the interest of law and order, or in the interest of local film industry, or in any other national interest, be certified in respect of the whole or any part of Bangladesh, it may, of its own motion, by notification in the official Cazette, direct that such film or class of films shall be deemed to be uncertified film or films in respect of the whole of Bangladesh, or such area or areas as may be specified in the notification], 7 A (1), (2) & (3) [Seizure of film 7A.(1) where the Board has reason to believe that a film or publicity materials are being exhibited in any place in contravention of any provision of this Act or any rule made thereunder, it may, by order in writing, authorise any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any District Information Officer to search the place and seize the film and the publicity materials, if any of that film. (2) A Police Offficer or District Information Officer who has seized a film or any publicity materials under sub section (1) shall forthwith forward it to the Court. (3) On receipt of a film or any publicity materials under sub-section (2) the Board] shall take such action under the Act as it deems proper.]

বাংলাদেশে ইভটিজিং ও নৈতিকতা

বাংলাদেশে ইভটিজিং:

ইভটিজিং রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ আজ হতে কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশের মানুষ তা জানত না। ইসলামের দৃষ্টিতে রাস্তায় চলাচলরত কোন মহিলার দিকে ইচ্ছা করে তাকানোও নিষিদ্ধ।

সম্প্রতি ইভটিজিংয়ের নিকষ কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে এক একটি জীবন। কিছুদিন পর পর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে স্কুল ও কলেজ ছাত্রীর আত্মহনন এবং সংঘর্ষের খবর ছাপা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজগামী মেয়েরা ইভটিজিংয়ের প্রতিক্রিয়ায় আত্মহত্যা করছে। তবে এর সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত জানা নেই। এ বিষয়ে শহরের খবর পত্রিকাগুলোতে ছাপা হলেও দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রামীণ পরিমন্ডলে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করার সব খবর পত্রপত্রিকায় আসে না। বখাটেদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের ভয়ে অনেক পরিবার থানায় নালিশ করারও সাহস পায় না। এমনকি বখাটেদের দিক্ থেকে পুনরায় আক্রমণ আসার ভয়ে অথবা সামাজিকভাবে মান হারানোর আশংকাতে অনেকে চুপসে যান। কারণ এটি শুধু নারীর জন্য অসহনীয় ব্যাপার নয়, পরিবারের সবার পক্ষেই এটি পীড়াদায়ক। ইতোমধ্যে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদকারীকে হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছে। মেয়েরাও যে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ-ই মানবিক বাস্তবতাটুকু নির্মমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে। কোন কিশোরী মেয়েকে একাকিনী চলতে গেলে তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তায়, স্কুল-কলেজের সামনে অবস্থানরত বখাটে তরুণেরা মেয়েদেরকে উত্যক্ত করে। শুধু উত্যক্ত শেষ কথা নয়, কখনো তারা শরীরে হাত পর্যন্ত তোলে। এটি এমন এক সমস্যা, যা শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েরা এ সমস্যা বাড়িতেও প্রকাশ করতে পারে না। বাড়িতে বললে অনেক অভিভাবক মেয়েদের পড়ালেখা বন্ধ করে দেন। শুধু ইভটিজিংয়ের কারণে একটি মেয়ের শৈশব, কৈশোর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ জাতীয় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মেয়েটিকে বাল্য বিয়ের শিকার হতে হয়। অন্যদিকে, সামাজিক অসচেতনতা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা থাকায় ছাড়া পেয়ে যাচেছ অপরাধীরা। শুধু বখাটেদের কারণে মেয়েদের পৃথিবী সংকুচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্তমান সময়ে ইভটিজিং একটি আলোচিত বিষয় যা সব ধরনের মানুষের জন্য অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিষয়টিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন একটি হলো আইনী দৃষ্টিকোণ, অন্যটি হলো সামাজিক দৃষ্টিকোণ। ইভটিজিং যেমন আইনগত দিক থেকে ফৌজদারি অপরাধ, তেমনি সামাজিক দিক থেকেও সামাজিক অপরাধ। এর শিকড় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধের মধ্যেই মিশে আছে। সমাজসচেতন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সামাজিক ব্যাধির মোকাবেলা করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এই সংগে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটানো অত্যন্ত জরুরী। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চেয়েও প্রয়োজন উপযুক্ত নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

ইভটিজিং এর অর্থ:

সাধারণত ইভটিজিং হচ্ছে বখাটে ছেলে কর্তৃক মেয়েদেরকে অশালীন মন্তব্য বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে উত্যক্ত করা। অতি সম্প্রতি এর সীমা ছাড়িয়ে চিঠি, ই-মেইল, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীল মন্তব্য করা, এমনকি শরীরে হাত দেয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যা নারীর প্রতি চরম অসম্মানের প্রতীক।[১]

এটি নারী নির্যাতনের ভিন্ন একটি কুৎসিতরূপ। তবে এটি শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ। বর্তমানে এর মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর থেকে পরিত্রাণ পেতে নিজের জীবনের ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছে নারীরা। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ১৮ মে ২০১০ তারিখের তথ্যমতে, ইভটিজিংয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে ৪ মাসে ১৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছে।[২] এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি স্পষ্ট যে, ইভটিজিং মানসিক নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন ও হত্যা-তিনটি অপরাধ সংঘটিত করছে। তাই আইনের দৃষ্টিতে ইভটিজিং নিঃসন্দেহে একটি ফৌজদারি অপরাধ।

ইভটিজিং এর কারণ:

কোন একক কারণে ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটে না। নানা রকমের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ইভটিজিংয়ের মতো মন্দ আচরণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ওই সব নিয়ামক নির্মূল না করতে পারলে এ সমস্যার কার্যকর চূড়ান্ত সমাধান আশা করা যায় না। মূলত পারিবারিক সচেতনতার অভাব, চারিত্রিক অবক্ষয়, মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ না থাকা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিকৃত মানসিকতা, খারাপ ইচ্ছার প্রতিফলন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সুশিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার, অপসংস্কৃতি, গণমাধ্যমে গঠনমূলক তথ্যের স্বল্পতা, সর্বোপরি সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামোর অভাব ইত্যাদি কারণে এই সামাজিক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে। প্রধান কিছু কারণ তুলে ধরা হলো:

ধর্মীয় অনুশীলন ও মূল্যবোধের অভাব:

ইভটিজিংয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত মন্দ স্বভাবের, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে পরিবার থেকে সমাজে কোথাও ধর্ম চর্চা নেই। ছেলেদের বখাটে হওয়ার পিছনে প্রাথমিক দায়ভার বর্তায় পরিবারের উপর। পরিবারের মা-বাবা বা বয়স্ক অভিভাবকেরা যদি তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে ধর্মীয় অনুশীলন ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দেন তাহলে তাদের মন্দ পথে যাওয়ার সুযোগ কমে যাবে। পরিবারের মধ্যে যদি ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলা হয় এবং মন্দ কথা, অশালীন উক্তি-এগুলোকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়, তাহলে ওই পরিবারের সন্তানরা মন্দ কথা বা উক্তির ব্যাপারেও ঘৃণা বোধ করবে। অথচ পারিবারিক পরিমন্ডলে এ দিকটি খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। ফলে দিন দিন এ মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে।

---

১. বানু মালেকা, ‘ইভটিজিং বন্ধে বর্তমান আইন সংশোধন করে ব্যাপক প্রচারণায় যেতে হবে’, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮মে,২০১০, পৃ. ১

২. The Daily Star, 19 May, 2010.

মাদকাসক্তি:

সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে মাদক গ্রহণ। আর মাদকাসক্তি মন্দ কাজের সূতিকাগার। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত হতাশা ও কষ্ট দূর করতে তরুণ সমাজ দিন দিন ব্যাপকভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। মাদকের সহজ প্রাপ্তি এবং পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহার কারণে অনেকে এই খারাপ অভ্যাসে জড়াচ্ছে।

মাদক সেবনকারীর মানসিক ভারসাম্য থাকে না। তাই এই অবস্থায় সে যে কোনো ধরনের অপকর্ম করে বসতে পারে।

মুঠোফোনের মাধ্যমে:

মুঠোফোনের অপব্যবহারের কারণে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এমনকি, মুঠোফোনের সংযোগে টাকা রিচার্জ করতে গিয়েও মেয়েরা সংযোগ নম্বর দোকানে দিয়ে আসলে এলাকার বখাটেরা তা সংগ্রহ করে অকারণে বিরক্ত করে থাকে। এভাবে মেয়েরা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ:

আকাশ সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের প্রভাব সর্বপ্রথম তরুণ সমাজের উপর পড়ে। যেসব তরুণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং একান্ত গোপনে তা ব্যবহারের সুযোগ পায়, তাদের বিরাট অংশ বিভিন্ন পর্ণো সাইট দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের আচরণ বিকৃত হতে থাকে। অন্যদিকে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা তরুণ সমাজের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় রীতিনীতি। বাংলাদেশের নারী সমাজ ইতিবাচকভাবেই অনেক রক্ষণশীল। তবে ইদানিং আকাশ-সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন বা অন্য যে কোন কারণে হোক নারী সমাজের অনেকের মধ্যে এক ধরনের তথাকথিত অগ্রসরমান আচরণ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে পোশাক-পরিচ্ছদে কারো কারো অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রেই অশালীন বলা হয়ে থাকে। সমাজে দু'একজন এমন তথাকথিত অগ্রসর নারীর জন্য সমগ্র নারীসমাজ অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকির শিকার হচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাব:

আমাদের দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত নীতিশিক্ষার কোন পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উচ্চশিক্ষায় কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর প্রচলন আছে। শিশু, কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের নীতিশিক্ষার পাঠ দেয়া হলে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের মতো অনৈতিক কর্ম সম্পর্কে এদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হবে। কারণ এ শিক্ষা সার্বিকভাবে মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ নিয়ে আলোচনা করে এবং নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

ইভটিজিং এর শিকার:

বাংলাদেশে বখাটেদের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো—

কেস নং-১:

নাফফিয়া আপণ পিংকী (১৪), নবম শ্রেণীর ছাত্রী, শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। মুরাদ নামক এক বখাটে ছেলে প্রায়ই পিংকীকে উত্যক্ত করত। এক পর্যায়ে ১৯ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে বখাটে মুরাদ তাকে মারধর করলে সে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

কেস নং-২:

ইলোরা (১৩), অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাই স্কুল, রামপুরা, ঢাকা। পাড়ার বখাটে কর্তৃক উৎপাতে আত্মহত্যা করে।

কেস নং-৩:

রেশমা খাতুন (১৮), এইচ.এস.সি'র ছাত্রী, শালফা টেকনিক্যাল কলেজ, বগুড়া। মুন্নাফ ও রবিন নামে দু'জন বখাটে ছেলের অত্যাচারে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে। রেশমার পরিবার থেকে মুন্নাফ ও রবিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কিন্তু আসামীরা পলাতক।

ইভটিজিং এর আইনগত প্রতিকার:

বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় ইভটিজিং বন্ধ করতে বা এর প্রতিকারের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এমনকি প্রচলিত আইনের কোনো ধারায় 'ইভটিজিং' বলে কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তবে যৌন হয়রানিমূলক কাজকে আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তা শাস্তিযোগ্য। নারীদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত কিছু আইন আছে। এ সকল আইনে নারী ও পুরুষের মৌলিক মানবাধিকারের ভিত্তিতে সম অবস্থানের বিধান রয়েছে এবং নারীর সকল প্রকার শারীরিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৩] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত) ২০০৩ এবং বাংলাদেশ দন্ডবিধি, ১৮৬০ (সংশোধিত) ২০০৪-এই দু'টি আইনের মাধ্যমে ইভটিজিং এর প্রতিকার পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বখাটেদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন।[৪]

সাংবিধানিক বিধান:

১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার পরিচ্ছেদের ২৮ নং অনুচ্ছেদে ২ নং দফায় নারীর সম অধিকার প্রদান করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারীরা পুরুষের মত সমাজ অধিকার ভোগ করবে।[৫]

---

৩. হোসেন সেলিনা, 'বাংলাদেশের মেয়ে-শিশু', ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, খ্রি. ১৯৯০, পৃ. ১৫৩

৪. সরকার জাহাঙ্গীর আলম, 'আত্মহনন: বিচারের বাণী কি নিভৃতেই কাঁদবে?', দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ মে, খ্রি. ২০১০, পৃ. ১৬

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ২৮।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান:

ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এখনো আইনের প্রয়োগ যথাযথ নয়। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ আইন সংশোধনও হয়েছে অনেকবার। এতে অবশ্য শুধু শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু কোন নতুন ধরনের নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং নারীর সহিংসতা প্রতিকারের পথ সংকুচিত করা হয়েছে। কারণ ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে 'অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি' শব্দটি ২০০৩ সালের সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে।[৬] এটি আইনটিকে যেমন দুর্বল করে দিয়েছে তেমনি ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের সহজ পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমানে ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী অবৈধভাবে নারী ও শিশুর শরীরের কোন অঙ্গ স্পর্শ করে অশ্লীলতাহানি করলে তা যৌন নিপীড়ন বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ এই আইন মোতাবেক অশোভন বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার প্রেক্ষিতে কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। শুধু অঙ্গ স্পর্শ করে শ্লীলতাহানি করলে তার বিরুদ্ধে এই আইনে প্রতিকার পাওয়া যাবে।[৭]

বাংলাদেশে দণ্ডবিধি আইনে বিধান:

১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনেও নারীর হেফাজতমূলক ধারা সন্নিবেশিত আছে। এই আইনের ২৯৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন করে (১) কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কাজ করে বা কোনো প্রকাশ্য স্থানে বা কোনো প্রকাশ্য স্থানের সন্নিকটে অনুরূপ অশ্লীল সঙ্গীত, গাঁথা বা কথার গান করে, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি ৩ মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবে।[৮] এই আইনের ৩৫৪ ধারা অনুযায়ী নারীর শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায়ে বা তার শালীনতা নষ্ট হতে পারে জেনে কোনো নারীকে আক্রমণ করা বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করা এই ধারায় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হচ্ছে ২ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।[৯]

যদিও 'শালীনতা' শব্দের কোন সংজ্ঞা দণ্ডবিধিতে নেই। তবে যে আচরণ কোনো নারীর প্রতি শোভন, তার বিপরীত হলে তা অশালীন বলা যায়। এ ধরনের বিপরীত আচরণের সাথে যখন দৈহিকভাবে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ করা হয় এবং আক্রমণকারী যখন স্বেচ্ছায় বা জেনে-শুনে তা করে তখন এই ধারায় বর্ণিত অশালীনের আওতায় আসে। এছাড়া দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এ ধারা মোতাবেক শাস্তির মেয়াদ ১ বছর বা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।[১০]

---

৬. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), ধারা ১০(২)
৭. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), ধারা ১০
৮. বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ২৯৪
৯. বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ৩৫৪
১০. বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০, ধারা ৫০৯

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে সকল তথ্য প্রমাণ করতে করতে হয় তা হলো- (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো মন্তব্য, শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, কোনো বস্তু প্রদর্শন, কোনো নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করেছিল; (২) অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লেখিত বিষয়ের যে কোনো একটি কোনো নারীকে শোনানো বা দেখানোর উদ্দেশ্যে করেছিল; (৩) এসবের দ্বারা কোনো নারীর শালীনতা অমর্যাদা করার উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, ইভটিজিং এর অপরাধের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দুটি আইনে উল্লিখিত ধারায় মামলা করা সম্ভব।

হাইকোর্ট বিভাগের দিকনির্দেশনাঃ

২০০৮ সালে যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৪ মে ২০০৯ তারিখে কয়েকটি দিক নির্দেশনা উল্লেখ করে একটি নীতিমালা প্রদান করেছেন। ইভটিজিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক রায়। সংসদে আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।[১১] এই রায়ে যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় শারীরিক বা মানসিক যে কোনো ধরনের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। যেমনঃ ই-মেইল, মুঠো ফোন, এসএমএস, পর্ণোগ্রাফি, যে কোনো ধরনের চিত্র, অশালীন উক্তিসহ কাউকে অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ এর মধ্যে পড়বে। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অশ্লীল উক্তি, কারও দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, কোনো নারীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, যে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ, অন্য যে কোনো ধরনের শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন-এগুলোও যৌন হয়রানির মধ্যে পড়বে।[১২] অর্থাৎ উচ্চ আদালতের এই রায়ে কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাট ও সবধরনের প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে "যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিরোধ নীতিমালা, ২০০৮" নামক ৭টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট খসড়া নীতিমালা তৈরীর কাজ চললেও তা ছিল শুধু উচ্চ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক।

নারীর প্রতি সর্ব প্রকার বৈষম্য দূর করতে সিডো সনদঃ

১৯৮৪ সালে ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি সব বৈষম্য অপনোদন (সিডো) সনদের ৩০টি ধারা স্বাক্ষর করেছে। নারী-পুরুষের সমতা অর্থাৎ সমান সুযোগ নিশ্চিত করে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করতে সিডো সনদ বাস্তবায়ন জরুরী। সিডোর স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্র হিসেবে সিডোর অনেক নীতিমালাই বাংলাদেশের জাতীয় আইনে প্রতিফলিত হয়নি। যদিও আন্তর্জাতিক দলীলের মতো সিডোর নির্দেশনা সদস্য রাষ্ট্রের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই দলিলে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এই দলীলের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রচলিত আইন পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৩] সে প্রেক্ষিতে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করতে পরিপূর্ণ আইন প্রয়োজন।

---

১১. দৈনিক প্রথম আলো, ২০মে, ২০০৯

১২. হাফিজা শীপা এবং সরকার চিত্তরঞ্জন, "ইভটিজিং স্পষ্টতই যৌন হয়রানি", দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ মার্চ, ২০১০, পৃ.১৩

১৩. কামাল, সুলতানা, 'সিডোর আলোয় নারীর সমঅধিকার',নারী ও সমাজঃ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে', নমিতা খান (সম্পাদনা), সূচীপত্র, ঢাকা : খ্রিস্টাব্দ ২০০৫. পৃ.৬৯

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন (খসড়া), ২০১০:

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া এখন আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনটিতে অভিযুক্ত পক্ষ একজন পুরুষ ও তার বিরুদ্ধে অভিযোক্তা একজন নারী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইনের আওতা হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তিমালিকানাধীনসহ যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্র।

খসড়া আইনটিতে যৌন হয়রানি কোন্গুলো, তার যে ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেটি সন্তোষজনক। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যৌন হয়রানি বলতে সরাসরি বা ইঙ্গিতে অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ, শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা, প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, যৌন ইঙ্গিতবাহী কোন কিছু উপস্থাপন বা উক্তি বা মন্তব্য বা প্রদর্শন করা, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন আবেদন বা অনুরোধ করা, পর্ণোগ্রাফি দেখানো, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা ইশারা করা, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের দ্বারা উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা বা যৌন ইঙ্গিতমূলক ঠাট্টা বা উপহাস করা, চিঠি, টেলিফোন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, কারখানা, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা যে কোন স্থানে বা দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক কোন কিছু লেখা বা অঙ্কন বা চিহ্নিতকরণ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো অশালীন বা যৌনতা সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু রাখা বা দেখানো ইত্যাদি, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে কমনরুম, ওয়াশরুম, বাথরুম বা এই ধরনের কোনো স্থানে উঁকি দেয়া, চরিত্রহরণের উদ্দেশ্যে কারো স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারন ও সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার বা প্রকাশ করা, লিঙ্গগত কারণে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বা বিরত থাকতে বাধ্য করা, প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা, প্রতারণার মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করতে অস্বীকার করার কারণে কোনো ব্যক্তির পদোন্নতি বা পরীক্ষার যথাযথ ফল বা অন্য কোনো ফল বা অন্য যে কোনো সুবিধাদি বাধাগ্রস্ত করা এবং যৌন প্রকৃতির যে কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক, বাচনিক বা ইঙ্গিতমূলক অভিব্যক্তি বোঝাবে।"[১৪]

ইভটিজিং প্রতিরোধে সামাজিক নৈতিকতা ও করণীয়:

সব শ্রেণীর মানুষের কাছে ইভটিজিং এখন যেমন খুব পরিচিত শব্দ তেমনি একটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। কোনো একটি সামাজিক ব্যাধি সহজেই নির্মূল হবে না। কেননা, এ সমস্যাটি বহু দিনের। তাই আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ এর শিকড় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই মিশে আছে।

---

১৪. গোলাম রাব্বানী, মোহাম্মদ, "যৌন হয়রানি প্রতিরোধের গল্পসল্প", দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর, খ্রি. ২০১০, পৃ. ১৬

পরিবারের ভূমিকা:

পরিবার হচ্ছে সর্বপ্রথম ও প্রধান ভিত্তি স্তর যেখান থেকে একটি শিশু সম্পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে ওঠে। পরিবারে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও মর্যাদার মনোভাব নিয়ে বেড়ে না উঠলে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পড়বেই। মূলত ইভটিজিং নির্মূলে পরিবারের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের ভেতর যদি ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দেয়া যায় তবেই পরিবর্তন আশা করা যায়। শিশুর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণের মধ্যেই নারীর প্রতি এই বিদ্বেষ ও সহিংস মনোভাব আত্মস্থ হয়ে পড়ে এবং তা ছেলে শিশুর ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হয়। ঘরের ভেতরের পুরুষ চরিত্রের ধর্মবিহীন রূঢ় আচরণ বা নারীদের অপমান করার চিত্র পরবর্তীতে ছেলে শিশুটিও আশেপাশের কম শক্তিধর মানুষকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে বড় হতে থাকে। যে ছেলেটি মেয়েদের উত্যক্ত করে তার বিরুদ্ধে অভিভাবককে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে, বেশিরভাগ পরিবারের মেয়েরা মেনে নেয়া, কথা না বলা ও সিদ্ধান্তহীনতার চরিত্র ধারন করে। তাই মেয়ের মা ইভটিজিংয়ে শিকার মেয়েটিকে শাসনের নামে মানসিক নির্যাতন না করে সাহস যোগাতে হবে যাতে সে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। একটি মেয়ে যখন ইভটিজিংয়ের শিকার হয়, তখন তার পাশে পরিবারের সহায়ক ভূমিকা থাকতে হবে নতুবা অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ দায়িত্ব নিতে হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের মধ্যে নীতিবোধ এবং সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে দিতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তার যে দায়িত্ব বা ভূমিকা তা তাকে বোঝাতে হবে। সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো-মন্দ, উচিৎ-অনুচিৎ বিচারশক্তি সৃষ্টি হবে। ফলে ইভটিজিংয়ের মতো অনৈতিক কাজ সহজেই ঘটবে না।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণ ঘটে নাজুকতার মধ্য দিয়ে, এর সুযোগ নেয় বখাটেরা। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সব মানুষের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বাড়াবাড়ির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই সমস্যা প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে হেলপ্ লাইন:

ইভটিজিংয়ের শিকার হলে সহজেই যাতে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সাহায্য নেয়া যায়, এ জন্য পর্যাপ্ত হেলপ্ লাইন থাকতে হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা হবে, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় তথা ক্ষমতার দাপট যদি প্রবল হয়, তাহলে অনেক্ষ ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থা সামলানো একজন ভিকটিমের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে অনেকে বিষয়টি নীরবে সহ্য করে যান। এমনকি আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটছে। তাই সামাজিকভাবে জোরালো ঐকমত্য সৃষ্টি করা দরকার, যাতে কোনো অভিভাবক, ক্ষমতাধর ব্যক্তি, কোনো কর্তৃপক্ষ যেন ইভটিজিংকারী বখাটেদের প্রশ্রয় না দেন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে কার্যকর থাকলে এ ধরনের অপরাধ এক সময় নির্মূল হয়ে যাবে আশা করা যায়।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা:

সমাজে এ ধরনের অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া দরকার। আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এমনই যে আজও এখানে ইভটিজিং এর শিকার মেয়েরা মামলা করার বদলে সামাজিক মান-সম্মানের ভয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ইভটিজিংয়ের মতো মেয়েদের প্রাণ সংহারক একটি গুরুতর অপরাধকে হালকাভাবে দেখার এবং দোষ মেয়েদের উপরে চাপানোর প্রবণতাও আমাদের সমাজে দেখা যায়। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলে পরবর্তীতে অন্য বখাটেদের দৌরাত্ম্য কমে আসবে।

আইনের বাস্তবায়ন:

নারীদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য যত ধরনের আইন করা হয়েছে তা থেকে নারীরা কতটা সুফল পাচ্ছে-এ বিষয়টি নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। তাই নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে যে সকল আইন আছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মেয়েদের সব ধরনের হয়রানি রোধে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন ও তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে-এই মর্মে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া রায় রয়েছে, সে রায় আজও বাস্তবায়ন করা হয়নি। যতদিন পর্যন্ত ইভটিজিং প্রতিরোধে কোনো সুদির্দিষ্ট আইন তৈরি না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রচলিত আইন ও হাইকোর্টের নীতিমালার সঠিক ও কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং যত দ্রুতসম্ভব ইভটিজিং প্রতিরোধে একটি পূণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা:

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান। এ লক্ষ্যে শিক্ষার সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ইভটিজিং বন্ধের ঘোষণা দেয়া হবে এবং অন্যদিকে শালীন পোশাক বা বোরকা পরার প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করা হবে–তা তো হতে পারে না। কাজেই শিক্ষার সকল পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই।

নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। অথচ একজন নারীকে সমাজের কিছু বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ দ্বারা নিরাপত্তাহীন জীবন কাটাতে হচ্ছে, মূল্য দিতে হচ্ছে নিরপরাধ কিশোরীদের। নিঃসন্দেহে ইভটিজিং একটি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ। একটি সভ্য রাষ্ট্রের জন্য ইভটিজিংয়ের মত ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাকর। রাষ্ট্রীয় আইন কাঠামোর গন্ডিকে বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা বলয়কে আরো শক্তিশালী করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

সম্প্রতি ইভটিজিং প্রতিরোধে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ সোচ্চার। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও নেয়া হচ্ছে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ। সরকার ইভটিজিং বন্ধে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং বন্ধে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই

কমিটির সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে, অসংখ্য বখাটে ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালতও কাজ করছে কিন্তু তারা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের অধীনে বখাটেদের গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব অপরাধী জরিমানা পরিশোধ করে খালাস পেয়ে যাচ্ছে। যদি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দন্ডবিধি আইনের অধীনে বখাটেদের আটক করা যায় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া যায় তবে ইভটিজিং প্রতিরোধ কিছুটা হলেও সম্ভব হতো। ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধও জোরদার করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সঠিক ও সুস্থ জীবন দর্শন এবং পথের দিকনির্দেশনা দিতে হবে ছেলেদের। পারিবারিক সচেতনতা, আন্তরিক যত্ন এবং প্রয়োজনীয় অনুশাসনই দিতে পারে একটি সুস্থ তরুণ সমাজ। সুস্থ তরুণ সমাজ দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ দেশ, জাতি ও ভবিষ্যত।

এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন

এইড্স সভ্যতার সবচাইতে বড় সংকট। আপাতদৃষ্টিতে, একে স্বাস্থ্য সমস্যা মনে হলেও এটা গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর কোন কোন ভূখন্ডে এইড্স আজ মহামারীর আকার ধারন করেছে। ভয়ংকর এ এইড্স থেকে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পেতে পারে একমাত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে, যেহেতু এই মারণব্যাধির সহজলভ্য কোন প্রতিষেধক আজো আবিষ্কৃত হয়নি তাই এইড্স প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন ও গণসচেতনতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামের অনুশাসন এইড্স সংক্রমণের অন্তরায় বলে মুসলিম প্রধান এ দেশে ইসলামী জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তোলাই হতে পারে এইড্স রোধের সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক এখনো ধর্মভীরু। তবে এইড্স এর মত মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে তাদের জানা না থাকা এবং ইসলামী শরীয়ার পূর্ণ অনুসরণের অভাবে আমাদের সমাজে এইড্স ছড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন আমাদের আলেম সমাজ তথা মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এদেশের মসজিদসমূহে শুধু শুক্রবার জুমআর সালাতে প্রায় এক কোটি মুসলমান মসজিদে সমবেত হয়ে খুতবা শোনে এবং সালাত আদায় করে। রোগের উৎস ও সংক্রমণের কারণ এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ইসলামের অনুশাসন যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হলে এইড্স এর মত ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

Human Immunodeficiency Virus সংক্ষেপে HIV নামক একধরণের রেট্রোভাইরাস মানবদেহে ক্রিয়াশীল হওয়ার সর্বশেষ পর্যায় হলো এইড্স। ইংরেজি পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome. যার অর্থ দাঁড়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত উপসর্গ। এইচআইভি হলো এইড্স রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস বা জীবাণুর নাম, যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। ফলে মানুষ বিভিন্ন

রোগের সহজ শিকার হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।[১] এইচআইভি সংক্রমণের নিজস্ব কোন লক্ষণ নেই। তবে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি যখন এইডসে আক্রান্ত হয় তখন বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।[২] এইচআইভি মানবদেহে প্রবেশের পর দীর্ঘ দিন এটি কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ না করেই সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। ভয়ানক বিষয় হলো একসময় কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও সংক্রমিত ব্যক্তি থেকে অপরের মাঝে এই জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত এইচআইভি সংক্রমণের পর বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৭ থেকে ১০ এমনকি ১৫ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।[৩] কারো দেহে এইচআইভি প্রবেশ করলে একসময় এইড্স দেখা দিবেই। উন্নত বিশ্বে প্রচুর ব্যয়বহুল যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তা কেবল এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুকে বিলম্বিত করার জন্য অর্থাৎ এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির এইড্স হতে যাতে কিছু দেরি হয় সে চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু এইচআইভিতে একবার আক্রান্ত হলে মৃত্যু অবধারিত। অথচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে এইড্স-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বাংলাদেশেও দিন দিন এইড্স রোগী বাড়ছে।

সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য এবং বীর্যপাতের আগে নির্গত পিচ্ছিল রস, যোনি নিঃসৃত তরল পদার্থ এবং মায়ের বুকের দুধে এইচআইভি ভাইরাস থাকে।[৪]

ফলে, উল্লিখিত তরল বস্তুর সংস্পর্শে এইচআইভি বহনকারীর দেহ থেকে ভাইরাস অন্যের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। এইচআইভি/এইড্স সংক্রমণের কারণ হিসেবে 3p কে চিহ্নিত করা হয়। এই তিনটি p এর প্রথমটি হচ্ছে ‘প্রমিসকিউটি’ অর্থাৎ অরক্ষিত যৌন সঙ্গম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ‘পেরেন্টাল’ অর্থাৎ যে কোনভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হওয়া। এটি হতে পারে এইচআইভি বহনকারী ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণ বা সঞ্চালন করলে, আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূঁচ-সিরিঞ্জ ও অন্যান্য ডাক্তারি বা ক্ষত সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি, যেমন, ছুরি, কাঁচি, রেজার, ব্লেড, ক্ষুর ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে। তৃতীয় p টি হচ্ছে ‘পেরিনেডিয়াল’ অর্থাৎ এইচআইভি আক্রান্ত মা হতে সন্তানের মধ্যে জীবাণু সংক্রমিত হওয়া।[৫] এইচআইভি সংক্রমিত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়ে এবং বুকের দুধ খাওয়ানের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।[৬]

---

১. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ, এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য) (ঢাকাঃ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ২০০৭) পৃ. ২৭

২. প্রাগুক্ত।

৩. যুব সমাজের মধ্যে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ভূমিকা, জাতীয় এইড্স/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫), পৃ. ২

৪. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫. দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০০৪, উদ্ধৃত: কামরুন নাহার আহমেদ, মোঃ রবিউল ইসলাম ও মোছা. মুনিরা সুলতানা, “শিক্ষিত নারীসমাজের এইচআইভি/এইড্স সচেতনতা: ঢাকা মহানগর ভিত্তিক সমীক্ষা”, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্ত সংখ্যা: ৮৫–৮৬, ২০০৬), পৃ. ১১৫

৬. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

এইড্‌স: বৈশ্বিক পরিস্থিতি-

১৯৮১ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলসে ৫ জন সমকামী পুরুষ এবং প্রায় একই সময়ে নিউইয়র্কে ২০ জন ক্যাপোসি সারকুমা রোগীকে এইডসে আক্রান্ত বলে অনুমান করা হয়। ১৯৮৩ সালে এইড্‌স এর জীবাণু এইচআইভি শনাক্ত করা যায়। ১৯৮৫ সালে আফ্রিকাতে প্রথম বারের মত এইড্‌স রোগী পাওয়া যায়।[৭] এরপর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্তের সংখ্যা। চিহ্নিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত অর্থাৎ গত প্রায় আড়াই দশকে (১৯৮১-২০০৫) বিশ্বের প্রায় আড়াই কোটিরও বেশি প্রাণ অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে এই মরণ ব্যাধির নিকট।[৮] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ি, বর্তমান বিশ্বে এইড্‌স রোগীর সংখ্যা ৪০ মিলিয়নেরও বেশি। বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১৪ হাজার মানুষ নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে যার অর্ধেকেরই বয়স ১৫-২৪ বছরের মধ্যে।[৯] WHO এর ২০০৫ সলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিশ্ব এইড্‌স পরিস্থিতির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বে মোট প্রাপ্ত বয়স্ক এইচআইভি আক্রান্তের (৩৮ মিলিয়ন প্রায়) মধ্যে অর্ধেক (১৭.৫ মিলিয়ন) নারী। সমগ্র বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস এ আক্রান্তের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প বয়সী বা ১৪-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে এইচআইভির সংক্রমণ অধিক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে।[১০] জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) এর ‘ Report on Test of World Population-2004’ -এ বলা হয়েছে, বিশ্বে ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীরা নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণের শিকার হচ্ছে প্রতি ১৪ সেকেন্ডে ১ জন, যার অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে বিশেষ বিপদগ্রস্ত যুব মহিলারা।[১১] আবার UNICEF-2004- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত ৩ কোটি ৮০ লক্ষ জনগণের মধ্যে ১৫-২৪ বছর বয়সী জনগণ প্রায় ১ কোটি, যার ৬২% নারী। [১২]

---

৭. ডা. হাফিজ লুনা শিখা, “বাংলাদেশে এইড্‌স পরিস্থিতি” (ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫), পৃ. ২৪

৮. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫।

৯. মুসলিমা রহমান শান্তি, “এইড্‌স প্রতিরোধে প্রয়োজন যুব সচেতনতা” (ঢাকা: দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭) পৃ. ৪

১০. http://www.who.int/whr/2005/en/index.html, accessed: 11 November 2008.

১১. http://www.unfpa.org/about/report/2004/index.html, accessed: 11 November 2008.

১২. http://www.unicef.org/publications.index_27262.html, accessed: 12 November 2008.

তথ্যানুযায়ী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৪৫ লাখ এবং চীনে ১০ লাখ এইড্স রোগী রয়েছে।[১৩] ১৯৯৭ সালের তথ্য অনুযায়ী থাইল্যান্ডে ১০ লাক লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।[১৪] মালয়েশিয়ায় ৫৫ হাজার এবং বার্মায় ৫ লাখ লোক এইডসে আক্রান্ত।[১৫]

শুধু ২০০৭ সালেই ২৫ লক্ষ মানুষ এইচআইভি/এইড্স এ আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ২১ লক্ষ যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৩,৩০,০০০। ২০০৭ সালে নতুন আক্রান্তের প্রায় ২১ লক্ষ রয়স্ক এবং ৪,২০,০০০ শিশু। সাব সাহারান আফ্রিকায় ২৪.৭ কোটি মানুষ এইচআইভি/এইড্স এ আক্রান্ত হয়েছে যা বিশ্বের মোট এইচআইভি/এইড্স আক্রান্তের ৬৩%। এইড্স এর কারণে অনাথ হয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখ শিশু। আক্রান্তদের মধ্যে গড়ে ৫০% যুবক, যারা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার।[১৬]

আফ্রিকার দেশগুলোতে এইড্স মারাত্মক আকার ধারন করেছে। বিশেষ করে বতসোয়ানা যেখানে ৪০% এর বেশি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এইড্স রোগী, দক্ষিণ আফ্রিকা যা কিনা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এইড্স রোগীর দেশ আরো আছে জিম্বাবুয়ে।[১৭] এখানকার শিশু-কিশোরদের মাঝে এইড্স মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। সাব-সাহারান দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% এইড্স রোগী।[১৮] এইডসের কারণে কেনিয়ায় শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কমে গেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে প্রতি গ্রাম সোনা উত্তোলন ব্যয় নয় ডলার বেড়ে গেছে।[১৯] এইচআইভি/এইড্স এর করাল গ্রাসে এখন উগান্ডার ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় কাজ করার মত জনশক্তির সংকটে অর্থনীতির বেহাল দশা।[২০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০০২ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে ৪ কোটি ২০ লাখ লোক এইচআইভি আক্রান্ত। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ২৫ লাখের মত। ঐ রিপোর্ট থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বে প্রায় ৭ কোটি নারী-পুরুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবে।[২১]

---

১৩. Asford, Lori S., Carl Haub, Mary M Kent, Nancy V. Yinger, Transitions in World population, উদ্ধৃত: মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, "বাংলাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে (প্রথম-দশম শ্রেণী) এইচআইভি/এইড্স সচেতনতা: পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫) পৃ. ৯৬

১৪. কবির উদ্দীন আহমাদ, ভয়ংকর মৃত্যু এইড্স থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়, উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মুসলেহ্ উদ্দীন, "এইড্স প্রতিরোধে ইসলাম", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯৩

১৫. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুব সমাজ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৭. ডা. হাফিজ লুনা শিখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯. 8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (Colombo 19-23 August, 2007) –http://www. icaap8.lk Accessed : 12 November 2008.

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২১. www.who.int/whr/2002/index.html Accessed : 13 November 2008.

বর্তমানে এইড্স নিয়ে বসবাসকারীদের ৯০ শতাংশের বসবাসই দরিদ্র দেশগুলোতে।[২২] গত দু'বছরে তাদের সহায়তা-কার্যক্রমে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে এমনটি বলা হয়ে থাকে। বাস্তবতা হলো, সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষদের মাত্র এক তৃতীয়াংশ এইডসের ওষুধ হাতে পান। ইউএসএইড এর দেয় তথ্যা অনুযায়ি, গত বছর গরীব দেশগুলোতে এইড্স বিরোধী লড়াইয়ে এক হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় ৮০০ কোটি ডলার কম।[২৩] ইউএনএইড এর নির্বাহী পরিচালক পিটার পায়োট বলেন, প্রতিদিন যতজন চিকিৎসা শুরু করেন তার চাইতে অন্তত তিনগুণ বেশি লোক এইডসে আক্রান্ত হন।[২৪]

অর্থাৎ অর্থের যোগান বাড়িয়ে যে এইড্স মোকাবেলা করা সম্ভব নয় সেটি সন্দেহাতীত। তাছাড়া বলাই বাহুল্য যে, এইড্স চিকিৎসায় এ পর্যন্ত ঐ সব ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যা দিয়ে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুকে প্রলম্বিত করা যায় মাত্র, এি এইচআইভি নির্মূলের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়।

এইডসের কারণে দারিদ্র্য ও বৈষম্য আরো প্রকট আকার ধারন করছে এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবাসমূহের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যা ভয়ানক স্বাস্থ্য সমস্যা ছাড়াও অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে।[২৫] ধনী রাষ্ট্রসমূহ এইড্স এর চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করলেও দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।

এইড্সঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেমে এইডসের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায় বিশ্বে এইড্স প্রথম নির্ণয় করার প্রায় এক দশক পরে ১৯৮৯ সালে।[২৬] এর পর থেকে এইড্স রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু এইড্স রোগীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয় অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। ২০০৩ সালে ৩৬৩ জন লোকের দেহে এইচআইভি পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চাইতে ছয়গুণ, ত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১৫ জন নতুনভাবে আক্রান্ত।[২৭] সরকারি তথ্য মতে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে, দেশে নিশ্চিত এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৬৫ জন।[২৮] সরকারি তথ্যে ২০০৭ সালের বাংলাদেশে এইডসের চিত্র ছিল নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশে এইড্স/এইচআইভি পরিস্থিতি, ২০০৭

এইচআইভি/এইড্স-এ আক্রান্তের সংখ্যা	১২০৭
২০০৭ সালে নতুন করে আক্রান্ত	৩৩৩
এইড্স এ মৃতের সংখ্যা	১২৭

২২. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৫ আগস্ট ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
২৫. কামরুন নাহার আহমেদ, মোঃ রবিউল ইসলাম ও মোছাঃ মুনিরা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২৬. বাংলাপিডিয়া, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এইড্স (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫
২৭. ডা. হাফিজ লুনা শিখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২৮. দৈনিক প্রথম আলো (সম্পাদকীয়), ১লা ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১০

তথ্যঃ NASP 2007

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট বহু সংস্থা সরকারের এরূপ তথ্যের সাথে একমত পোষণ করছেন না। বাংলাদেশে আরো বেশি সংখ্যায় আরো ভয়ংকরভাবে এইড্স বিরাজমান বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে। সরকার প্রদত্ত তথ্য যে পর্যাপ্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। এইড্স সম্পর্কিত যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি (ইউএনএইড্স) এর রিপোর্ট অন দ্য গ্লোবাল এইচআইভি/এইড্স এপিডেমিক ২০০২ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এইচআইভি-এইড্স আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,০০০।[২৯] অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের (২০০৪) এর হিসেব মতে, সংক্রমিত লোকের সংখ্যা সম্ভবত ১.১২ মিলিয়ন অথবা তারও বেশি ছাড়িয়ে গেছে।[৩০] প্রথম আলো আয়োজিত এক গোল টেবিল বৈঠকে বলা হয়, এখনই যদি আমরা এইড্স প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হই, তাহলে ২০১৫ সালের মধ্যে এইড্স বাংলাদেশে মহামারী আকার ধারন করবে।[৩১]

আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যেসব দেশ এইড্স আক্রান্ত বিষয়ক তথ্য নিয়ে লুকোচুরি করেছে, তথ্য গোপন করেছে, সেখানে এইড্স মহামারী আকারে হাজির হয়েছে। আবার সেই মহাদেশের মানুষই সাহসের সাথে এইড্স মোকাবেলা করে সফলও হয়েছে। উগান্ডার সরকার নিচুমাত্রা বা লো প্রিভিলেন্সের কথা বলে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। এখন উগান্ডার বহু গ্রামে প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী-পুরুষ নেই। অনাথ শিশুরা সে দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩২] বাংলাদেশের এইড্স ঝুঁকির বড় কারণ হলো এদেশের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। এইচআইভি/এইড্স সংক্রমণে ১০ টি শ্রেণীকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীই বাংলাদেশে উপস্থিত। এই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীসমূহের উপস্থিতি বাংলাদেশকে অতিদ্রুত এইড্স মহামারীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলো হলো, (১) অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনকারী প্রবাসী নারী-পুরুষ, (২) পাচার হওয়া নারী ও শিশু (৩) অনিয়ন্ত্রিত (বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত) যৌনকাজে লিপ্ত যুবক-যুবতী, (৪) বাণিজ্যিক যৌনকর্মী, (৫) হিজড়া, (৬) পথশিশু ও নারী (৭) পেশাদার রক্তবিক্রেতা, (৮) পুরুষ ও নারী সমকামী, (৯) সূচের মাধ্যমে ড্রাগ সেবনকারী, (১০) বাণিজ্যিক যৌনকর্মীদের সাথে যৌনসম্পর্কস্থাপনকারী যে কোন লোক (বিশেষ করে ট্রাক-বাস চালক, তাদের সহকারী ও রিক্সাচালক)।[৩৩] এই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তাদের পরিবার তথা সমাজে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে মূলত সেতুবন্ধন সৃষ্টিকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে অধিক পরিচিত।

দেশের বাইরে এবং ভিতরে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ পরিবার থেকে দূরে থাকছে এবং এদের একটি অংশ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে লিপ্ত আছে। নিজের ঝুঁকির সাথে সাথে এরা নিজের পরিবার ও যৌনসঙ্গীর জন্য সৃষ্টি করছে এইচআইভি/এইড্স সংক্রমণের ঝুঁকি। প্রবাস জীবন থেকে অনেকেই অনিয়ন্ত্রিত যৌনতার ফসল হিসেবে এইচআইভি নিয়ে দেশে ফিরে আসছে। কিন্তু এইচআইভি পরীক্ষা করানোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় এদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। এরা ক্ষেত্র বিশেষ নিজের অজান্তেই পরিবারের সদস্যসহ অপরাপর ব্যক্তির মাঝে এইচআইভি ছড়াচ্ছে। বালাদেশ থেকে প্রতিবছর শত শত নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাচার হচ্ছে। পাচার হওয়া মেয়েদের অধিকাংশই বাণিজ্যিক যৌনকর্মে লিপ্ত হতে

বাধ্য হয়। তথ্যানুযায়ী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৪৫ লাখ এইড্স রোগী রয়েছে।[৩৪] বাংলাদেশের পাচার হয়ে যাওয়া যেসব মেয়ে ও শিশু পরবর্তীতে দেশে ফিরছে তাদের অনেকেই এইচআইভি ভাইরাস নিয়ে আসছে। এরা পরবর্তীতে দেশে ফিরছে তাদের অনেকেই এইচআইভি ভাইরাস নিয়ে আসছে। এরা পরিবারের সদস্যসহ অনেকের জন্যই হুমকি।

বিশ্ব এইড্স দিবস ২০০৭ এর প্রতিপাদ্য ছিল, 'এইড্স প্রতিরোধে আমাদের অঙ্গীকার'। কিন্তু এই অঙ্গীকার যাদেরকে দিয়ে বাস্তবায়িত হবে সেই তরুণেরাই আজ এইড্স এর ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে ১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণদের একটা বড় অংশই অন্ধকার জীবনের সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছে।[৩৫] সমাজ ব্যবস্থা রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও আচরণ সংক্রান্ত সার্ভিল্যান্স উপাত্ত (ডাটা) থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে বিবাহিত ও অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের সম্মতিতে ও অসম্মতিতে অনিরাপদ যৌনমিলনের ঘটনা ঘটে, যা এইচআইভি বিস্তারের জন্য খুবই সহায়ক।[৩৬]

তাছাড়া যুবসমাজ অনিরাপদ যৌন আচরণের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে অসচেতন এবং তারা কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে কম জানে। আইসিডিডিআরবি, পপুলেশন কাউন্সিল এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএসএ পরিচালিত কিছু জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের তরুণ শ্রেণীর মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ যৌনাচারে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে মাত্র ২২ শতাংশ তরুণ এইচআইভি সংক্রমণের পথ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন।[৩৭]

---

২৯. এইচআইভি/এইড্স ম্যানুয়াল, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড হেলথ প্রোগ্রাম কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট পার্টনারশীপ (বিউআইপি), ঢাকা এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি), ঢাকা, মে ২০০১, পৃ. ১১

৩০. উদ্ধৃত : মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩১. ডাঃ মাহমুদ আবদুস সেলিম, "এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে?" (প্রথম আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক) দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৯

৩২. 8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (Colombo 19-23 August, 2007)- http://www.icaap8.lk, accessed : 12 November 2008.

৩৩. "এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭ এবং শাহিদা বেগম, "এইড্স প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব" (ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬), পৃ. ৫

৩৪. Asford, Lori S., Carl Haub, Mary M Kent, Nancy V Yinger, Transmitions in World Population, উদ্ধৃতঃ মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৫. ওলীউর রহমান বর্ণভী, "মরণব্যাধি এইড্সঃ ধর্মীয় অনুশাসনই যার প্রতিকার" (ঢাকাঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৯ জানুয়ারী ২০০৭), পৃ. ১৪

৩৬. এইচআইভি প্রতিরোধে এনজিওদের ভূমিকা, জাতীয় এইড্স/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএসএ এর যৌথ কর্মসূচী, ২০০৫, ঢাকা।

৩৭. দৈনিক প্রথম আলো (সম্পাদকীয়), ১ ডিসেম্বর ২০০৭।

বাংলাদেশে বিবাহ্-পূর্ব ও বিবাহ্-বহিঃর্ভূত যৌন সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে লক্ষাধিক বাণিজ্যিক যৌনকর্মী রয়েছে যারা এইড্স বিষয়ক বাস্তব কোন শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি।[৩৮] এ সকল যৌনকর্মীদের কাছে লক্ষ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। যৌনকর্মীদের মধ্যে নিরাপদ যৌনমিলনের হার মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।[৩৯] তথ্য মতে, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি হোটেলে বাণিজ্যিক যৌনকর্ম হচ্ছে, যার খদ্দের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।[৪০] একটি সার্ভে রিপোর্টে দেখানো হয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বাণিজ্যিক যৌনতার খদ্দের।[৪১] ভয়াবহ বিষয় হলো বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের সপ্তাহ্ প্রতি যৌনসঙ্গীর গড় সংখ্যা এশিয়ার অন্য যেকোন দেশের তুলনায় বেশি।[৪২] তথ্য মতে, পতিতালয়ের একজন যৌনকর্মী সপ্তাহে গড়ে ১৮.৮ জন এবং হোটেলের একজন যৌনকর্মী সপ্তাহে গড়ে ৪৪ জন খদ্দেরের সাথে মিলিত হয়।[৪৩] আমাদের নৌ ও সমুদ্রবন্দর এলাকায় অহরহ বিদেশী নাবিক বা নাগরিক আসছে এবং যৌন শিল্প এলাকায় অতিথি হচ্ছে। ভয়াবহ বিষয় হলো এসব যৌনকর্মীরা যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে লিপ্ত এদের এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আবার এদের গড় যৌনসঙ্গীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় কোন যৌনকর্মী এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার পর পরই অতিদ্রুত তা অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে শহর এলাকায় রয়েছে বিপুল সংখ্যক হিজড়া জনগোষ্ঠী। সমাজের অপরাপর মানুষের সাথে এদের রয়েছে ঘনিষ্ট যোগাযোগ। এই জনগোষ্ঠী সংগত কারণেই বিকৃত যৌনতায় অভ্যস্ত যা এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক। দেশের শহর এলাকায় রয়েছে বিপুল ভাসমান শিশু ও নারী। এরা স্বেচ্ছায় আবার কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং দেশে এইড্স ছড়াচ্ছে। এদেশের যুব সমাজ পারিবারিক দ্বন্দ্ব, হতাশা, অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন ধরনের মাদকে আসক্ত হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য মতে, বাংলাদেশের মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮ লাখ।[৪৪] এদের মধ্যে

---

৩৮. এইচআইভি/এইড্স ম্যানুয়াল, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড হেলথ প্রোগ্রাম, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট পার্টনারশীপ (কিউ আই পি), ঢাকা এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি), ঢাকা, মে, ২০০১, পৃ. ১১

৩৯. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৪০. "এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে?" প্রথম আলো আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠক (ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫), পৃ. ৯

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪২. HIV in Bangladesh: Where is it going?, National AIDS/STD Programme, DGHS, MOHFW, Bangladesh, Dhaka, 2003, P-3.

৪৩. মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, "বাংলাদেশের বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে (প্রথম-দশম শ্রেণী) এইচআইভি/এইড্স সচেতনতা: পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা," ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫), পৃ. ১০৫

৪৪. Bangladesh: Brutality Fueling HIV/AIDS, মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

একটি বড় অংশ সূঁচ, সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় নেশাগ্রহণ করে।[৪৫] বিভিন্ন তথ্য উপাত্তে দেখা যায়, দেশে এ ধরনের নেশাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীরা প্রাথমিক পর্যায়ে ৪-১০ বছর অন্যান্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার পর ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকগ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।[৪৬]

এরা সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। সমাজের অপরাপর জনগণের সাথে এরা সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিত যৌনকর্মীদের সাথে দৈহিক মিলনে অভ্যস্ত, কেউ কেউ আবার বিবাহিত। অর্থের বিনিময়ে তারা মহিলা ও পুরুষের সাথে যৌনকর্ম করে এবং রক্ত বিক্রি করে।[৪৭] তথ্য মতে, ৬০ শতাংশ ইনজেকশন-ড্রাগ ইউজার বাণিজ্যিক যৌনতার খদ্দের।[৪৮] তথ্য মতে, ৭০ ভাগের বেশি মাদক গ্রহণকারী নিজেদের মধ্যে সিরিঞ্জ বিনিময় করে।[৪৯] ফলে রক্তের মাধ্যমে এই শ্রেণীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে অতিদ্রুত। ২০০৩ সালে এ শ্রেণীর মাঝে এইড্স সংক্রমণের হার ছিল ৪ শতাংশ; ২০০৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪.৯ শতাংশে।[৫০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এইচআইভি সংক্রমণের হার যদি ৫ ভাগ ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সেটিকে মহামারী বলা যাবে।[৫১] সেক্ষেত্রে বলা চলে ইতোমধ্যে এই শ্রেণীর মাঝে এইড্স মহামারী আকার ধারন করেছে। এর চাইতেও ভয়াবহ তথ্য হলো, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একটি বিশেষ এলাকায় ২০০৩ সালে এই শ্রেণীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ছিল শতকরা ৮.৯ ভাগ।[৫২] আচরণগত সার্ভিল্যান্সে দেখা যায় যে, বিপুল সংখ্যক পুরুষ (রিক্সাচালক, ট্রাক চালক, ছাত্র) অর্থের বিনিময়ে যৌনকর্ম অব্যাহত রেখেছে, যা এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অধিক। বাণিজ্যিক যৌনতার খদ্দেরদের এক তৃতীয়াংশ রিক্সা ও ট্রাক ড্রাইভার।[৫৩] এদের মধ্যে অধিকংশই পেশাদার যৌনকর্মীদের মধ্যে কনডম ব্যবহারের হার সবচাইতে কম। যেসব রিক্সা ও ট্রাক চালকদের মধ্যে জরিপ চালানো হয়েছে তাদের এক তৃতীয়াংশ সারাজীবনে একবারও কনডম ব্যবহার করেনি এবং এদের অধিকাংশেরই ধারণা যে, তাদের এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি নেই।[৫৪] এছাড়াও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশী নাগরিকদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। এদেশগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠী এইড্স এ আক্রান্ত যা বাংলাদেশের জন্য একটি ঝুঁকির কারণ।

---

৪৫. এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৪৬. HIV in Bangladesh: Is Time Running Out? National AIDS/STD Programme, DGHS, MOHFW, Bangladesh, Dhaka, 2003, P-3.

৪৭. Ibid, P-3

৪৮. "এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে?", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪৯. শামীম আল-আমিন, "এইড্স ঝুঁকি কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ", ছুটির দিনে (দৈনিক প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন), সংখ্যা-৩৩৬, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ৪

৫০. শামীম আল-আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫৩. এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে? প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫৪. HIV in Bangladesh: Is Time running out?, Ibid, P-3

এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসনঃ
বিশ্বব্যাপী জরিপে প্রমাণিত হয়েছে যে, শতকরা ৭০ ভাগ এইচআইভি সংক্রমিত হয় নারী-পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে; ১০ ভাগ সংক্রমিত হয় সমকামিতার মাধ্যমে এবং ৫ ভাগ সংক্রমিত হয় মাদকাসক্তির কারণে। এছাড়া এইচআইভি আক্রান্তের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে বাকী ১৫ ভাগ মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে।[৫৫] অবশ্য বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের ৮০ শতাংশই যৌনতার মাধ্যমে সঞ্চারিত।[৫৬] এ সংক্রমণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দায়ী এইড্স সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতার অভাব। জরিপ অনুযায়ি, রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৮ ভাগ শিক্ষার্থী, ৪৫ ভাগ শিক্ষক এবং ৫৪ ভাগ অভিভাবক ভয়াবহ এই ব্যাধি সম্পর্কে কিছুই জানেন না।[৫৭] এসব কারণে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে ইদানিংকালে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে–A, B, C, D, E ইত্যাদি।[৫৮]

A = Abstainance (বিয়ের আগে যৌনমিলন অথবা বিয়ের পর স্ত্রী/স্বামী ছাড়া অপর কারো সাথে যৌনমিলন করা হতে বিরত থাকা।)
B = Be Faithful to your partner (স্ত্রী/স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।)
C = Careful about sex and blood transmission (নিরাপদ যৌনসম্পর্ক ও রক্তসঞ্চালনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা।)
D = don't take drug (নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না কর)।[৫৯]
E = Education (শিক্ষা)।[৬০] ইসলাম ধর্মে এ সব ক'টি বিষয়েই সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ইসলামে অবৈধ (বিবাহ বহির্ভূত) যৌনকর্ম বা ব্যভিচারকে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন মতে এ ধরনের কর্ম থেকে শুধু বিরত থাকাই কর্তব্য নয়; অধিকন্তু এর প্রতি যে কোন ধরনের কামনাও অবশ্য পরিহার্য। তা বিয়ের পূর্বেই হোক আর বিয়ের পরেই হোক। অর্থাৎ ইসলাম যেমন বিয়ের পূর্বে (অবিবাহিত অবস্থায়) যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে; তেমনি নিষিদ্ধ করেছে বিবাহিত জীবনে স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে (বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত) যৌন সম্পর্ককে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৬১] অর্থাৎ যিনা করা তো দূরের কথা, যিনার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে নিকৃষ্ট আচরণ বলতে বুঝানো হয়েছে, নারী-পুরুষের সেসব আচরণ যা অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করে কিংবা ব্যভিচারের দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। যা দেখলে বা শুনলে যিনার ভাব জাগ্রত হতে

---

৫৫. মুহাম্মদ ইউনুস আখন্দ, সংগ্রামী জীবন এবং এইড্স থেকে পরিত্রাণ, উদ্ধৃতঃ মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, "এইড্স প্রতিরোধে ইসলাম," ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ২০০৪), পৃ. ২৯৩
৫৬. Mostafa Kamal Majumder, HIV/AIDS-Bangladesh: Bluprint to Avert AIDS Desaster. উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও মোঃ রবিউল হক, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৫
৫৭. শামীম আল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৫৮. "এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে?"প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৫৯. "এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে যুবসমাজ," প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০
৬০. "এইড্স প্রতিরোধে আমরা কোন্ পথে?", প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৬১. আল-কুরআন, ১৭:৩২।

পারে তার ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। ইসলাম নারী-পুরুষকে তাদের দেহের ঐসব অংশ আবৃত রাখতে আদেশ করে যার মধ্যে একে অপরের যৌন আকর্ষণ পাওয়া যায়। নগ্নতা এমন এক অশ্লীলতা, যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ইসলাম নারী ও পুরুষকে অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদেরকে বড় হওয়ার সাথে সাথে পর্দা করার আবশ্যিক বিধান দিয়েছে। নর-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ ইসলামে নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ইচ্ছা করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রসার হোক, তাদের জন্য পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখিরাতেও।"[৬২] অন্যত্র বলেছেন, "হে নবী, মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"[৬৩]

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক। তাওরাত ও ইনজীলেও এর প্রমাণ আছে। 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) এর দ্বিতীয় বিবরণ, 'নানা বিষয়ের আদেশ' শিরোনামের স্রোস্তে বলা হয়েছে, "যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগর দ্বারের নিকট আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে.....এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"[৬৪] যাবূর এ আছে, "যিনাকারী পুরুষ ও নারীকে জাহান্নামে তাদের লজ্জাস্থানের সহি বাঁধিয়া টানাইয়া রাখা হইবে এবং লোহা দিয়া পিটানো হইবে। যদি কেহ এই শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করে তখন জাহান্নামের ফেরেশতারা তাহকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিবে, সেই আওয়াজ এখন কোথায়–যখন তুমি হাসিতে, স্ফূর্তি করিতে, গর্ব করিয়া চলিতে, আল্লাহকে লজ্জা ও পরোয়া করিয়া চলিতে না?"[৬৫]

অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করবে। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও তবে মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬৬] পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, "আর বিবাহিতের শাস্তি দোররা ও রজম[৬৭]।"[৬৮]

---

৬২. আল-কুরআন, ২৪:১৯।
৬৩. আল-কুরআন, ২৪:৩০।
৬৪. মাওলানা আব্দুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃ. ২২২
৬৫. ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, কবীরা গুনাহ্, বাংলা অনুবাদ আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), পৃ. ৬৩
৬৬. আল-কুরআন, ২৪:২।
৬৭. 'রজম' একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। ফিক্হ এর পরিভাষায়, বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত বিশেষ শাস্তিকে 'রজম' বলা হয়। এ বিশেষ শাস্তিস্বরূপ বিবাহিত ব্যভিচারীকে এবং বিবাহিতা ব্যভিচারিণীকে তাদের ব্যভিচারের কারণে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২ তম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮৯-১৯২।)
৬৮. সহীহ্ মুসলিম, আল-হুদূদ অধ্যায়। অনুচ্ছেদ : হাদ্দুঝ ঝিনা (আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ,সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ১৬৯০, পৃ. ৯৭৭

অন্যদিকে যারা ব্যভিচারী নয় তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যৌন অঙ্গের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহএক অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, ইহাদিগের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[৬৯] ইসলামের এই অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করা হলে অবৈধ যৌন সংসর্গ স্থাপন (যা ৭০-৮০% এইচআইভি সংক্রমণের জন্য দায়ী) সম্ভব নয়। ইসলাম কখনো মানুষের যৌন চাহিদাকে অবদমিত করার পরামর্শ দেয় না। ইসলাম যৌনসম্ভোগের বৈধ উপায় দেখিয়ে দিয়েছে। তাই ইসলাম বিয়ে করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছনন্নতা, মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রধান উপায় বিয়ে। বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। বিয়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আয়্যিম (যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই অবিবাহিতা বা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা যাই হোক) তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও । তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৭০] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টিকে আনত রাখে এবং গুপ্তাঙ্গের হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার জৈবিক ক্ষুধাকে অবদমিত করে।"[৭১] সর্বোপরি বিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। অন্যদিকে বিয়ে না করা স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর। বিবাহে বিলম্ব করণ মানুষকে ব্যভিচার, বিকৃত যৌনাচার ও যৌন সংশ্লিষ্ট অপরাধের পথে ধাবিত করে।

সমকামিতা এইড্স সংক্রমণের অন্যতম কারণ। ইসলামে সমকামিতাসহ সকল প্রকার বিকৃত যৌনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম সমকামিতা অনুমোদন না করার অন্যতম কারণ হলো এটি নারী-পুরুষদের বিবাহ বন্ধনের নিয়ম থেকে দূরে রাখে। ফলে সমাজে বিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানব বংশ বৃদ্ধির মূলে সমকামিতা এক মারাত্মক কুঠারাঘাত।[৭২] প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে জর্ডানের সাদুম এলাকায় সমকামিতা নামক অপকর্মটি সূচিত হয়। সাদুমবাসী ছিল হযরত লূত (আ.) এর উম্মাত। এ পাপাচার থেকে তিনি তাদের বিরত রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও নিবৃত্ত করতে পারেননি।

---

৬৯. আল-কুরআন, ২৪:৩৫।

৭০. আল-কুরআন, ২৪:৩২।

৭১. ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল-মাসাবীহ্ (কলিকাতা: এম বশীর হাসান এন্ড সন্স, তা.বি), পৃ. ২৬৭

৭২. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্স রোগের উৎস ও প্রতিকার (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ. ২০

ফলে আল্লাহর অভিশাপে সাদুম জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। এলাকাটি বর্তমানে মৃত সাগর (Dead Sea) নামেই পরিচিত।[৭৩] সমকামী সম্পর্কে ইসলামের কঠোর মনোভাব উপলব্ধি করা যায় আল্লাহর ঘোষণা থেকে, "তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট।"[৭৪] এ জঘন্য কুকর্ম প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা কি এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরাতো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।"[৭৫]

সমকামীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "চার শ্রেণীর লোক আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে সকাল বেলা উঠে সন্ধ্যায় পৌঁছায়। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তারা হলো–নারীবেশী পুরুষ, পুরুষের বেশধারী নারী, পশুর সাথে সঙ্গমকারী এবং সমকামী।[৭৬] তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে লূত জাতির অপকর্মকে সর্বাধিক ভয় করি। যারা এ অপকর্মে লিপ্ত হবে আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন। কাজেই তোমরা যাদেরকে লূত (আ.) এর জাতির মত অপকর্ম করতে দেখবে তাদের হত্যা করবে।"[৭৭] সমকামীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি তোমাদের ওপর ভীষণ বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।"[৭৮] অপর আয়াতে এসেছে, "আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। সেটা লোক চলাচলের পার্শ্বে এখনো বিদ্যমান।"[৭৯]

এইচআইভি সংক্রমণের আরেকটি কারণ হলো বিকৃত যৌনতা। কেউ কেউ যৌনাচারের এক ঘেয়েমি দূর করতে বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যা যাবতীয় দুরারোগ্য রোগ ব্যাধি ও বিপদের কারণ। বিকৃত যৌনাচারের অন্যতম হলো পায়ুকাম, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সংগম করে অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সংগম করে .... সে মুহাম্মাদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত কিতাবকে অস্বীকার করলো।"[৮০]

---

৭৩. ডাঃ খোন্দকার বুলবুল সারওয়ার ও মুহাম্মদ ছাইদুল হক, "এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক শিক্ষণ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭), পৃ. ৬৬

৭৪. আল-কুরআন, ৭: ১৭৯।

৭৫. আল-কুরআন, ৭: ৮০-৮১।

৭৬. হাফিজ নূরুদ্দীন আলী ইব্ন আবু বকর আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ (দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭২

৭৭. ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭৮. আল-কুরআন, ৭ : ৮৪।

৭৯. আল-কুরআন, ১৫: ৭৪-৭৬।

৮০. ইমাম তিরমিযী, সুনান আত্ তিরমিযী, অধ্যায় আত্ তাহারাত, অনুচ্ছেদ : মা জায়া ফী কারাহিয়াতি ইতয়ানিল হায়েয (আল কুতুবুস সিত্তাহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০) হাদীস নং ১৩৫, পৃ. ১৬৪৭

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সংগম করে সে অভিশপ্ত।"[৮১] অপর এক হাদীসে এসেছে, "তোমরা সম্মুখ কিংবা পিছনের দিক থেকে সংগম করতে পার। তবে গুহ্যদ্বার এবং ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস করা থেকে বিরত থাকবে।"[৮২] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "নারীরা হচ্ছে তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেভাবে ইচ্ছা তোমরা চাষ কর।"[৮৩]

অর্থাৎ সামনের দিক কিংবা পেছনের দিক যেদিক থেকে ইচ্ছা সংগম করা যাবে, তবে সর্বাবস্থায় তা একই জায়গা হতে হবে। আর তা হলো সংগমস্থান তথা নারীর যোনিপথ।[৮৪] উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসসমূহ পর্যালোচনার পর কোন কোন ফিকহবিদ স্ত্রী লোকের গুহ্যদ্বারে সংগম করাকে হারাম বলে অভিহিত করেছেন।[৮৫]

নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের যে বিষয়টি তা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির রক্তদান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ একটি প্রক্রিয়া। একজন ব্যক্তির রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত হলো- সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহার বৈধ। নিরুপায় অবস্থায় কথাটির অর্থ হলো, রোগীর জীবন যদি আশংকাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোন ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর না হয়, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া পবিত্র কুরআনের সে আয়াতের মর্মানুযায়ী জায়েয হবে যে আয়াতে অনন্যোপায় হয়ে মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৮৬] এখানে লক্ষণীয় যে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টি ইসলাম সীমিত পর্যায়ে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। আর তা হলো মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষার কথা বিবেচনায় এনে। আর এ ক্ষেত্রে যদি আমরা অসতর্কতাবশতঃ এইচআইভি/এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত একজন অসুস্থ রোগীর শরীরে স্থানান্তর করি তাহলে জীবন রক্ষার তো প্রশ্নই ওঠেনা; বরং নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুনবে, যা কখনোই ইসলাম অনুমোদন করে না। সুতরাং স্পষ্টভাবেই বলা যায় এইচআইভি/এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত কোনভাবেই অপর মানুষের জন্য গ্রহণ করা উচিৎ হবে না এবং এটা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। কারো অবহেলা অথবা অসৎ উদ্দেশ্য (যেমন ব্যবসায়িক মুনাফা) চরিতার্থ করার জন্য যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকবে এবং সে জন্য দায়ী ব্যক্তিকেই জবাবদিহি করতে হবে।

এছাড়াও ইসলামে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে মেনে চলা হলে ডাক্তারি বা ক্ষত সৃষ্টিকারী যন্ত্র দ্বারা এইচআইভি সংক্রমণ সম্ভব নয়।

---

৮১. ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: আন্ নিকাহ্, অনুচ্ছেদ: ফী জামিয়িন নিকাহ্ (আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০) হাদীস নং ২১৬২, পৃ. ১৩৮২

৮২. ইমাম তিরমিযী, সুনান আত্ তিরমিযী, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন, (আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০) হাদীস নং ২৯৮০, পৃ. ১৯৫১

৮৩. আল-কুরআন, ২: ২২৩।

৮৪. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৮৫. ড.ওয়াহবা আয যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দারুল ফিক্র, দামিশ্ক, সিরিয়া, ১৪০৯/১৮৮৯), তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৫৫১

৮৬. মুফতি মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন,অনুবাদ: মাওলানা মহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫) প্রথম খন্ড, পৃ. ৪৬৭

এইড্‌স সংক্রমণের আরেকটি ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হলো মাদকগ্রহণকারী; নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীরা। ইসলাম মদ ও মাদক জাতীয় সকল প্রকার সেব্য-অসেব্য দ্রব্যই হারাম করেছে। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর-এসব নোংরা অপবিত্র, শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তাছাড়া শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতা সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। এরপরও কি তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে না?"[৮৭]

কুরআনের আরও অনেক স্থানে, যেমন, ২ নম্বর সূরার ২২৯ নম্বর আয়াতে, ৫ নম্বর সূরার ৯০-৯১ নম্বর আয়াতে, ৪৭ নম্বর সূরার ১২ নম্বর আয়াতে, ৩৬ নম্বর সূরার ৪১ নম্বর আয়াতে মদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে 'মদ' গাঁজা, হেরোইন, আফিম, প্যাথেড্রিন, বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি নানান নামে পরিচিত। এ বিষয়ে মহানবী (স.) বলেছেন, "আমার উম্মাত মদ পান করবে, তবে তারা অন্য নাম দিবে।"[৮৮]

যে নামই দেয়া হোক না কেন তার বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া একই রকম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল (স.) বলেন, "প্রত্যেক নেশা উদ্যেককারী জিনিস মদ এবং প্রত্যেক মদ ও প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।"[৮৯] তিনি আরও বলেন, "মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহের উৎস।"[৯০] এবং "আল্লাহ্‌ তাআলা আমার উম্মাতর জন্য মদ ও জুয়া হারাম করে দিয়েছেন।"[৯১] মাদক গ্রহণের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন, "মদ পানকারী, পরিবেশনকারী, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, উৎপাদনকারী, যার জন্য তা উৎপাদন করা হয়, পরিবহণকারী, যার জন্য পরিবহণ করা হচ্ছে সকলকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন।"[৯২] উল্লেখ্য যে, শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, যে দ্রব্যই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে হরণ করে, চেতনাকে বিলোপ করে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে এমন সব দ্রব্যও নিষিদ্ধ। গাঁজা, আফিম, কোকেন প্রভৃতি এ পর্যায়েরই জিনিস। এ সব বস্তু মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এমনকি এতে মানুষ নিজের সত্তা, নিজের ধর্ম ও দুনিয়া সবকিছুই ভুলে গিয়ে নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শুরু করে।[৯৩] ফলে দুর্নীতি ও অসৎ পন্থা অবলম্বনেও তাদের কোন কুণ্ঠা ও দ্বিধা থাকে না।[৯৪] নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের এই অনুশাসন মেনে চললে এইচআইভি সংক্রমণে সহায়ক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করাই সম্ভব নয়।

---

৮৭. আল-কুরআন, ৫:৯০-৯১
৮৮. হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-হায়সামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৮৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ্‌ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদঃ বয়ানু আন্না কুল্লা মুসকারিন খামরুন ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারাম (আল-কুতুবুস সিত্তাহ্‌, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৫২১৭, পৃ. ১০৩৬
৯০. কানযুল উম্মাল, উদ্ধৃতঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ৬৩২
৯১. কানযুল উম্মাল, উদ্ধৃতঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩
৯২. ইমাম আবূ দাউদ, সুনানু আবূ দাউদ, অধ্যায়ঃ আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিস সাকার (আল-কুতুবুস সিত্তাহ্‌, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৩৬৭৪, পৃ. ১৪৯৫
৯৩. আল্লাহ্‌ ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুচ্ছেদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৮
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

পিতা-মাতাকে একটি সন্তানের জন্মপূর্ব এবং জন্মপরবর্তী অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা, সুস্থভাবে বেড়ে ওঠাসহ সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার সকল দায়িত্বই পিতা-মাতার। আর তাইতো পরিবারকে বলা হয় 'প্রাচীর দুর্গ'। যেই প্রাচীরকে ভেদ করে কোন অনিষ্ট সন্তানকে আক্রান্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে পিতা-মাতাই অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে সন্তান গ্রহণের পূর্বেই যদি পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়েই এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্ত হন, তাহলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী হবে? এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো-ইসলাম যেহেতু মানুষের কল্যাণের জন্য, পিতামাতা সন্তানের কল্যাণের জন্যই নিবেদিত; তাই পিতা-মাতার উচিৎ হবে এক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আর বিবাহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য জৈবিক চাহিদা পূরণ। এক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় পর্যায়ে 'আযল'[৯৫] করতে পারে। 'আযল' এর বৈধতা সম্পর্কে হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস দুটি উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) এর সময়ে আমরা (সাহাবীগণ) আযল করতাম। ঐ সময়ে কুরআন অবতীর্ণ হত।"[৯৬]

তিনি আরও বর্ণনা করেন, "আমরা সাহাবীরা আল্লাহর রসূল (স.) এর সময় আযল করতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকটে পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।"[৯৭] বিশেষজ্ঞগণ এইচআইভি সংক্রমণে অজ্ঞতাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেন। অবাধ যৌনাচারই বলি আর রক্তের সংস্পর্শে এসে এইচআইভি সংক্রমণের কথাই বলি না কেন এর একটা বড় কারণ হলো এ সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকা। এ জন্য এইড্‌স সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বলা হয়, "বাঁচতে হলে জানতে হবে।" কুরআনের প্রথম বাণীও এসেছিল জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে।[৯৮] আল্লাহ তাআলা বলেন, "জ্ঞানান্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক (ফরয)।"[৯৯] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?"[১০০] শিক্ষার বিস্তারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে অগ্রসরমান একটি দলকে সর্বদা কাজ করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য হলো, "তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেন কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্য বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেন নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে তারা (ইসলাম বিরোধী ও মানব বিধ্বংসী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে।"[১০১]

---

৯৫. 'আযল' হলো রতঃস্খলনের পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যোনি অভ্যন্তরে বীর্যস্খলন না করে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গ বের করে অন্যত্র বীর্যপাত ঘটানো।

৯৬. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, অধ্যায়: আন্-নিকাহ্, পরিচ্ছেদ: 'আল-আযল'(কলিকাতা: রশীদ হোসাইন এন্ড সন্স, ১৯৭৩), পৃ. ৭৮৪

৯৭. মুসলিম ইব্‌ন আল্ হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ্ মুসলিম, ১ম খন্ড, অধ্যায়: নিকাহ্, পরিচ্ছেদ: হুকমুল আযল (আযল (করাচী:আসাহ্‌হাল মাতাবী, ১৯৩০) পৃ. ৪৬৫

৯৮. রাসূলুল্লাহ্ স. এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম প্রত্যাদেশ (ওহী) ছিল, "পড় তোমার প্রভূর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন, ৯৬: ১)

৯৯. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, কিতাব আল 'ইলম, পৃ. ৩৪

১০০. আল-কুরআন, ৯:৩৯।

১০১. আল-কুরআন, ৯: ১২২।

মিশরীয় দার্শনিক প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব তাঁর æThe Concept of Islamic Education” এ বলেন, “শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচী যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।”[১০২] ইসলামে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যকে দুটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত অর্জিত জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ, হালাল-হারাম সহ ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অনাচার, ব্যভিচার থেকে বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে। অন্যদিকে, জাগতিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এইড্‌স, এইডসের কারণ, প্রতিরোধের উপায় এবং এ সংক্রান্ত ইসলামের অনুশাসন সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে। জানানোর ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন পর্যাপ্ত এবং ব্যাপক। প্রতি শুক্রবারে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মসজিদে যায়। দুই ঈদে প্রতি বছর কয়েক কোটি মুসলমান ঈদের জামাতে সমবেত হন। সমবেত এই জনতার কাছে অতি সহজেই এইড্‌স এবং এ সম্পর্কিত ইসলামের অনুশাসন তুলে ধরা যায়। তাছাড়া জাতীয় পাঠ্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শৈশবেই শিশু কিশোরদের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো যেমন এইড্‌স সংক্রমণের উপায় এবং এ সংক্রান্ত ইসলামী অনুশাসন সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরতে পারে, তেমনি প্রিন্ট মিডিয়াও এ সংক্রান্ত প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে মিডিয়াগুলোতে এইড্‌স বিরোধী যে প্রচারণা চলছে তাতে ইসলামের অনুশাসন প্রাধান্য পাচ্ছে না; ক্ষেত্র বিশেষে ব্যভিচারকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনিরাপদ যৌনতার ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করতে অথবা বিশ্বস্ত সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। অথচ ইসলামের অনুশাসন মেনে চললে এইড্‌স থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কনডম বা বিশ্বস্ত সঙ্গী খুঁজে যৌন মিলনের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এইড্‌স সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণায় ইসলামকে জানতে এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়াগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত করা জরুরী। সর্বোপরি, এইড্‌স প্রতিরোধের সবচাইতে উত্তম পথ হচ্ছে সমাজে অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা এবং এক্ষেত্রে সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে বাংলাদেশকে এইডস এর করাল গ্রাস মুক্ত রাখা।

---

১০২. Professor Muhammad Qutb, The Concept of Islamic Education, উদ্ধৃত, মোঃ শামসুল আলম ও মোঃ জহিরুল ইসাম, “ইসলামের শিক্ষাদর্শন”, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ (ঢাকা: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-জুন ২০০৭), পৃ. ১০১

বাংলাদেশে শিশু অপরাধ ও ইসলাম

শিশুর পরিচয়:

প্রত্যেক মানব শিশু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে পিতা-মাতা এবং মানবজাতির জন্য নিয়ামত। পৃথিবীতে মানব জাতি আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। মানব জাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এ শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহ'র সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ধন-সম্পদ ও শিশু পার্থিব জীবনের শোভা।[১]

এই মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই কতিপয় মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তথা ইসলামী জীবন-দর্শনে মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ মাবনরূপে গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করছে। শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে এ শিশুর পরিচয় তথা শিশু কাকে বলে বা কত বছর বয়স পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

শিশু শব্দের আভিধানিক অর্থ- মানুষের শাবক।[২] 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে শিশু[৩] অর্থ করা হয়েছে "প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে শিশু বলা হয়।" পরিভাষায় "মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানবসন্তানকে শিশু বলে।"[৪]

---

১. আল-কুরআন, ১৮ ঃ ৪৬

২. জ্ঞানেন্দ্রেমোহন দাস-এর 'বাংলা ভাষার অভিধান' এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতিতে শিশু বলতে বোঝানো হয়েছে অনূধর্ক্ষ আট কিংবা ষোল বছরের বালক, পরবর্তীকালে সমবয়সী বালক-বালিকাসহ অনুধর্ক্ষ ১৬ বছরের মনুষ্য সন্তানকে। তবে উইলিয়াম কেরীর 'Dictionary of Bengali Language' এ শিশুকে 'ইনফ্যান্ট'-এর সমার্থক বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "শিশু Form kk& to go by leaps, a child, an infant, a boy under eight years of age."

৩. আরবি ভাষায় শিশুকে 'আততিফ্ল' এবং বহুবচনে 'আতফাল' বলা হয়। অনুরূপ 'আততিফ্ল' শব্দকে 'আতফালাতুন' 'তুফূলিয়্যাতুন' ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া 'আচ্ছবিয়্যু' বহুবচনে 'আচ্ছিবইয়্যানু'; 'আচ্ছগীরু' বহুবচনে 'আচ্ছিগারু'; আল-অলাদু, বহুবচনে 'আলআওলাদু'; 'গুলামুন' বহুবচনে, 'গিলমানুন'; কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনে যথাক্রমে, 'ছবিয়্যাতুন'-'ছবিয়্যাতুন'; 'বিনতুন'-বানাতুন'; বিস্তারিত দেখুন, ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরূত: তা. বি. খ. ১১, পৃ. ৪০১

৪. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ, ৪০১

বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত Oxford English Dictionary তে শিশুর অর্থ বলা হয় Childhood: The state or stage of life of a child. The time during which one is a child the time from birth to puberty.[৫]

শিশুর সামগ্রিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে ও নিরূপণে জাতীয় নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। জাতিসংঘ সনদের ধারা-১ এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত কর হয়েছে।[৬]

তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এ বয়সের মানব সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই ১৮ বছরের নিচে শিশু; যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসেবে অনুমোদন করে।[৭]

বাংলাদেশে জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ শিশু। অর্থাৎ বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৫ লাখ। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু সকল আইন, নীতি ও চর্চা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশে তেমনটি হচ্ছে না। এখানে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মতো শিশুর কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এ সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষাদানকারী সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের (যেমন, কাজ সম্পর্কিত) অধিকাংশতেই যে বয়স পর্যন্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা ১৮ বছরের বেশ নিচের, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্র ১১ বছর পর্যন্ত। আর একটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা এই যে, ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশব কালের সমাপ্তি ঘটে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে এ সব অসামঞ্জস্য এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন ও নীতির মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতির অর্থ হচ্ছে, অনেক শিশুই সনদ অনুসারে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে; যদিও তাদের সেটি পাওয়ার কথা।

তাছাড়া বাংলাদেশের শিশু বিষয়ক বিভিন্ন নীতি, সংবিধান ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়সভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে গরমিল দেখা যায়। বাংলাদেশে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের কম অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে নিম্ন বর্ণিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া আছে।

* ৭ বছরের নিচের শিশু	:	কোনো অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।
* ৬-১০ বছরের শিশু	:	সব শিশুকে স্কুলে পাঠানোর বিধান আছে।
* ১২ বছরের নিচের শিশু	:	দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। (শিক্ষানবীশ ব্যতীত)

---

৫. Shorter Oxfort English Dictionary, Vol-1, 15th Edition, A-m, New York. Oxford University Press, 1993. P. 394.

৬. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, ঢাকা : ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭, পৃ. ৯

৭. ক্লাস্টার, রাইটস, শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ঢাকা: ইউনিসেফ, ১৯৯২, পৃ.৮

* ১৪ বছরের নিচের শিশু	:	কলকারখানার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
	:	ভবঘুরেদের প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে।
	:	জাতীয় শিশুনীতির আওতায় অধিকার সংরক্ষিত।
* ১৫ বছরের নিচের শিশু	:	পরিবহণ খাতের কয়েকটি অংশের কাজের ব্যবহার কর যাবে না।
* ১৬ বছরের নিচের শিশু	:	সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না।
	:	মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে না।
* ১৮ বছরের নিচের শিশু	:	মেয়ের বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
* ১৮ বছর বয়সে	:	প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে।
	:	ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।
* ২১ বছরের নিচে	:	ছেলের বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
* ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে	:	বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ, মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।[৮]

জাতিসংঘ প্রদত্ত এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতির আলোকে শিশুর সাথে ইসলাম প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞায় আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্যের ক্ষেত্রেটি হচ্ছে ছেলে-মেয়ের বিবাহের বয়স। এরই নিরিখে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স-পরিমাণ আছে কিনা? বিবাহের জন্য কত বয়স হওয়া উচিত? তাছাড়া সরকারী আইনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নতম বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অভিমত কি? আধুনিক সমাজ-মানসে এ এক জরুরী জিজ্ঞাসা। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে কিতাবে শিশুর বয়সসীমার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খতিয়ে দেয়া যেতে পারে। আয়েশা (রা.) এর উক্তি থেকে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বিবাহ করেন, যখন আমার বয়স মাত্র ‘ছয়’ বছর। আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি ‘নয়’ বছরের মেয়ে।”[৯]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেন, “নবী (স.) আয়েশা (র.)-কে বিবাহ করেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।”[১০]

---

৮. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯. মুসলিম, ইমাম, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ বৈরূত, ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা. বি, খ. ২, পৃ. ১০৩৯

১০. আইনী, বদরুদ্দীন, উমদাতুলকারী, সাহারানপুর, ইউপিঃ যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০৩ খ. ২০, পৃ.৭

১১. ইমাম নববী, আবু যাকারিয়য়্যাহ মহীউদ্দীন ইবনে শারফ, শারহু সহীহ লি-মুসলিম, তা. বি. , খ. ১, পৃ. ৪৫৬

মহানবী (সা.) নিজে যখন আয়েশা (রা.) কে ‘ছয়’ মতান্তরে ‘নয়’ বছর বয়সে বিবাহ করলেন, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলামের ছেলে- ময়ের বিয়ের জন্য কোনো নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোনো বয়সের ছেলে-মেয়েকে যে কোনো বয়সে বিবাহ দেয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ‘আল্লামা আইনী (র.) ইবনে বাত্তালের নিম্মোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করেন, “ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার মেয়ের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয-বৈধ, সে মেয়ে দোলনায় শোয়া শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না। যতক্ষণ তারা যৌন কার্যের জন্য পূর্ণ যোগ্য এবং পুরষ গ্রহণ ও ধারণা করার সামর্থ্য সম্পন্ন না হচ্ছে।” এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) লিখেন “পিতার পক্ষে তার কুমারী (নাবালেগা) মেয়েকে বিবাহ দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত হয়েছেন” ।[১১]

কাজেই মেয়েদের বা ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে কোনো বয়স নির্দিষ্ট করা যায় না। এ জন্য যে, সব মেয়ে শারীরিক অবস্থা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান হয় না। এমনকি বংশ-গোত্র, পারিবারিক জীবন-মান ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। একারণে কোনো এক নীতি বা কোনো ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না। কাজেই ছেলে-মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং ঐ নির্ধারিত বয়স সীমার পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ও এতদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা তো ছেলেমেয়েদের পূর্ণ বয়স্ক বালেগ-বালেগা অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় না। তবে বিবাহ বলতে যদি শুধু আক্‌দ ও ইজাব-কবুল বোঝায় তাহলে তা যে কোনো বয়সেই হতে পারে। এমনকি দোলনায় শোয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। ইসলামী শরীয়তে এ বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এবং এতে অশোভনীয় কিছু নেই।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী লিখেন: চারটি মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের ইজতিহাদী রায় হচ্ছে, ‘বালেগ’ (সাবালক) হয়নি এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ।”[১২]

আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী (সা) এর যুগে তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনালীর ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য।

রাসূলুল্লাহর (সা.) এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে শিশুদের মুকাল্লাফ শরীয়াতের বিধিবিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়স সীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদাপর্ণ করতেই সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।”[১৩]

১২. আস্‌ সিবায়ী, ড. মুস্তফা, আল্‌- মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুনি, তা. বি., পৃ. ৫৭

১৩. আবু দাউদ, ইমাম, সুলায়মান ইবনে আল-আশ, আস-সুনান অধ্যায়: আস-সালাত, অনুচ্ছেদ: মাতা

ইউমারুল গুলায়ু বিস- সালাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাস, ২০০০, পৃ. ১২৫৯ দারুল ফি তা. বি, খ. ১, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং ৪৯৫।

এ হাদীসের বক্তব্য থেকে শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুর নিম্নতম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ, শিশু শরীয়ত পালনের জন্য মুকাল্লাফ বা দায়িত্বশীল হবে দশ বছর বয়সে।

ফিক্‌দবিদগণের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে-যখন তার হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হওয়া শুরু হবে। আর এর নিম্নতম বয়স সীমা বলা হয়েছে, কমপক্ষে ‘নয়’ বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।[১৪]

এ ব্যাখ্যা থেকেও মেয়ে শিশুর মুকাল্লাফ হওয়া বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালত্বের নিম্নতম বয়স ‘নয়’ বছর। শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পণের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। উপরিউক্ত নিদর্শন দেখা গেলে ছেলে-মেয়ে শিশুত্ব থেকে শরীয়তের মুকাল্লাফ হয়ে থাকে অর্থাৎ সাবারকত্ব লাভ হয় এবং শরীয়তের বাধ্যবাধকতা আরোপ হয়। তখন আর সে শিশু শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকে ন।[১৫]

সাবালত্বের সীমা নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী ৭টি মতের উল্লেখ করেছেন-

১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থ্যবান হওয়া।

২. মনীষী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল-জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবলকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে যা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পন্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং পাগলের পার্থক্য বোঝায় সক্ষমতা শরীয়তে শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

৪. আল্লামা ছুমামা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, সে আল্লাহ, রসূল, কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়-তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন (যুক্তিবিদ) এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদ এর মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোনো কোনো ফিকহবিদ শিশুর সাবলকত্বের বয়স সীমা ১৭ বছর মনে করেন।

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, আলমগীরী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৩৬
১৫. মুমেন, নূরুল, মুসলিম আইন, একাদশ অধ্যায়, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪২-১৪৩

কিছু সংখ্যাক পন্ডিতের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ, সাবালকত্ব লাভ করবে না।[১৬] ইসলামী শরীয়তবেত্তাদের মধ্যে যেমন ইবনে শোবরুমা ও আল বাত্তী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি করে বলেন, ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের কোনো রকম বিবাহ প্রদান আদৌ বৈধ নয়। আর তাদের অভিভাকগণ তাদের পক্ষ থেকে উকীল হয়ে যে সব বিবাহ সম্পন্ন করে থাকেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল; তাকে বিবাহ বলে ধরাই যায় না।[১৭]

প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের বিবাহের আদেশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান, উপদেশ এ কথারই সমর্থক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দেয়ার বাস্তবে কোনো কল্যাণ নেই। বরং আছে অনেক জটিলতা, তিক্ত সমস্যা ও বিপর্যয়। শিশু বয়সের বিবাহের কারণে ছেলে-মেয়েদের জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে, সেজন্য বর্তমান সমাজ-মানসে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এর প্রতি প্রতিরোধ জেগে উঠেছে। এ কাজকে আজ অনেকে ভাল এর সমর্থনযোগ্য মনে করতে পারছে না।

তাই বলে বিবাহের একটা নির্দিষ্ট বয়স ধার্য করা এবং তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠানকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করে দেয়; এমনকি যদি কেউ তা করে সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে জেল-জরিমানার দন্ডে দন্ডিত কর ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মানবীয় নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এ কাজ সমীচীন নয়।

তবে ধর্মীয় নৈতিক মানের অবক্ষয়ের সাথে এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজেও বাল্যবিবাহ এমনকি অসম বিবাহ অর্থাৎ, অল্প বয়সের মেয়েকে বুড়ো বয়সের পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়ার এবং বিবাহ করার প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, সমাজের সুস্থতা এবং শিশুমাতা ও তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে আইনের সাহায্যে এ কাজকে নিরুৎসাহিত করার দাবি রাখে।

উক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিসংঘ প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞা বলতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু আইনের দৃষ্টিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা একেবারে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়তের মুকাল্লাফ-দায়িত্বশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে-মেয়েকে শিশু বলা যাবে। মোটকথা যার ওপর শরীয়তের বাধ্যবাধকতা নেই সেই শিশু।

রাষ্ট্রীয় বিধানে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এবং শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য যে আইন করা হয়েছে তা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই; যদি তা ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ও কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিশু আইনের সংজ্ঞা বাধ না সাধলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণকারী একক কোনো আইনের অস্তিত্ব না থাকায় কেউ শিশু কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনের নিরিখেই নির্ধারণ করতে হবে।

১৬. ইবনে ইসমাঈল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন, ২৩৫ আর্টিকেল, মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল-মিসরিয়্যাহ, আল-কাহেরাঃ ১৯৬৯, খ. ২, পৃ. ১৭৫

১৭. আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯

ইসলামী নীতি দর্শনে শিশুর অবস্থান ও মর্যাদা:

আজকের শিশু মানবতার ভবিষ্যৎ, জাতির আগামী দিনের স্থপতি। সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক ও মানসিক, নৈতিক, আধ্যত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে শিশু-সন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সে জুড়ি থেকে তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[১৮]

একজন নারী এবং পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনের আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পুরিপূর্ণতা লাভ করে মানব শিশুর মাধ্যমেই। তাই শিশু-সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের পুতঃপবিত্র পুষ্প বিশেষ। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তান আল্লাহ তাআলার সেরা উপহার। সন্তান ঘরের শোভা, খায়ের ও বরকত এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের বাহন। শিশু-সন্তান পার্থিব জীবনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শিশুর মর্যাদা ও মূল্য মানবজীবনে সীমাহীন। পবিত্র কুরআনে ব্যাপারটি এভাবে বলা হয়েছে, "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির বাহন।[১৯]

আল্লামা আলূসী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ সুরক্ষার মাধ্যম।"[২০]

শিশুদের যথার্থ মর্যাদা দানের মাধ্যই নিহিত রয়েছে শিশু অধিকারের নিশ্চয়তা। এ জন্য শিশুর প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য অনুধাবন ও নিরূপণ। শিশুর অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়; সন্তানকে নিজের ও মানবতার জন্য আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। শিশুর অস্তিত্বের সঠিক মূল্য দিতে না পারলে অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করা যাবে না অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগই পাওয়া যাবে না। কিংবা সুযোগ এলেও তার অধিকার আদায়ে সফল হওয়া যাবে না। কাজেই শিশুর সঙ্গে সঠিক আচরণের জন্য তার যথার্থ মর্যাদা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। পৃথিবীতে অগণিত মানুষ রয়েছে যাদের সম্পদের অভাব নেই, কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন সন্তান নেই। হাজার চেষ্টা-সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার অনেক মানুষ এমন আছে, যারা কামনা না করেও বহু সন্তানের পিতা-মাতা, কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই। কাজেই কারো সন্তান হওয়া, না হওয়া,

---

১৮. আল-কুরআন, ১৬: ৭২
১৯. আল-কুরআন ১৮: ৪৬
২০. আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আব্দিল্লাহ্ আল-আজীম ওয়াল-হুসাইনী: রূহুল মাআনী, বৈরূত: দারুত সাদির, তা. বি. খ. ১১, পৃ. ১২৭

একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা: "নভোজগত ও ভূ-জগতের আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহরই! তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা শিশু উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশিক্তমান।"[২১]

মানুষ যত বিত্ত-বৈভব ও বৈষয়িক শক্তি-ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দান তো দূরের কথা তার ইচ্ছায় নিজ সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাও তার নেই। এরপরও যদি কেই আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তি বা সত্তার কছে সন্তান কামনা করে কিংবা তাকে সন্তান দাতা বলে বিশ্বাস করে, তার মত হতভাগ্য ও অপরিণামদর্শী আর কেউই নেই।

সন্তানই দীনি কাজের সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকারী। দীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের সন্তানই উত্তরসূরী। এজন্যই নবী-রাসূলগণ আল্লাহর দারবারে কামনা করতেন, "হে অল্লাহ, রব! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে। আর হে প্রভু! তাকে একজন পছন্দনীয় মর্যাদাবান মানুষ বানাও।"[২২] কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "হে আমাদের প্রভূ, আমাদের জন্য এমন জুড়ি ও সন্তান-সন্তুতি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন-শীতলকারী এবং আমাদেরকে করো মুমিন-মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য নেতা।"[২৩]

আরও একটি প্রার্থনা, "হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।[২৪]

সুসন্তান দুনিয়াতে যেমন মান-মর্যাদার মাধ্যম তেমনি পরকালীন জীবনেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে। কারো জীবদ্দশায় যদি শিশু-সন্তানের মৃত্যু হয় এবং সে ইহলোকে যদি সবর ও ধৈর্য্যের সাথে শোক সহ্য করে, তাহলে ঐ শিশু সন্তান আখেরাতের প্রত্যাশিত জান্নাতের ওসিলা এবং বিপুল সম্মানের অধিকারী হবে। তার জন্য জান্নাতে এক বিশেষ মহল তৈরি হবে এবং ঐ মহলের নাম হবে 'শোকরের মহল' বায়তুল হামদ। আবু মূসা আল-আশআরী রা. বলেন, নবী (স.) বলেছেন, "যখন কোন বান্দার শিশু-সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার শিশু সন্তানের রূহ কবয করে নিয়েছো? ফিরিশতারা জবাব দেন, জী হাঁ, কবয করে নিয়েছি। আল্লাহ বলেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? ফিরিশতারা জবাব দেন, প্রভূ! তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"[২৫] ফিরিশতারা যখন বলবেন তারা তোমার উদ্দেশ্যে সন্তান-বিয়োগ-বিপদে এ কথা বলেছে। একথা শুনে আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে তাঁর বান্দার জন্য জন্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম 'শোকরের মহল' রাখার নির্দেশ দেন।'

---

২১. আল-কুরআন, ৪২ ঃ ৪৯-৫০

২২. আল-কুরআন, ১৯ ঃ ৫-৬

২৩. আল-কুরআন, ২৫:৭৪।

২৪. আল-কুরআন, ৩:৩৮।

২৫. আল-কুরআন, ২:১৫৬।

হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, শিশু-সন্তান পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সু-সন্তানের আমল এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে, যার সওয়াব দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাদের আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। হাদীস থেকে জানা যায় মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথে মানুষের এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লেখা হতে থাকে অনন্তকাল।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য অপরিসীম।

শিশু অপরাধ:

বর্তমানে অপরাধ প্রবণতার সাথে যুক্ত হয়েছে শিশু-কিশোরদের একটি বিরাট অংশ। বাংলাদেশ এ অবস্থা থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের শিশুরা নানা কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বড়রাও নিজেদের স্বার্থে এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।[১] সাম্প্রতিক অপরাধমূলক কার্মকাণ্ডে শিশু-কিশোরদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিশু হওয়ার কারণে এদের বিচার কাজটা বেশ সংবেদনশীল। পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে অপরাধের সংস্পর্শে আসা এসব শিশুকে কখনোই একককভাবে দায়ী করা যায় না।

কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এদেরকে পৃথক সত্তা হিসেবে আলাদা বিচার, শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ব্যবস্থা এবং সমাজে পুনর্বাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। ফলে কারাগারগুলোতে শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব শিশুর প্রবেশনে মুক্তির বিষয়ে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ এর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে 'প্রবেশন কার্যক্রম' পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শিশুর অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এভাবে অপরাধ জগত থেকে বের করে শিশুকে সুনাগরিকে পরিণত করা মানে একজন অপরাধীর সংখ্যা কমানো। উন্নত বিশ্বে প্রবেশন পদ্ধতি অপরাধ সংশোধনের একটি কার্যকারী মাধ্যম হলেও আমাদের দেশে 'প্রবেশন' বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেই পরিচিত নন। প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আইনটি ১৯৬৪ সালে সংশোধিত হলেও প্রত্যাশানুযায়ী আমাদের দেশের প্রবেশন কার্যক্রম কোনো রকম নজির সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি বিভিন্ন সময়ে প্রবেশনে মুক্তি দিয়ে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যানও জানা যায় না। আমাদের দেশে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আইনটির প্রচলন থাকলেও প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনার কোন নীতিমালা তৈরি হয়নি।

---

২৬. ভূঁইয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশে কিশোরদের বিচারব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম, ঢাকা: সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, পৃ.২

প্রবেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব:

প্রবেশন এক প্রকার আইনসম্মত সংশোধন ব্যবস্থা যা অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করাকে বোঝায়।[২৭] এ ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমাজের পরিমণ্ডলে রেখে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত সেসব শিশুর জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়, যাদের জন্য তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন এবং যাদেরকে শাস্তি না দিয়ে মানসিক উন্নয়ন, সংশোধন ও সমাজে পুর্নবাসনের সুযোগ দেয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধ সাহায্য না করে বরং অপরাধ বিস্তারে সহায়তা করে। অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রবেশন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৮]

এছাড়া ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক দলীল ও নীতিমালায় দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক বা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল লক্ষ্য শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।[২৯] বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪ এর মূলনীতিও যেকোন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর জন্য শাস্তি নয় বরং সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা।

প্রবেশন আইন প্রণয়ন:

১৯৬০ সালে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০[৩০] নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে জেলখানায় রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দন্ডাদেশ দেয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিম্ন ১ সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের

---

২৭. V.V, Devasia & Leelamma Devasia, Criminology Victimology and Corrections, New Delhi : Ashish Publishing House, 1992, P. 45

২৮. Sarker, Abul Hakim, æSeparate Treatment of Juvenile Offender in India and Bangladesh: Some Background Information", The Journal of Social Development, Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka, Vol. 4, Number 1, June, 1989, P.32

২৯. The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (JDLs); The UN Guidelines for the Preventiion of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the UN Guidelines for Action on Children in the Crimial Justice System (Vienna Guidelines)|

৩০. প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (অধ্যাদেশ নং XLV)

তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশ রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেয় হয়।[৩১] প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশু উভয় অপরাধীদের প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে আছে। এ প্রবেশন অর্ডিন্যান্সের পর ১৯৭৪ সালে দেশে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণীত হয় যেখানে এ প্রবেশন ব্যবস্থা কার্যকরী করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৩২]

বাংলাদেশে প্রবেশন কার্যক্রম প্রচলনঃ

১৯৬০ সালের প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে কারাগারে রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদেরও প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে রয়েছে। তবে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থার বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

কিন্তু পাকিস্তান আমলে প্রণীত প্রবেশন আইনটি যেমন পুরোনো তেমনি যথাযথ বাস্তবায়ন নেই।[৩৩] আইনটি কার্যকর করার জন্য ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রবর্তন করা হলেও এ পর্যন্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করার কোন ধরনের নীতিমালা নেই।

প্রবেশন অফিসারের আইনগত দায়িত্বঃ

বাংলাদেশে শিশুর বিচারব্যবস্থায় মূল আইনসমূহ যথা-শিশু আইনের ১৯৭৪ এর ৩১ ধারায়, শিশুবিধি ১৯৭৬ এর ২১ ধারায় এবং প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত) এর ১৩ ধারায় 'প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

শিশু আইনের অধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব শিশু অপরাধীর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও সমাজে তাকে পুর্নবাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর গ্রেফতারকৃত শিশুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রবশেন কর্মকর্তাদের।

প্রবেশন অফিসারের আইনগত দায়িত্বঃ

বাংলাদেশে শিশুর বিচারব্যবস্থায় মূল আইনসমূহ যথা–শিশু আইনের ১৯৭৪ এর ৩১ ধারায়, শিশুবিধি ১৯৭৬ এর ২১ ধারায় এবং প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত) এর ১৩ ধারায় 'প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

---

৩১. Khan, Borhan Uddin and Muhammad Mahbubur Rahman, Protection of Childern in Conflict with the Law in Bangladesh, (Dhaka : Save the Children, UK, 2008), P. 15

৩২. ভূইয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশে কিশোরদের বিচারব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৩. আলম, মোহাম্মদ সাইফুল, "প্রবেশন নির্দেশিকা", ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৮, পৃ. ৪, শিশু আইনঃ ১৯৭৪।

শিশু আইনের অধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব শিশু অপরাধীর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও সমাজে তাকে পুর্নবাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর গ্রেফতারকৃত শিশুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রবশেন কর্মকর্তাদের।

শিশু আইনের ৩১ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। প্রবেশন অফিসার স্থানীয় কিশোর আদালত বা যেখানে এরূপ আদালত নেই সেখানে দায়রা আদালতের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় এ আইনের অধীনে তদীয় কর্তব্য সম্পাদন করবে।

শিশু আইনের ৫২ ধারা অনুযায়ী পুলিশ কোনো শিশুকে গ্রেফতারের পরপরই তা প্রবেশন কর্মকর্তাকে জানাবে। প্রবেশন কর্মকর্তা তখন পূর্ববর্তী সব ঘটনা ও পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করবে, যা আদালতকে তার নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

শিশু বিধি-১৯৭৬ :

শিশু বিধি ১৯৭৬ এর ২১ ধারায় প্রবেশন অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে-প্রবেশন অফিসার শিশুর সাথে নিয়মিত সাক্ষাত্ করবেন এবং তার বাড়ি, স্কুলের অবস্থা, আচরণ, জীবন পদ্ধতি, চরিত্র, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং শিশুকে তার প্রবেশনের অবস্থা ব্যাখ্যা করবেন। নিয়মিত আদালতে হাজির এবং প্রতিবেদন দাখিল করবেন। শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। পরিচালক ও আদালত কর্তৃক বিভিন্ন সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত)

প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ এর ১২ ধারায় প্রবেশন অফিসারের নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত হবেন বলে আইনে এবং প্রবেশন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন। এ আইনের ১৩ ধারায় প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। প্রবেশন অফিসার অপরাধীর আচরণ সম্পর্কে পরিচালককে রিপোর্ট দিবেন।

প্রবেশন আইনের বাস্তব পরিস্থিতি

আইনের একটি দিক শাসন আর অপরটি প্রতিপালন। স্বাভাবিকভাবে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের চেয়ে প্রতিচালনের দিকটা বেশি জোর দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শিশু আইন ও প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ দ্বারা শিশু-কিশোরদের বিচার না করে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত শিশু-কিশোরকে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার আওতায় বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে।[৩৪]

---

৩৪. Hoque, M Enamul et al., Under- Aged Prison Inmates in Bangladesh: A Sample Situation of Youthful Offenders in Greater Dhaka, Dhaka: Action Aid Bangladesh and Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association, 2008 P. 18

১৯৬০ সালের প্রবেশন আইন অনুসারে দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ, জেলার দায়রা আদালত, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম ও লঘু অপরাধে জড়িত শিশু, কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ১ বছর ও সর্বোচ্চ ৩ বছরের জন্য প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন। তবে প্রবেশন দেয়ার এই ক্ষমতা শুধু বিচারকারী আদালত নির্ধারণ করে থাকেন।[৩৫] কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ আদালতে প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট মামলায় বিবেচনা করা হয় না।

প্রবেশন প্রক্রিয়ার প্রাথিমক রূপ হচ্ছে আদালত কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের অধীনে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজে স্থান দেয়া ও তত্ত্বাবধান করা। যে শিশু প্রবেশনের অধীনে থাকে তাদেরকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। শিশু এসব শর্ত ও নিয়ম মানতে ব্যর্থ হলে তাদের উপর থেকে প্রবেশন নির্দেশ প্রত্যহার করা হয়।

এভাবে আদালত শিশু আইনের অধীনে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর অনূধর্ব্ব তিন বছরের জন্য ভালো হবার শর্তে প্রবেশনের অধীনে ছেড়ে দিতে পারে। আদালত যদি প্রবেশন অফিসারের কাছ থেকে এমন প্রতিবেদন পায় যে, উক্ত শিশু প্রবেশনাধীন সময়ে ভাল আচরণ করেনি, তাহলে বাকি সময়ের জন্য তাকে কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে আটকাদেশ দিতে পারে।

ব্যতিক্রম হলো, প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আদালতকে শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের প্রবেশনের ক্ষমতা দিলেও মৃত্যুদন্ডযোগ্য, যাবজ্জীবন কারাদন্ডযোগ্য ও ফৌজদারি দন্ডবিধির অধীনে অন্যান্য আরো কিছু অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তবে প্রবেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুর কারাদন্ডের একটি বিকল্প হিসেবে প্রবেশনের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও বিচার ব্যবস্থায় এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না। শিশু আইন সরকারকে প্রতিটি জেলায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে এবং সেখানে এ ধরনের একজন ব্যক্তি নিয়োজিত আছে সেখানে ঐ জেলায় আদালত কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট কেসের প্রয়োজনের সময় অন্য আরেকজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রবেশন-কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কিশোর আদালতের অধীনে থাকবে অথবা যদি কিশোর আদালত না থাকে তাহলে ফৌজদারি আদালতের অধীনে থাকবে।

আইন অনুযায়ী, পুলিশ অফিসারের সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রবেশন অফিসারের। প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব শিশুর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার শাস্তি ও সমাজে পুনর্বাসন ও একত্রীকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। সে কারণে শিশুর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবেশন অফিসারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।[৩৬]

---

৩৫. প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০, ধারা, ৩

৩৬. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৩১-০৮-২০০৯

এ দায়িত্বটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সম্পাদন করতে হয়। তাই এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হলেও শিশুর বিচার ব্যবস্থার কোনো কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

যদি ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বন্দি শিশুদের মুক্তি দেয়ার জন্য সুয়োমটো রুল জারি করে।[৩৭]

এতে শিশুর কারাগারে আটক বা অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তাদেরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে দেশের বিভিন্ন কারাগারে কারাবন্দি শিশুর সংখ্যা অনেকটা কমে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

অতএব, দেশে প্রচলিত কিশোর আদালত ও ফৌজদারি আদালত, কোনো ব্যবস্থাতেই শিশু সুরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। শিশুর বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর প্রতি সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব নিয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশে বিচার করা প্রয়োজন।

প্রবেশন আইন ব্যবহার না হওয়ার কারণ

১. আইন সম্পর্কে অসচেতনতা: বাংলাদেশে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের কোনো একক শিশু বিচারব্যবস্থা নেই। বাস্তবে শিশু অধিকার ও শিশু বিষয়ক আইন প্রয়োগ করতেও উৎসাহ বোধ করে না। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় বিচারব্যবস্থা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবেশন আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন না থাকার কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কাজ হয় না।

২. শিশু-কিশোর অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী ব্যবস্থা অনুসরণ শিশু আইনে শিশু অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজাদারী বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ হয়। শিশু আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত আছে, আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

ক. শিশুর চরিত্র ও বয়স;
খ. শিশুর জীবন ধারনের পরিবেশ;
গ. প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট এবং
ঘ. শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচ্য বলে আদালত মনে করে সে সকল বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে আদালত তা বিবেচনায় না এনে ফৌজাদারী বিচার ব্যবস্থা অনুরূপ শুধু পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।[৩৮] বস্তুত কোন শিশু বা কিশোর সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রবেশন অফিসারে রিপোর্টের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

৩৭. Suo Moto Order No. 248, 2003; 11 BLT 2003 HCD-281
৩৮. Sumaiya Khair, æJuvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review”. Journal of the Faculty of Law. The Dhaka University Studies Part-F, Vol. 16 no. 2005, P. 12

৩. অপর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার:

আমাদের দেশে জেলা ও উপজেলাগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার নেই। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া আছে। বর্তমানে ৬৪ টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছেন। বাকী ৪২টি জেলার উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রবেশন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব এবং স্বল্প সংখ্যক প্রবেশন অফিসার থাকায় প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

করণীয়:

শিশু আইনের সাথে প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে শিশুদের অপরাধ মুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়া সহজ হয়।

- শিশু আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ যেমন ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ ইত্যাদি বাতিল করতে হবে এবং শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থা শিশু আইন ও প্রবেশন আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- শিশু-কিশোরদেরকে আইনে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি থানায় ও আদালতে একজন করে স্থায়ী প্রবেশন অফিসার নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।
- দেশে প্রতিটি বিভাগে কিশোর আদালত স্থাপন করতে হবে এবং আদালতের প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি লাভের পর শিশু-কিশোরদের সমাজে পুর্নবাসন ও পুন:একত্রীকরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন।

দুর্নাম, গীবত ও চোগলখুরি: ইসলামী প্রতিবিধান

দুর্নাম করা, দোষী করা:

যে লোক অন্যদের দুর্নাম করে, দোষী করে, সে যেন তাদেরকে তীর বা তরবারির আঘাতে আহত বা জখমি করে। কিন্তু মুখের আঘাত আরও মারাত্মক। আরবী কবিতায় বলা হয়েছে: “জারাহাতুল লিসানি লাহা ইলতিয়ামু-ওয়া লা ইয়ালতামু মা জারাহাল লিসানু।” অর্থাৎ লেজা বল্লমের ক্ষত তো শুকিয়ে ভাল হয়ে যায়, কিন্তু মুখের কথার আঘাত কখনোই সারে না।

আয়াতে যেভাবে শব্দটি বলা হয়েছে তা আল্লাহ্র ওহীর বিশেষত্ব বৈকি। বলা হয়েছে, ‘অলা তালমিঝূ আনফুছাকুম’ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে আহত বা ক্ষত-বিক্ষত করো না। এ আয়াতে বুঝা যায় কুরআন মুসলিম সমাজকে এক অখন্ড ব্যক্তি মনে করে। কেননা তারা সকলেই পরস্পরের পরিপূরক। এক্ষণে একজন যদি তার ভাইকে আহত করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই আহত বা ক্ষতবিক্ষত করল।

খারাপ উপাধিতে ডাকা:

কাউকে এমন নামে বা উপাধিতে ডাকা যা তার কাছে অপসন্দের-ইসলামে এমন কাজও নিষিদ্ধ। কেননা, তাতে তাকে অপমান ও বিদ্রুপ করা হয় এবং তার অন্তরে এতে আঘাত লাগে। কোন মানুষেরই উচিৎ নয় তার কোন ভাইকে এভাবে কষ্ট দেয়া। এতে করে মানুষের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভ্রাতৃত্বের সীমা লংঘন করা হয়। সাধারণ সৌজন্য ও রুচির পরিপন্থী কাজ হয়।

খারাপ ধারণাঃ

ইসলাম চায় মুসলিম সমাজে ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের প্রতি পরিচ্ছন্ন, নির্মল-নির্দোষ মনমানসিকতা নিয়ে বসবাস করুক। পরস্পরের প্রতি পরম আস্থা ও নির্ভরতা স্থিতিশীল হোক। পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ, অনাস্থা ও অবিশ্বাস পোষণ না করুক।

কেউ কারো প্রতি যেন খারাপ ধারণা না রাখে, মিথ্যা দোষারোপ না করে সেজন্য আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা লোকদের ব্যাপারে বহু ধরনের ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। কেননা, কোন কোন ধারণা গুনাহ বা পাপকাজ।"[১]

এ আয়াতে ধারণা বলতে খারাপ ধারণা পোষণের কথাই বলা হয়েছে। অতএব, কোন মুসলমানেরই তার মুসলিম ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয়, যতক্ষণ না তার কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষ সম্পর্কে মৌলিকভাবেই ধরে নিতে হবে যে, তারা নির্দোষ। খারাপ ধারণার অসওয়াসা নির্দোষ মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করবে, তা কিছুতেই উচিৎ নয়। নবী (স.) তাই বলেছেন, "লোকদের সম্পর্কে কু-ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা, কু-ধারণা অত্যন্ত মিথ্যা কথা।"[২]

একথা ঠিক যে, মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে কুধারণা থেকে অনেক সময় নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয় না। কোন কোন লোক সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। বিশেষ করে যাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেঠে তাদের বিষয়ে। কিন্তু মুসলমানের এটা কর্তব্য যে সে কুধারণার কাছে নতি স্বীকার করবে না, কারো ব্যাপারে কুধারণা মনে আগে থেকেই স্থির না রেখে কোন বিষয় কানে আসলেও যাচাই-বাছাই করে দেখবে।

দোষ খুঁজে বেড়ানোঃ

অন্য লোকদের প্রতি অনাস্থা মানুষকে একটা গোপন মানসিক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। আর তা হচ্ছে কু-ধারণা পোষণ। তখন সে একটা বাহ্যিক দৈহিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সেটি হচ্ছে দোষ খুঁজে বেড়ানো। অথচ ইসলাম মানব সমাজকে এক সাথে অন্তর-বাহির উভয় দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল পরিবেশের মধ্যে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯: ১২

২. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং-৪৭৪৭।

এ কারণে কু-ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে পরের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ কুধারণাই দোষ খুঁজে বেড়ানোর মূল কারণ হয়ে থাকে।

বস্তুত, প্রত্যেকটি মানুষের একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তার দোষ খুঁজে বেরিয়ে তার সম্মান মর্যাদার হানি করা তার অভ্যন্তরে গুপ্ত বিষয়াদি লোকদের সামনে তুলে ধরা জায়েয হতে পারে না। কেউ গোপনে যে পাপে বা দোষেই লিপ্ত থাকুক না কেন তা যতক্ষণ গোপন থাকছে ততক্ষণ তা প্রকাশ করে দেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত ও অপ্রত্যাশিত কাজ।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) এর দরবারী লেখক আবুল হায়সাম বলেন, আমি উকবা ইবনে আমেরকে বললাম, আমার কিছুসংখ্যক প্রতিবেশি রয়েছে, তারা মদ পান করে, আমি পুলিশ ডেকে ওদেরকে ধরিয়ে দিতে চাই। তখন তিনি বললেন, না, তা করো না। তাদের বোঝাও, উপদেশ দাও, নসীহত কর। বলল, আমি তো ওদের অনেক নিষেধ করেছি, কিন্তু ওরা শুনছে না। এ অবস্থায় পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? তিনি বললেন, না, তোমার জন্য আফসোস তুমি তা করতে যেয়ো না। আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, "যে লোক কারো গোপন কথা গোপন রাখল, প্রকাশ করে দিল না, সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিতকে তার তার কবরে জীবিত করে দিল।"[৩]

লোকদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানোকে নবী করীম (স.) মুনাফিকদের খাসলতের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর মুনাফিক তারা যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, প্রকৃতপক্ষে তাদের দিল ঈমান আনেনি। নবী (স.) লোকদের সামনেই এ লোকদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। হযরত ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স.) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "হে সেসব লোক, যারা মুখে ঈমান ও ইসলাম কবুল করেছো, কিন্তু তাদের দিল পর্যন্ত ঈমান পৌঁছেনি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না আর তাদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না। কেননা, যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজে বেড়াবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ খুঁজবেন, তাকে তিনি লজ্জিত ও অপমানিত করবেন যদিও সে তার ঘরের কোণে বসে থাকে।"[৪]

লোকদের মান-মর্যাদার পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স.) কারো ঘরের লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ জন্যে ঘরের লোকদের তরফ থেকে যদি কোন প্রতিঘাত আসে, তাহলে কোন অপরাধ হবে না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে লোক অপরের ঘরের ভিতর উকি দিল তাদের অনুমতি ছাড়াই, ঘরের লোকদের জন্যে তার চক্ষু ফুটো করে দেয়া সম্পূর্ণ হালাল হয়ে গেছে।"[৫]

ঘরের মধ্যে বসে লোকদের বলা কথাবার্তা তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য লোকদের শোনানো হারাম করা হয়েছে। নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে লোক অন্য লোকদের কথাবার্তা চুরি করে শুনবে, সেই লোকেরা কিন্তু চায় না যে, তাদের কথা কেউ লুকিয়ে থেকে শুনুক-কিয়ামতের দিন তার দুই কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।"[৬]

---

৩. সুনানু আবী দাঊদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৪২৪৭।

৪. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ১৯৫৫।

৫. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং ৬৩৮০।

৬. সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুত তা'বীর, হাদীস নং ৬৫২০।

কেউ যদি কারো সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে গমন করে, তখন তার অনুমতি ছাড়া ও সালাম করা ছাড়াই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া সম্পূর্ণ হারাম। প্রথমে তাকে সালাম করতে হবে ও প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। এটা ওয়াজিব। ইরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না অনুমতি চাইবে ও ঘরের লোকদেরকে সালাম জানাবে। তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর। সম্ভবত তোমরা মনে রাখবে। সে ঘরে যদি কাউকে না-ই পাও, তাহলে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।"[৭]

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, "যে লোকই কোন গোপন জিনিস ফাঁস করে দিবে এবং অনুমতি দেয়ার আগেই তার উপরে দৃষ্টি ফেলবে, তাহলে সে এমন সীমার মধ্যে প্রবেশ করল, যে সীমার মধ্যে প্রবেশ করা তার জন্য হালাল নয়।"[৮]

পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো, লুকানো ত্রুটি প্রকাশ করা সাধারণভাবে সকলের জন্যই হারাম। শাসক-প্রশাসক এবং শাসিত জনগণ সকলের জন্যই এটা নিষেধ। কেউই এ থেকে মুক্ত নয়, কারো জন্যই তার অনুমতি নেই। হযরত মুআবিয়া (রা.) রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যদি তুমি লোকদের গোপন দোষ তালাশ করে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের বিপর্যস্ত করবে কিংবা বিপর্যয়ের কাছাকাছি করে ফেলবে।"[৯]

তিনি আরো বলেছেন, "শাসক বা প্রশাসক যখন লোকদের মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের কথাবার্তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করে, তখন সে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে দেয়।"[১০]

গীবত:

সূরা হুজুরাতে আরেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে গীবত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা পরস্পরের গীবত করো না।"[১১]

নবী করীম (স.) সওয়াল-জওয়াব পন্থায় তার সাহাবীদের গীবতের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কি জান গীবত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স.) ই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, "তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করা, যা সে নিজে পসন্দ করে না-তাই হচ্ছে গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে, তাহলেও কি বলা গীবত হবে? বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থেকেই থাকে, তবে গীবত হবে। আর যদি না থাকে, তাহলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।"[১২]

---

৭. আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪ : ২৭-২৮

৮. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ২৬৩১।

৯. সুনানু আবী দাঊদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং- ৪২৪৪।

১০. সুনানু আবী দাঊদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪২৪৫।

১১. আল-কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

১২. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং ৪৬৯০।

মানুষ পসন্দ করে না এমন কথা তার অনুপস্থিতিতে বলা-এ পর্যায়ে তার দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি, চরিত্র, কাজ-কর্ম, বংশ ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিষয়ই এর অন্তর্ভূক্ত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, "আমি রাসূল (স.) কে বললাম, আপনার বেগম সফিয়্যার খাটো হওয়াটাই যথেষ্ট।" তখন নবী (স.) বললেন, "তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সে পানির রঙ বদলে যাবে।"[১৩]

আসলে গীবত দ্বারা অন্যদের হেয় প্রতিপন্ন করার দ্বারা কুপ্রবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের মান-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার প্রবল ইচ্ছাই কাজ করে। তা গীবতকারীর হীন মন-মানসিকতা, নীচতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। কেননা, তা পিছন থেকে আঘাত করার শামিল। তা প্রমাণ করে যে, গীবতকারীর নিজের কোন কাজ নেই। সেই লোক গীবত করার কাজে পটুতা দেখায় যে কাজে অলস। গীবত প্রবণতা সমাজ বিধ্বংসী কার্যক্রম কেননা, যারা গীবত করতে অভ্যস্ত তাদের জিহক্ষার ধারালো আঘাত থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পায়।

এমতাবস্থায় কুরআন মাজীদে যদি তার বীভৎস ও জঘন্য রূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে এবং এমনভাবে তার চিত্র উপস্থাপিত হয়ে থাকে যা মানুষের মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে, তাতে বিস্ময়ের কোন কিছু নেই। সে চিত্রটি এই, "তোমাদের কেউ যেন অপর কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি পসন্দ করে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? ....তোমরা তা অপসন্দই কর।"[১৪]

আরেকজন মৃত মানুষের গোশত কোন মানুষই খেতে চাইবে না। এটা কোন রুচিকর বিষয় নয়, তেমনি এটা ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতি তীব্র অসম্মানবোধও। নবী করীম (স.) যখনই সুযোগ, ক্ষেত্র ও পরিবেশ পেতেন, গীবতের এই চিত্র তখনই তিনি দেখিয়ে দিতেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, "আমরা রাসূল করীম (স.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মজলিশের বাইরে চলে গেল। আরেক ব্যক্তি সে লোকটি সম্বন্ধে অবমাননাকর কথা বলে উঠল। তখন নবী করীম (স.) এই ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি খিলাল কর।"লোকটি বলল, "আমি কেন খিলাল করব, আমি তো কোন গোশত খাইনি?" নবী করীম (স.) বললেন, "তুমি এইমাত্র তোমার ভাইয়ের গোশত খেয়েছ।"[১৫]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা নবী করীম (স.) এর কাছে ছিলাম। তখন খুব দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হলো। নবী করীম (স.) বললেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের বাতাস?" এটা হচ্ছে মুমিনদের যারা গীবত করে তাদের বাতাস।"[১৬]

---

১৩. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ্, হাদীস নং ২৪২৬।

১৪. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

১৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী কর্তৃক উদ্ধৃত: ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং, পৃ. ৪০৫)।

১৬. মুসনাদু আহমাদ্, হাদীস নং ১৪২৫৭।

গীবতের অনুমতি সীমা:

উপরে উদ্ধৃত সব কুরআনের আয়াত ও হাদীসে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা অত্যন্ত পবিত্র ও সুরক্ষিত।

কিন্তু ইসলামে বিশেষজ্ঞদের মতে গীবতের কয়েকটি দিক হারাম থেকে ব্যতিক্রম। প্রয়োজনের তাকীদে যেখানে গীবত না করে কোন উপায় থাকে না, তা হচ্ছে এই ব্যতিক্রমের দিক এবং ব্যতিক্রমের সুযোগের কারণেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে মজলুম জালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে, সে জালিমের এমন সব কথা প্রকাশ করে যে তার খারাপ লাগলেও সে কথাগুলো সবই সত্য এবং তার সে অধিকারও আছে। এই জুলুমের ক্ষেত্রে ফরিয়াদ করার জন্য কারো বিরুদ্ধে বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা অবশ্যই বলতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা খারাপ ধরণের কথা প্রকাশ ও প্রচার করা আদৌ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম হয়েছে, তার জন্য তেমন কিছু করাটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।"[১৭]

এক ব্যক্তি অপর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে, লোকটির ভাল চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলে তার সাথে ব্যবসায় শরিক হবে অথবা কেউ তার কন্যা বিয়ে দিবে, প্রস্তাবক ছেলে সম্পর্কে সে জানতে চায়। এসব ক্ষেত্রে একদিকে থাকে লোকদেরকে সঠিক তথ্য ও প্রকৃত অবস্থা জানানোর দায়িত্ব আর অপরটিতে থাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ইজ্জত-আবরু রক্ষার কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা ও সংঘর্ষ বিদ্যমান। কিন্তু প্রথম দায়িত্ব যেহেতু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র, সেই কারণে সেটির অগ্রাধিকার অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ফাতিমা বিনতে কাইস নবী করীম স. কে তার বিয়ের জন্য আসা দু'টি প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করে কোনটি তার পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি তার একজন সম্পর্কে বললেন, সে দরিদ্র, ধন-মাল বলতে তার কিছুই নেই। আর অপরজন সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি স্ত্রীকে খুব মারধর করে। সে তার লাঠি কাঁধের উপর থেকে কখনোই নামায় না।"[১৮]

এ ব্যতিক্রমের মধ্যেই রয়েছে অন্যায় ও পাপকে বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলা। হাদীস অনুযায়ি এটাই কর্তব্য।

কোন লোকের পরিচিতিই যদি হয় এমন নামে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে না অথচ সেই নাম না বললে তাকে চেনাই যায় না-যেমন আরজ (ল্যাংড়া), আমাশ (দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন) বা অমুক মেয়েলোকের পুত্র ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে এই পরিচিতির উদ্দেশ্যেই তা বলতে হবে। সাক্ষী, হাদীস বর্ণনাকারী ও খবরদাতাদের জেরা করা, তাদের চারিত্রিক দোষ-গুণ আলোচনা করাও এ পর্যায়েরই কাজ।

এ পর্যায়ে গীবত জায়েজ হওয়ার দুটি ভিত্তি রয়েছে। প্রথমত, প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নিয়ত-মনোভাব।

---

১৭. আল-কুরআন, সূরা আন নিসা ৪ : ১৪৮।

১৮. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত তালাক্, হাদীস নং ২৭০৯।

অনুপস্থিত ব্যক্তির অসন্তুষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন তীব্র না হওয়া পর্যন্ত এ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে কারোরই পদচারণা করা উচিৎ নয়। যদি ইশারা-ইঙ্গিতে বললে প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে সুস্পষ্ট করে বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা না বলে সাধারণভাবে কথাটি বলা যেতে পারে। যেমন জিজ্ঞেস করার একটা ধরণ, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন যে অমুক কাজ করে? সেখানে 'অমুকের পুত্র অমুক' বলা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আছে এমন বিষয় বলতে গেলে শর্ত প্রযোজ্য। কিন্তু তার মধ্যে নেই তাই যদি বলা হয়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ এবং সম্পূর্ণ হারাম।

নিয়ত, আর এটাই হচ্ছে এ পর্যায়ের সব ব্যাপারের চূড়ান্ত ফায়সালাকারী। কি কারণে সে কথা বলছে, তা অন্যদের অপেক্ষা সে নিজেই ভাল জানে। এ নিয়তের ভিত্তিতেই গীবত, সমালোচনা, উপদেশ এবং দোষ প্রচার করা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। আর এ সত্য যে, মুমিন তার নিজের মনোভাব সম্পর্কে নিজেই খুব কড়াভাবে হিসেব-নিকেশ করতে পারে এবং করেও থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও নিশ্চিত কথা যে, গীবত যে শোনে সেও গীবত কার্যে শরীক মনে করতে হবে। আর প্রত্যেকেরই কর্তব্য তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করা, তার পক্ষে কথা বলা। হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত সংরক্ষণ করল তার দোষ স্খলন করল, তার হক হচ্ছে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন।"[১৯]

হাদীসে এও বলা হয়েছে যে, "যে লোক তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল এ দুনিয়ায়, আল্লাহ্ তার থেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে ফিরিয়ে নিবেন।"[২০]

যার এমন সাহসিকতা নেই, ভাইয়ের মর্যাদাহানির আঘাত থেকে যে তার ভাইকে রক্ষা করতে পারল না, তার অন্ততপক্ষে সে মজলিশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং সেই লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কর্তব্য–যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় মনোনিবেশ করছে। তাও না করলে সে তো আল্লাহ্র এ বাক্যটির আওতার মধ্যে পড়ে যাবে: "তোমরা এক্ষণে তাদের মতই হয়ে গেলে।"[২১]

চোগলখোরী:

ইসলামে গীবতের কথা যখনই বলা হয়, তখনই তার সাথে এমন আরো একটি স্বভাবের উল্লেখ করা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে গীবতের মতোই কঠিনভাবে হারাম। আর তা হচ্ছে চোগলখোরী। কারো মুখে একজনের বিরুদ্ধে কিছু শুনে তা সে ব্যক্তির কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেয়া, যার ফলে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লেগে যাবে অথবা পারস্পরিক মনের পরিচ্ছন্নতা দূর হয়ে গিয়ে পংকিলতা ও ময়লার সৃষ্টি হয়। অথবা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকা সেই পংকিলতা ও ময়লা দূর হয়ে গিয়ে আরো অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

---

১৯. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৬৩২৭।

২০. সুনানু তিরমিযী, কিতাবুল বির্র, হাদীস নং ১৮৫৪।

২১. আল-কুরআন, সূরা নিসা ৪: ১৪০।

এ হীন ও মারাত্মক ধরণের খাছলতের প্রতিবাদ করে মাক্কী সূরাসমূহেই আল্লাহর কথা নাযিল হয়। তাতে বলা হয়েছে, "এমন ব্যক্তির কথা তোমরা মেনে নিও না যে খুব বেশি কসম খায় ও গুরুত্বহীন, যে লোকদের দুঃখ দেয়, অভিশাপ বর্ষণ করে বেড়ায় এবং চোগলখোরি করে ফেরে।"[২২] নবী করীম স. বরেছেন, "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।"[২৩]

পারস্পরিক বিবাদ দূর করে মীমাংসা ও মিলমিশের জন্যে যারা চেষ্টা করে ইসলাম তাদের জন্য এটা জায়েজ বলেছে যে, একজনের সম্পর্কে খারাপতম কথা জানা সত্ত্বেও সে তা প্রকাশ করবে না। উপরন্তু নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভাল ভাল কথা বাড়িয়ে বলবে যদিও তা একজন সম্পর্কে অপর কারোর কাছে সে শুনতে পায়নি। যারা কোন খারাপ কথা কোথাও শুনতে পায়, আর অমনি তা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বা বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যদের কাছে গিয়ে বলে দেয়, তাদের উপর ইসলামের তীব্র ক্রোধ ও আক্রোশ। কেননা, এরা সমাজে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার কু-মতলবেই তা করে থাকে।

এভাবে ইসলাম সকল প্রকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিকে হারাম ঘোষণা করে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছে।

বেকারত্ব ও নৈতিকতা

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। বেকারত্ব ও দারিদ্র্য একই সূত্রে গাঁথা। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সকল দেশেই এ সমস্যা বিদ্যমান। বেকার, বে-রোজগার ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য কর্মসংস্থান করা, জীবিকা উপার্জনের উপায় সংগ্রহ করে দেয়া অর্থনীতির ইতিহাসে যেন এক চিরন্তন সমস্যা। বহু কর্মক্ষম শ্রমজীবী এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও বেকার সমস্যার সর্বগ্রাসী বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হতে চলেছে। অথচ এরা কাজ পেলে একদিকে নিজেদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার বাস্তব স্ফূরণ সাধনের সুযোগ পেত, অন্যদিকে জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট কার্য সমাধা করতে পারত, একদিকে তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারত, অন্যদিকে তারা প্রচুর অর্থোপার্জন করে অর্থনৈতিক আবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজক্ষেত্র হতে দারিদ্র্য ও আর্থিক বৈষম্য দূর করতে সমর্থ হত। তখন এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বোঝা না হয়ে সমাজ ও জাতির একনিষ্ঠ খাদেম হতে পারত। কাজেই বেকার সমস্যা সমাধান করা, কর্মক্ষম লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করা মানবকল্যাণকামী প্রত্যেক সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য এবং যে অর্থনীতিতে নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বেকার লোকদের জন্য এরূপ কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাই হতে পারে মানুষের জন্য কল্যাণকর অর্থনীতি। এই দিক দিয়ে ইসলামী অর্থনীতিই মানুষের অভাব মোচনকারী এবং বেকার সমস্যার সমাধানকারী একমাত্র অর্থব্যবস্থা। বিশেষ করে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হওয়ায় এ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র পথ। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের (ইসলামী অর্থব্যবস্থার) আলোকে বেকার সমস্যার সমাধান, বিশেষ করে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

২২. আল-কুরআন, সূরা ক্বলাম, ৬৮ : ১০-১১।

২৩. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস ৫৫৯৬।

বেকারত্ব কী?

অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে 'বেকারত্বের' সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অর্থনীতিতে 'বেকারত্ব' বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝায়, যখন বহু সংখ্যক কর্মক্ষম শ্রমিক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুযায়ি কাজ পায় না। সমাজে অনেক লোক আছে যারা বর্তমান প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে চায় না কিংবা শারীরিক অক্ষমতার দরুন কাজ করতে পারে না, এরূপ অবস্থাকে প্রকৃত বেকারত্ব বলা যায় না। বেকারত্বের প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন বর্তমান মজুরি হারে কাজ করতে চেয়েও লোকে কাজ পায় না। আবার সকল শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকলেই বেকারত্ব নেই, তা বলা যায় না। কিছু সংখ্যক লোক আংশিকভাবে কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে কিংবা কিছু সংখ্যক লোক যোগ্যতার চেয়ে নিম্নমানের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে। এ সকল শ্রমিককে অর্ধ বেকার বলা যেতে পারে।

বেকারত্বের সংজ্ঞায় অধ্যাপক এ. সি. পিগু বলেন, "যখন কোন দেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না তখন সেই অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।"[১]

Everyman's Dictionary of Economics এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "বেকারত্ব হলো একজন ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত অবসর যিনি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে চান, কিন্তু কাজ পান না।"[২]

অতএব, বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যখন কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না।

বেকার সমস্যা সমাধানে রাসূল (স.) এর শিক্ষা ও আদর্শ:

কেবলমাত্র ইসলামই বিশ্ববাসীর সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক মতাদর্শ উপস্থাপন করেছে। দিয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যার সকল সমাধান। বেকার সমস্যা তার থেকে বাহিরে নয়। মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পদ উপার্জনের জন্য প্রস্তুতকরণ এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইসলাম সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা দান করেছে। নিম্নে বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণ:

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। রাসূল (স.) বলেন, "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।"[৩]

---

১. প্রফেসর মুহাম্মাদ মনজুর আলী খান, আ.স.ম সালাহ্ উদ্দীন, মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ২০০১ ইং), পৃ. ৮০

২. Unemployment is involuntary idleness of a person willing to work at prevailing rate of pay but unable to find it. Everyman's Dictionary of Economics.

৩. আবূ দাঊদ, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস নং-১৪৬৯।

যে বৈরাগ্যবাদ পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করত, বেকারত্ব সৃষ্টি করত, সেই বৈরাগ্যবাদের বিধান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ছিল না, বরং তারা নিজেরাই করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং তারা বৈরাগ্য উদ্ভাবন করেছিল, যার নির্দেশ আমরা তাদেরকে দেইনি, অবশ্য তারা এই বৈরাগ্য-ধর্মের সৃষ্টি করেছিল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার মর্যাদাও তারা যথাযথভাবে রক্ষা করেনি।"[৪]

রাসূল (স.) শুধু উপরোক্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পন্থার বিরোধিতাই করেননি, বরং হালাল-হারাম বিবেচনা করে সম্পদ উপার্জন, জীবিকা নির্বাহকরণ, পারিবারিক, সামাজিক জীবনযাপন, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসম্পাদন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যা একটি মানুষকে কর্মময় জীবনের পথ-নির্দেশনা করে। তবে এই কর্মময় জীবনটা হবে কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী।

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ:

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদকে যেমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকেও একটি জঘন্যতম পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা করে-অথচ ইহা হতে মুক্ত থাকার মতো সম্পদ বা শক্তি সামর্থ্য তাদের রয়েছে তারা তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবে, তখন তাদের মুখমন্ডল একেবারে মাংসহীন ও বীভৎস হয়ে যাবে।"[৫]

রাসূল (স.) প্রায়ই বলতেন, "যিনি আমার প্রাণের মালিক তাঁর শপথ করে বলছি। তোমাদের একজনের রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া, কাঠ আহরণ করা, তা পিঠের উপর রেখে বহন করে আনা এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করা অপরের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। বিশেষত এই অবস্থায় যে, সেই অপর ব্যক্তি তাকে দিবে কিনা তার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।"[৬]

একজন বেকার আনসারী (রা.) রাসূল (স.) এর কাছে এসে সওয়াল করল। তিনি বললেন, "তোমার কাছে কোন জিনিস আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমি পরি আর কিছু অংশ শয্যারূপে ব্যবহার করি। আর একটি পেয়ালাও আছে যা দিয়ে আমি পানি পান করি। রাসূল (স.) বললেন, ঐগুলি নিয়ে আস। সে জিনিসগুলি নিয়ে এলে রাসূল (স.) সেগুলিকে নিজ হাতে উঠিয়ে নিলামে চড়ালেন। জনৈক সাহাবী এক দিরহাম দাম হাঁকলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, এর চেয়ে বেশি দাম দিবে এমন লোক আছে কি? অন্য একজন সাহাবী দু'দিরহাম হাঁকলেন। রাসূল (স.) তার হাতে জিনিসগুলি সোপর্দ করে দু'টি দিরহাম নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। অতঃপর বেকার আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও জঙ্গলে গিয়ে এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং আমি যেন পনেরো দিন পর্যন্ত আর না দেখি। আনসারী সাহাবী তাই করলেন। সে পনেরো দিন পর মহানবী (স.) এর খেদমতে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বলো, তোমার খবর কি। সে নিবেদন করল, এই কয়েকদিনে আমার দশ দিরহাম আমদানি হয়েছিল-তার মধ্য থেকে কয়েক দিরহাম দিয়ে কাপড় কিনেছি। আর কয়েক দিরহাম দিয়ে তরি-তরকারী। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, এটা অনেক শ্রেষ্ঠ তা থেকে যে তুমি সওয়াল করে বেড়াও এবং কেয়ামতের দিন অপমানিত হও।[৭]

---

৪. আল-কুরআন, সূরা হাদীদ ৫৭ : ২৭।

৫. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-৫৮৮।

৬. সুনানু ইবন্ মাজাহ্, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৮২৬।

৭. সুনানু আবী দাঊদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৯৮।

হযরত উমর (রা.) যখনই কোন উপার্জনক্ষম বেকার পুরুষ দেখতে পেতেন তখনই তিনি বলতেন, "মুসলমান সমাজের গলগ্রহ ও অন্য লোকের উপর নির্ভরশীল হইও না।"[৮]

মোটকথা রাসূল (সা.) একদিকে যেমন ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য পেশা হিসেবে অভিহিত করেছেন, তেমনি ভিক্ষুকের হাতকে শ্রমিকের হাতে পরিণত করেছেন, দিশা দিয়েছেন কর্মসংস্থানের।

শ্রমের প্রতি উৎসাহদানঃ

বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামের অন্যতম অবদান হলো–শ্রমিকের যথাযথ মর্যাদা ঘোষণা ও শ্রমের প্রতি উৎসাহ দান। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, "শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[৯]

একবার রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলো-ইয়া রাসূল, কোন্ ধরণের উপার্জন শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, "নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।"[১১]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো ফরমান, "যে ব্যক্তি শ্রম জনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।"[১২]

এভাবেই রাসূল (স.) শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন।

বেকারদের কর্মসংস্থানঃ

রাসূল (স.) শুধু শ্রমের প্রতি উৎসাহই প্রদান করেননি, বরং তিনি অনেক সময় অনেক বেকার লোকদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই যে ছিল তাঁর নবুয়্যাতের অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১৩] উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঐ আগন্তুক আনসারকে কুঠার বানিয়ে দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেন।[১৪] এছাড়া মুহাজিরগণ প্রথম প্রথম মদীনায় আসার পর আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ স. এর খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলি আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।" কিন্তু রাসূল (স.) এতে রাজি হলেন না। অতঃপর আনসারগণ নিবেদন করলেন, তাহলে তারা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশগ্রহণ করুক, আমরা তাদেরকে ফসলের অংশীদার করে নিব। মুহাজিররা আনসারদের ঐ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন।[১৫]

---

৮. উদ্ধৃতঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম কর্তৃক 'ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮ ইং), ৭ম প্রকাশ, পৃ. ৫৮
৯. মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
১০. সুনানু ইবনে মাজাহ্ , কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২১২৯।
১১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং-১৯৬০।
১২. ড. মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দীন কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
১৪. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৩৯৮।
১৫. ড. মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দীন কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

এভাবে রাসূল (স.) মুহাজিরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

উমর ফারুক (রা.) এর খেলাফতকালে বিরাট আকৃতির এক যুবক মসজিদে প্রবেশ করে বললো, এমন লোক কে আছে যে জিহাদ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? উমর ফারুক (রা.) ঐ লোকটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার হাত ধরে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "নিজের জমিতে কাজ করানোর জন্য এ ব্যক্তিকে কে মজুর রাখবে? জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন, আমি রাখব। উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একে মাসে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দিবে? আনসারী পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ করলে উমর (রা.) বললেন, তাহলে তুমি একে মজুর রেখে দাও। শেষ পর্যন্ত যুবকটি মজুর নিযুক্ত হয়ে আনসারীর সাথে চলে গেল।

কয়েক মাস পর উমর আনসারী সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে লোকটিকে তোমার চাকুরিতে নিয়োগ করেছিলাম তার খবর কী? উমর (রা.) বললেন, তাকে তাঁর উপার্জিত মজুরিসহ যেন আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, মজুরটি এমতাবস্থায় হাজির হলো যে, তাঁর সাথে দিরহামে পূর্ণ একটি থলে ছিল। উমর ফারুক (রা.) যুবকটিকে সম্বোধন করে বললেন, থলেটি হাতে নাও এবং যেখানে ইচ্ছা গিয়ে জিহাদ কর অথবা ঘরে বসে থাক।[১৬]

এভাবে রাসূল (স.) বেকার লোকদের কর্মসংস্থান করতেন। তার দেখাদেখি সাহাবা কেরামও বেকারদের কাজ-কর্ম জুটিয়ে দিতেন।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যাঃ

বেকারত্ব বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ, এ যুক্তি দেশের রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে একজন অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এ সমস্যাকে আরো জটিল করে দিয়েছে। প্রতি বছর যে হারে শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতি বছর কিশোর শ্রেণী যে হারে বিনিয়োগপ্রার্থীর কাতারে এগিয়ে আসে সে অনুযায়ি সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। আমাদের দরিদ্র অর্থনীতি এই বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবীর কর্মসংস্থান করতে অক্ষম। এ জন্য যে কারণগুলো দায়ী বলে ধরা হয়, তার মাঝে অর্থনীতিতে স্বল্প বিনিয়োগই প্রধান। দ্বিতীয় পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞান, শিক্ষা ও অন্যান্য নানা কারণ সরকারি পরিকল্পনা কমিশন ও শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ি ১৯৯৫-৯৬ সালে এ দেশে ৫৬ মিলিয়ন জনবলের শ্রমশক্তি বিরাজমান ছিল।[১৭] তার মধ্যে ২৯.৩২ মিলিয়ন জনবলের কর্মসংস্থান করা গেলেও ১৪.৬০ মিলিয়ন জনবলের কর্মসংস্থান করা যায়নি। অনুরূপভাবে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪৪.৫ মিলিয়ন জনবলের মধ্যে ৩০.৯৬ মিলিয়নের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা গেছে। বাকি ১৩.০৯ এর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়নি।[১৮]

মোট শ্রমশক্তির মাঝে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩৩% এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রায় ৩০% বেকার ছিল।[১৯] নিম্নে ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত এই শ্রম শক্তির প্রকৃত চিত্র দ্বারা দেখানো হলো:[২০]

---

১৬. আলী আল মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল (বৈরুত : দারুল মা'আরিফা, ১৪১৫ হিজরী) খ. ২, পৃ. ২১৭।

১৭. প্রফেসর মোহাম্মাদ মনজুর আলী খান, আ. স. ম. সালাহ্ উদ্দীন, মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা : হাসান বুক হাউজ, ২০০১ ইং), পৃ. ৮২।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

বর্ষ	শ্রমশক্তি	কর্মরত			বেকার	বেকারত্বের হার
১৯৭২-৭৩	২২.৫৫	১৩.০৯		১৩.০০	৯.৪৬	৪১.৯৫
১৯৭৭-৭৮	২৬.৪৮	১৬.০৪	০.০৫	১৬.০৯	১০.৩৯	৩৯.২৪
১৯৭৯-৮০	২৮.৪৩	১৬.০৯	০.০৫	১৬.১৪	১২.২৯	৪৩.২৩
১৯৮৪-৮৫	৩১.১০	১৮.৯৭	০.৩২	১৯.২৯	১১.৮১	৩৭.৯৪
১৯৮৯-৯০	৩৭.১৩	২২.৮২	০.৪৩	২৩.২৫	১৩.৮৮	৩৭.৪১
১৯৯৪-৯৫	৪৩.৮০	২৬.৮৮	০.৯৫	২৭.৮৩	১৫.৯৭	৩৬.৪৬
১৯৯৫-৯৬	৪৩.৯২	২৮.১৮	১.১৪	২৯.৩২	১৪.৬০	৩৩.০০
১৯৯৬-৯৭	৪৪.০৫	২৯.৬২	১.৩৪	৩০.৯৬	১৩.০৯	৩০.০০

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান:

বাংলাদেশ একটি মুসলিম জনবহুল দেশ। এ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে রাসূল স. এর নির্দেশিত পদক্ষেপগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। নিচে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হলো:

বর্তমান বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সম্ভাব্য কর্মসূচি, বেকারত্ব সমস্যা এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রেক্ষিত সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাক ও বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপে দেখা গেছে, এ সময়ের মধ্যে মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে দশ কোটিতে। বর্তমান বাংলাদেশে শ্রমশক্তির পরিমাণ সোয় ছ'কোটি। জপিপে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার ২৫% লোক সত্যিকার অর্থে বেকার।[২১] হিসেব মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বেকার শ্রমশক্তির মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। অবিলম্বে এ ব্যাপারে সমন্বিত কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ২০০০ সালে দেশের অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি হবে। কৃষি ও শিল্পখাতে চার বছরে, বর্তমানের কাঠামোয় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ৬% নিশ্চিত করা হলেও ৩০% ভাগ বেকার মানুষের জন্য নতুন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো সহ ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় বড় ধরনের আঘাত আসবে।[২২]

বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জি.ডি.পি) ৩৫৪৬ কোটি মাকিন ডলার।[২৩] সাম্প্রতিক ম্যাক্রো ফান্ডামেন্টালে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি অবনতিশীল–ঘাটতি বাড়ছে। আমদানি হার রপ্তানি হারের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৪] বর্তমানে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় প্রায় ২৮৯ মার্কিন ডলার।[২৫]

---

২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১২-১০-৯৬ ইং

২২. গাজী মোঃ আব্দুল মান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও গুণক প্রক্রিয়া: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা: এপ্রিল-জুন, ২০০০ ইং) পৃ. ৮৯

২৩. স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা: ৩-৮-১৯৯৯ ইং।

২৪. অর্থনীতির পাতা, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৩-১০-'৯৬ ইং।

২৫. স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা: ৩-৮-১৯৯৯ ইং।

চীন, জাপানের মত এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছতে কত সময় লাগবে তা বলা মুশকিল। তবে যোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটা বিস্ময়কর ক্রমপ্রবৃদ্ধিশীল রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে, এতে সন্দেহ নেই। যেমন উন্নতি লাভ করেছিল থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং বর্তমানে মালয়েশিয়া।

আত্মহত্যা ও নৈতিকতা

আত্মহত্যা একধরনের আত্মবিলোপ বা আত্মনিধন। সাধারণ আত্মহত্যা বলতে জীবন থেকে পলায়নী একটি মনোবৃত্তিকে বুঝায়। আর এক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি।

মানুষের জীবন সংগ্রামমুখী। জীবনে চলার পথে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার মধ্য দিয়েই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু যারা জীবনের বাস্তব সমস্যাকে মোকাবেলা করতে ভয় পায়, জীবনের সংগ্রামে যারা পরাজিত ও ব্যর্থ তারা আত্মহত্যা নামক একটি জঘন্য ও ঘৃণ্য পথকে অবলম্বন করে। এ ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সাহসিকতা ও সহনশীলতার মতো নৈতিক গুণাবলি হারিয়ে তার বিপরীত ভীরুতা, অবৈধতা ও কাপুরুষতার মতো অসৎ দিকসমূহ অনুশীলিত হয়। এই কারণে আত্মহত্যা একটি মারাত্মক নৈতিক ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃত। অতিরিক্ত আবেগের কারণে আত্মহত্যা নামক এই ভয়াল পরিণতি মানুষ নিজেই ডেকে আনে।

আত্মহত্যা নৈতিকতা বিরোধী কিনা?

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে রয়েছে বিচারশক্তি অন্যদিকে অনুভূতি ও আবেগ। এখন এ দুটির সুসমন্বয়ে মানুষের জীবন হয় উন্নত ও সার্থক। এদের মধ্যে ব্যর্থতাজনিত কারণে অনুভূতির আবেগ তার অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রাধান্য বিস্তার করে বিচারবুদ্ধিকে যখনই পরাজিত করে তখনই অনর্থের সৃষ্টি হয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষের বিচারবুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্যই বেশি। আত্মহত্যাকারী ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তির স্বাদ পেতে চাইলেও তা আসলে মানবতা বিরোধি কাজ বলে মনে হয়। অপরদিকে বলা যায়, আত্মা যেহেতু মানবের সৃষ্টি নয়, বিধাতার দান; সেহেতু ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যা পাপ। আবার আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষ যখন তার জীবনকে চরমভাবে গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন বলে বিবেচনা করে, তখন জীবন তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। কিন্তু দুঃখকে জীবন থেকে পৃথক করা যায় না। দুঃখই সুখের মূল্যায়ন করে। এগুলো দেখে পিছপা না হয়ে সাহসিকতার সাথে জ্ঞানীর মত মোকাবিলা করা উচিৎ। এগুলোর কাছে মাথা নত করে কেউ আত্মহত্যা করলে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ উভয় দিক থেকে পাপ। এগুলোকে জয় করার মধ্যে রয়েছে জীবনের সার্থকতা। দুঃখ-কষ্টকে জয় করার জন্য মানুষের প্রয়োজন অসীম ধৈর্য । মানুষ মনে করে জীবন দুঃখময় অশান্তি ও অকল্যাণের কারণে। তাদের উদ্দেশ্যে কবি হেমচন্দ্র বলেন, "বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে, এ জীবন নিশার স্বপন, দারা-পুত্র-পরিবার কে তোমার কে বা কার তাই বলে করিও না ক্রন্দন।" আসলে মানুষের জীবন সংগ্রামপূর্ণ। এ সংগ্রামে বহু বাধা বিপত্তি আসবে, এসব বাধাকে চরম সাহসিকতার সাথে জয় করার মধ্যে নিহিত রয়েছে সার্থক জীবন। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সাহস, ধৈর্য ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

বিস্তৃত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, আত্মহত্যার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে। তবে পক্ষের যুক্তিগুলোর তুলনায় বিপক্ষের যুক্তিগুলোর গুরুত্ব বেশি। তাই আমরা বলতে পারি যে, আত্মহত্যা একটি নৈতিক সমস্যা এবং কোন ভাবে এটি সমর্থনযোগ্য নয়।

আত্মহত্যার প্রকারভেদঃ

নীতিবিজ্ঞানীগণ আত্মহত্যাকে সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই সাত শ্রেণি নিম্নরূপঃ

১৮ আবেগিক আত্মহত্যা
১৯ উদাসী আত্মহত্যা
২০ আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্নকারী আত্মহত্যা
২১ সুখ-দুঃখ গণনাকারী আত্মহত্যা
২২ বাঁচার ইচ্ছাহীনতামূলক আত্মহত্যা
২৩ অবিনাশী দুঃখমূলক আত্মহত্যা
২৪ নৈতিক অঙ্গীকারমূলক আত্মহত্যা

১. আবেগিক আত্মহত্যাঃ

আবেগিক আত্মহত্যা বলতে এমন এক প্রকার আত্মহত্যাকে বুঝায় যা গভীর ও তীব্র ইচ্ছা অথবা আবেগ তাড়িত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ আত্মহত্যা করে না। যেমন, প্রেমিক তার প্রেমিকার দ্বারা প্রতারিত হয়ে অথবা প্রেমিকা তার প্রেমিকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অতি দুঃখে আত্মহত্যা করে। এরূপ আত্মহত্যা নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য নয় এবং প্রজ্ঞাসম্মত ও নয়।

২. উদাসী আত্মহত্যাঃ

উদাসী আত্মহত্যা হচ্ছে এমন এক প্রকার আত্মহত্যা যা গভীর ও তীব্র কামনা দ্বারা তাড়িত না হয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তির উদাসীনতার কারণে সংঘটিত হয়। এরূপ আত্মহত্যা অভাবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যর্থতা, হতাশা, বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এই আত্মহত্যা নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়।

৩. আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্নকারী আত্মহত্যাঃ

আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্নকারী আত্মহত্যা বলতে এমন এক প্রকার আত্মহত্যাকে বুঝায় যা ব্যক্তির নিজের জীবনকে মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয় ভাবনা থেকে ঘটে থাকে। সাধারণত এরূপ আত্মহত্যা আত্মগ্লানি, নিজের মর্যাদা হীনতাবোধ হীনম্মন্য মানসিকতা ও প্রবণতা ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ আত্মহত্যার মনোভাব সৃষ্টিতে অকৃতকার্যতা,বন্ধুর প্রতারণা, বিচার ক্ষমতা লোপ, সুখ-দুঃখের গণনায় ভ্রান্তি ইত্যাদি ভূমিকা পালন করে। এরূপ আত্মহত্যার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই।

৪. সুখ-দুঃখ গণনাকারী আত্মহত্যাঃ

সুখ-দুঃখের গণনাকারী আত্মহত্যা বলতে এমন এক প্রকার আত্মহত্যাকে বোঝায় যার সিদ্ধান্ত সুখ-দুঃখের লাভ-ক্ষতি গণনার মাধ্যমে নেয়া থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ এবং লাভ-ক্ষতিকে জীবনের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয় বলে মনে করে এবং এক পাওয়ার ব্যর্থতার ফলে জীবনকে মূল্যহীন ও অসার ভাবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সুখ-দুঃখের ভারসাম্য বিন্দুতে অবস্থান করে ততক্ষণ বাঁচতে চায়। কিন্তু যখন এ ভারসাম্য বিশেষ বিন্দু থেকে নেমে চলে আসে তখন বেঁচে থাকার আর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ফলে আত্মহত্যা করে। এরূপ আত্মহত্যা নৈতিক দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায় এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ।

৫. বাঁচার ইচ্ছাহীনতামূলক আত্মহত্যাঃ

সাধারণত একজন মানুষ আত্মহত্যার পথ তখনই বেছে নেয় যখন সে বেঁচে থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতির তখনই উদ্ভব হয় যখন কোন মানুষ কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং এরূপ অসুখ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় ও সুস্থ হওয়ার কোন ক্ষীণ প্রত্যাশা করতে পারে না। এরূপ আত্মহত্যাকে নৈতিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায় না। কারণ কোন মানুষই নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না যে সে পূর্ণ সুস্থ হবে কিনা। এমনও দেখা গেছে যে, ডাক্তার নিশ্চিতভাবে বলে দিয়েছে যে, এই রোগী আর কখনই সুস্থ হবে না, অথচ পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেছে। কাজেই এরূপ আত্মহত্যার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই।

৬. অবিনাশী দুঃখমূলক আত্মহত্যাঃ

জীবনের সঠিক মূল্য ও মর্যাদা নিরূপনের উপায় হিসেবে যারা কেবল মাত্র সুখ-দুঃখের পরিমাণ গণনা প্রণালী নির্ণয়ের পথ ধরে নিজেদের জীবনের বেদনার মারাত্মক পরিণতি, দুঃখের তীব্রতা, জীবনের চিরস্থায়ী দূরাবস্থা এবং জীবনের অবিনাশী ক্ষতির শক্তি প্রত্যক্ষ করে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যাকে একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে বেছে নেয় তারা এই ধরনের আত্মহত্যা করে থাকে। বস্তুত এরূপ আত্মহত্যার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। কেননা, নৈতিক গবেষণারয় প্রমাণিত হয়েছে যে, সুখ দুঃখই মানব জীবনের একমাত্র মানদণ্ড নয়। মানব জীবনের পূর্ণতার জন্য অতিমূল্যবান আরো মানদণ্ড রয়েছে। এছাড়া মানুষের ভবিষ্যত্ সুখ-দুঃখ– এর পরিমাণ ও পরিণতি কী হবে তা কোন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

৭. অঙ্গীকারমূলক আত্মহত্যাঃ

রাজনৈতিক আদর্শ, সমাজের প্রতি অঙ্গীকার, কোন বিশেষ দায়িত্বের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়ে যখন আত্মহত্যা করা হয় তখন তাকে অঙ্গীকারমূলক আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যাকেও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যায় না। কেননা, মানুষের কোন দায়িত্ব ইচ্ছাপূর্বক ব্যর্থ হয় না। এটা একটি অনৈতিক বিষয়। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নেই। শুধু চেষ্টা করে যেতে পারে। তাই এই আত্মহত্যা সমর্থন করা যায় না।

৮. আত্মহত্যার কারণসমূহঃ মানুষ কেন আত্মহত্যা করে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নৈতিক গবেষণায় কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. অতি আবেগের দ্বারা তাড়িত হওয়া।
২. বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা ও নৈতিকতা অবলম্বনে ব্যর্থতা।
৩. পলায়নী মনোবৃত্তি।
৪. সহনশীলতার অভাব।
৫. দুঃখের কারণে জীবনকে অর্থহীন মনে করা।
৬. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবহেলা এবং অবিচার।
৭. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা।
৮. কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেয়া।

আত্মহত্যার বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তি:

নীতিবিজ্ঞানীগণ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কতগুলো অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। আমরা এখানে এসব নৈতিক যুক্তি তুলে ধরব।

প্রথমত, জন লক আত্মহত্যার বিরুদ্ধে একটি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তার যুক্তি হলো সকল মানুষ আল্লাহর সম্পত্তি। তাই ব্যক্তির উপর একমাত্র অধিকার আল্লাহর, ব্যক্তির নিজস্ব কোন অধিকার নেই। অতএব ব্যক্তির আত্মহত্যার অধিকার থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিজেকে রক্ষা করা এবং স্বেচ্ছায় নিজেকে পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

দ্বিতীয়ত, বিখ্যাত জার্মান নীতিবিজ্ঞানী ইমানুয়েল কান্ট দুটি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তার যুক্তি এই যে, নৈতিক নীতি সম্পূর্ণ স্বশাসিত। নিজের অধিকার প্রয়োগের জন্য সে অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এরকম একটা নীতি থাকতে হলে জগতে এমন একটা কিছু থাকা চাই, যার অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। সে মূল্য আছে যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন জীবকুলের এবং মানুষ সে শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বনির্ভর মূল্য। কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করলে এই মৌলিক নীতির লংঘন করা হয়। তাই আত্মহত্যার করে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয়ত, কান্ট বলেন, প্রতিটি মানুষ নিজেই তার কোনকিছু লাভের উপায়মাত্র নয়। কিন্তু মানুষ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে বোঝা যায়, সে চিরকাল নিজের জীবনকে সুখ, আনন্দ, সম্মান ইত্যাদি অর্জনের নিছক উপায় হিসেবে দেখেছে। সে কারণে জীবনে যখন এগুলো যোগান দিতে ব্যর্থ হয় তখন নিজেকে নিতান্তই একটা দুঃসহ বোঝার মত মনে করে। এটা মানব মর্যাদার মারাত্মক অবমাননা। তাই আত্মহত্যা সম্পূর্ণ নৈতিকতা বিরোধী।

চতুর্থত, প্রতিটি মানুষের কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তার নৈতিক কর্তব্য পালন হয় না। এর ফলে তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, পিতা-মাতা, আত্মীয় এবং যে সমাজ ও দেশ থেকে সে উপকৃত হয়েছে সেসব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়। তাই আত্মহত্যা নৈতিকতা বিরোধী।

পঞ্চমত, ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী দুঃখ-চিন্তা, সুখ-দুঃখ পরিমাপ, ভাগ্য-গণনা, চিরস্থায়ী দূরাবস্থা, জীবনের অবিনাশী ক্ষতির সম্ভাবনা ইত্যাদি চিন্তা থেকে আত্মহত্যা করে। এরূপ আত্মহত্যার কোন ভিত্তি নেই। কেননা, নৈতিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনের একমাত্র মানদণ্ড নয়। মানুষের জীবনের পূর্ণতার জন্য অতিমূল্যবান যা যা সংঘটিত হয়, সে সব বিষয় সম্বন্ধে কখনো নিশ্চিত হওয়া যায় না। এগুলো সম্ভাব্য চিন্তা মাত্র। নৈতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এসব চিন্তা পরবর্তীতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে আত্মহত্যাকে নৈতিক ভাবে সমর্থন করা যায় না।

ষষ্ঠত, মনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী জেরেম. এ. মুটো দীর্ঘ গবেষণা থেকে একটি সত্য উদঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, মানসিক চাপ ও দুঃখের মাত্রাতিরিক্ত অনুভূতির ফলে ব্যক্তির সিদ্ধান্তের চরম বিকৃতি ঘটতে পারে এবং মানসিক চাপ ও ভারসাম্যহীনতার কারণে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিণতি চরম হতাশা বয়ে আনতে পারে। যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে নানা প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হতে পারে। তাই বলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া উচিৎ নয়।

সপ্তমত, একজন সুস্থ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি আজ হয়ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু আগামীকাল সে নিজের জীবনে খুঁজে পেতে পারে নতুন অর্থ, নতুন প্রেরণা ও নতুন আশা। সুতরাং আজকের সাময়িক হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করার স্বাধীনতা তাকে দেয়া যায় না। অন্যের না হোক অন্তত নিজের কল্যাণের জন্যই। এদিক থেকেও আত্মহত্যার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও নৈতিক জীব। দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতা ইত্যাদি মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোকে সাহস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে জীবনের পূর্ণতা সাধন করাই মানুষের নৈতিক কর্তব্য। এগুলোকে জয় করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। এগুলোর কারণে আত্মহত্যা করা কোনক্রমেই নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করা যায় না। আমাদের আরো মনে রাখা উচিৎ যে, এ জগৎ কেবল দুঃখ ও অশান্তিতে ভরপুর নয় বরং এ জগৎ সুখ, আনন্দ, কল্যাণ তথা জীবনের পূর্ণতার সামগ্রিক উপাদানে ভরপুর রয়েছে। এই সত্যটুকু বুঝতে অক্ষম ব্যক্তিরাই দুঃখকে জীবনের পরিণতি মনে করে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার মাঝে আছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। শ্রেষ্ঠ হিসেবে মানুষের মধ্যে আবেগের পাশাপাশি সহজাত হিসেবে রয়েছে বুদ্ধি, যুক্তি ও নৈতিকতা। তাই দুঃখ-হতাশা ও ব্যর্থতাকে জয় করার চেষ্টা না করে জীবন হতেই পালানোর চেষ্টা মানবোচিত নয়। এজন্য আত্মহত্যা মানবের জন্য এক অপমানজনক বিষয়।

আত্মহত্যা করা মহাপাপ:

মহান আল্লাহ্ রাবব্বুল আলামীন বলেন, "আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার।-সূরা নিসা: ২৯-৩০

ইমাম ওয়াহেদী ও হযরত ইবনে আবব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। কেননা, তোমরা একই দ্বীনের অনুসারী। অতএব, তোমরা যেন একই দেহ। কিন্তু আর এক দল আলেম বলেন, এ আয়াতে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ মতটিই সঠিক। কেননা, আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "রাসূল (স.) এর পরিচালিত নেতৃত্বে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধের ময়দানে থাকা অবস্থায় এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। সে রাতে গোসল করলে ঠান্ডায় আমার মারা যাওয়ার আশংকা ছিল। সে অবস্থায় তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজর নামাজ পড়লাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে এ ঘটনা খুলে বললে তিনি আমায় বললেন, হে আমর, তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে অপবিত্র দেহে নামাজ আদায় করেছো। আমি রাসূল (স.) কে গোসল না করার কারণ অবহিত করলাম। বললাম, আমি কুরআনে পড়েছি, "এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়ালু।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) আর কোন মন্তব্য না করে হেসে দিলেন। এতে প্রমাণিত হয়, হযরত আমর (রা.) এ আয়াতের অর্থ আত্মহত্যা বুঝিয়েছেন, অপরকে হত্যা করা নয়। নবী করীম (স.) ও এর সমর্থন করেন।

হযরত যুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এক লোক আহত হয় এবং প্রচন্ড ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ে, শেষে ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে। অধিক রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার

বান্দা আমাকে রেখে নিজেই নিজের ব্যাপারে ফায়সালা করেছে। আমি তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিলাম।-বুখারি ও মুসলিম।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোহার কোন অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে বসে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে কাটতে থাকবে। জাহান্নাম তার চির আবাসস্থল। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনবরত বিষপান করতে থাকবে। জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে ও সে ব্যক্তি ঝাপিয়ে পড়তে থাকবে। জাহান্নামই তার স্থায়ী ঠিকানা।-বুখারি ও মুসলিম।

হযরত সাবিত বিন যাহ্হাক (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমান। কোন মুমিন ব্যক্তিকে অহেতুক কাফের ঘোষণা করা তাকে হত্যার পর্যায়ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে শাস্তি দেয়া হবে।-বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে, তীব্র যন্ত্রণায় তাড়াতাড়ি মৃত্যুর জন্য নিজের তরবারী দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন, সে জাহান্নামী।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা: সন্ত্রাসের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ বর্তমান মতবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এক প্রকার অসম্ভবই বটে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যে কোন বিষয় বা মতবাদের সংজ্ঞার ভিন্নতা নির্দেশ করে। তাই তো দেখা যায়, এক গোষ্ঠির দৃষ্টিতে যে কর্মকান্ড সন্ত্রাসের মতো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কর্ম, অপর গোষ্ঠির দৃষ্টিতে সে কর্মকাণ্ডই স্বাধীনতা কিংবা স্বাধিকার আদায় সংগ্রামের মতো মহৎ ও প্রশংসনীয়। সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে বিতর্ক থাকলেও বক্ষমান আলোচনার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে সন্ত্রাসের একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় নির্ধারন আবশ্যক।

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা।[১] আর সন্ত্রাস অর্থ হলো, মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়,[২] কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি।"কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।" এ সংজ্ঞাটি সব ধরনের নীতিবহির্ভূত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে

---

১. ডক্টর মুহাম্মাদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩

২. আহমাদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪১

একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যে কোন ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এমন কর্মকান্ডকে শামিল করে। তাছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট প্রকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য হবে।[৩]

১৯৮৯ সালে আরব দেশসমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে, "সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি আতঙ্ক, ভয় ও নৌজাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (তাও সন্ত্রাস)" [৪]

Britannica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA তে সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, Terrorism the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective." [৫]

"একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সুসংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ"।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, The unlawful use of force and vilence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives. (28 C.F.R. Section 0.85) [৬]

অর্থাৎ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোন সরকার ,বেসরকারি জনগণ বা অন্য যে কোন অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয় ।

যে কর্মকান্ড সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্তরের নাগরিকদের আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মাঝে ভয়-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করে তাই সন্ত্রাস এবং যে বা যারা এসকল কর্মকান্ডের সাথে জড়িত তারাই সন্ত্রাসী।

---

৩. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইবরাহীম আবুল উসারা, প্রাগুক্ত, পৃ . ৫

৪. ১৯. ড. আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুয়াইহিক, আল-ইরহাব ওয়ালগুল, জমি'আহ আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৩

৫. Britanica READY REFERENCE ENCYCLOPEDIA, New Delhi: Encyclopedia Britanica (India) Pvt. Ltd and Impulse Marketing, (Special edition for South Asia, 2005, Volume-9, P. 223

৬. www.fbi.gov/stats-service/publicctions/terrorism-2002-2005

কুরআনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ:

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস আল-কুরআনুল কারীমে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ দুইভাবে এসেছে: শাব্দিক অর্থে ও পারিভাষিক অর্থে। সন্ত্রাস এর আরবী প্রতিশব্দ 'ইরহাব' কে ভিত্তি ধরে শাব্দিক অর্থ হলো, প্রথমত: আল্লাহকে ভয় করা অর্থে এর শব্দমূলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: আল্লাহ বলেন, "মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিলো । যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিল তার মধ্যে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।"[৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে বনী ঈসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ করা যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।[৮]

আল্লাহ অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ কর না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।"[৯]

দ্বিতীয়ত: মানুষকে ভয় দেখানো বা সন্ত্রস্ত করা অর্থেও ইরহাব শব্দের সরাসরি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন; "তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত্র করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না"[১০] সামান্য পরিবর্তিত ফর্মে শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "সে (মূসা) বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা (যাদুকররা রজ্জু ও লাঠি) নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক রকমের জাদু দেখালো।"[১১]

প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য ইরহাব শব্দের ব্যবহার কুরআনে পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বুঝানোর জন্য কুরআনে 'ফিতনাহ' এবং 'ফাসাদ' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সীরাত বিষয়ক উর্দু বিশ্বকোষ 'নুকুশ' এর বর্ণনা নিম্নরূপ, "পবিত্র কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যার কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তা-ই হলো 'ফিতনা' এবং যার কারণে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তা-ই হলো 'ফাসাদ'।[১২]

---

৭. আল-কুরআন, ৭:১৫৪।

৮. আল-কুরআন, ২:৪০।

৯. আল-কুরআন, ১৬:৫১।

১০. আল-কুরআন, ৮:৬০।

১১. আল-কুরআন, ৭:১১৬।

১২. মোঃ মুখলেছুর রহমান, সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম, ঢাকা: এন আরবি গ্রুপ, ২০১১, পৃ. ১৫

আল-কুরআনে ‘ফিতনা’ প্রসঙ্গ:

আল-কুরআনে ‘ফিতনা’ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে ‘ফিতনা’কে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা, ইবাদতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, “পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।”[১৩]

২. দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর-বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনার আওতাভুক্ত। আল্লাহ বলেন, “যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অত:পর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[১৪]

৩. জবরদস্তিমূলক সত্যকে দমন করা এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধ্য দেয়া। আল্লাহ বলেন, “ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনে নাই। বস্তুত ফিরআওন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।”[১৫]

৪. মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বল প্রয়োগের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, “আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চুড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো।”[১৬]

৫. বিশ্বাসীদের বিপদে ফেলা আল্লাহ বলেন, “যারা বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রনা।”[১৭]

৬. অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত করা। আল্লাহ বলেন, “যদি বিভিন্ন দিক হতে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করত, তারা এতে কালবিলম্ব করত না।”[১৮]

---

১৩. আল-কুরআন, ২:২১৭।

১৪. আল-কুরআন, ১৬:১১০।

১৫. আল-কুরআন, ১০:৮৩।

১৬. আল-কুরআন, ১৭:৭৩।

১৭. আল-কুরআন, ৮৫:১০।

১৮. আল-কুরআন, ৩৩:১৪।

আল-কুরআনুল কারীমে ‘ফাসাদ’ শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবাহৃত হয়েছে। যে সব আয়াতে ‘ফাসাদ’ শব্দকে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

অন্যায় শাসন ও হত্যাকান্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআনে আল্লাহ ফির’আউনকে ‘ফাসাদ’ সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো।

আল্লাহ বলেন, “ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানের অধিকাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।”[১৯]

ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন চালানো। প্রাচীনকালের আদ, সামুদ, লুত, মাদায়েনবাসী সহ বিভিন্ন জাতিকে আল-কুরআনে আল্লাহ ফাসাদকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন-যাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করেছিল।

আল্লাহ বলেন, “যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।”[২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর-যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”[২১]

আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তাও ফাসাদ।

আল্লাহ বলেন, “সে বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে, এরাও এরূপই করবে।”[২২]

অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন, “আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না।”[২৩]

---

১৯. আল-কুরআন, ২৮:৪।
২০. আল-কুরআন, ৮৯:১১।
২১. আল-কুরআন, ২৯:২৯।
২২. আল-কুরআন, ২৭:৩৪।
২৩. আল-কুরআন, ২৭:৪৮।

জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার করা। যে ধরনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে আল-কুরআন 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করেছে।

আল্লাহ বলেন, "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।"[২৪]

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় আল-কুরআন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[২৫]

অন্যায়ভাবে বা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। আল্লাহ বলেন, "এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।"[২৬]

পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটা তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হব। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[২৭]

হাদীসের সন্ত্রাস প্রসঙ্গ:

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসে সন্ত্রাস শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক বুঝতে বেশ কিছু পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সেসব পরিভাষার অন্যতম হলো, আল-কতলু (القتل) বা হত্যা, আয-যুলুম (الظلم) বা অত্যাচার, আত-তারভী, (لترويع) বা ভয় প্রদর্শন, হামলুছ ছিলাহ (حمل السلام) বা অস্ত্র বহন করা, আল-ইশারাতু বিছ-ছিলাহ (الاشارة بالسلاح) বা অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। তবে এসব পরিভাষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ বুঝাতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

১. একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না।"[২৮]

---

২৪. আল-কুরআন, ২:২০৫।

২৫. আল-কুরআন, ২:২৭।

২৬. আল-কুরআন, ৫:৩২।

২৭. আল-কুরআন, ৫:৩৩।

২৮. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ: তাহরীমুয যুলুম, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবি।, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪।

২. স্বাভাবিকভাবে একজনের রক্ত, সম্পদ, সম্মানহানি করা অপরজনের জন্য হারাম। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যে রূপ হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন।”[২৯]

৩. কোন মুসলিমকে আতঙ্কিত করা অবৈধ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।”[৩০]

৪. কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য নয়। এ মর্মে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।”[৩১]

৫. কোন মুসলিমকে অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা হুমকি না দেয়। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে; অত:পর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে”।[৩২] রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “কোন ব্যক্তি যদি লোহা দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয় তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফিরিস্তাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাই হয়।” [৩৩]

৬. আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে আত্মহত্যাও হারাম। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।”[৩৪] রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন, “যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে।”[৩৫]

৭. শুধু মুসলিম ব্যক্তিকে নয়, কোন চুক্তিবদ্ধ অসুসলিমকে হত্যা করা ও নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে বসবাসকারী চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।”[৩৬]

---

২৯. ইমাম বুখারি, সহীহ্ বুখারি, অধ্যায়ঃ আল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ কওলিন নাবিয়্যি (স.) রুবক্ষা মুবাল্লিগিন আওআমিন সামিঈন, বৈরূতঃ দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৩৭

৩০. ইমাম আবূ দাউদ, আস্-সুনান, অধ্যায়ঃ আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ মাই ইয়াখুযুশ শাইআ ‘আলাল মিযাহি, বৈরূত : দারুল কিতাব আল আরাবিয়্যা, তা. বি., খ.৪, পৃ. ৪৫৮

৩১. ইমাম বুখারি, সহীহ্ আল-বুখারি, অধ্যায়ঃ আদ দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ কওলুল্লাহি তা‘আলা ওয়া মান আহইয়াহা/ আল-মায়িদাহ্-৩২, প্রাগুক্ত,খ. ৬, পৃ. ২৫২০

৩২. ইমাম বুখারি, সহীহ্ আল-বুখারি, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান, অনুচ্ছেদঃ কৃওলুন্নাবিয়্যি স. মান হামালা আলান্নাস সিলাহা ফা লাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৯২

৩৩. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব অনুচ্ছেদঃ আন নাহইউ আনিল ইশারাতি বিসসিলাহি ইলাল মুসলিমীন, প্রাগুক্ত, তা.বি. খ. ৪ পৃ. ২০২০

৩৪. ইমাম বুখারি, সহীহ্ আল-বুখারি, অধ্যায়ঃ আল-আদাব, অনুচ্ছেদঃ মা ইউনহা আনিস সিবাবি ওয়াল লা‘নি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৪৭

৩৫. ইমাম বুখারি, সহীহ্ আল-বুখারি, অধ্যায়ঃ আল-জানাইয, অনুচ্ছেদঃ মা জা‘আ কাতিলিন নাফস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

৩৬. সহীহ্ আল-বুখারি, অধ্যায়ঃ আল-জিযইয়া ওয়াল মাওয়াদিআতি, অনুচ্ছেদঃ ইছমু মান কাতালা মু‘আহিদা বিগাইরি জুরম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫

৮. সন্ত্রাসীর অন্তরে দয়ামায়া থাকে না, তাই সে হতভাগা। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "একমাত্র দুর্ভাগা ব্যক্তি হতেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।"[৩৭]

৯. ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করা বড় গুনাহসমূহের অন্যতম যার গুনাহ আল্লাহ মা'ফ করবেন না। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহকে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিবেন।"[৩৮]

১০. অন্যায়ভাবে মু'মিনকে হত্যাকারীর কোন ইবাদত কবুল করা হবে না। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করবেন না।"[৩৯]

১১. নিষিদ্ধ পন্থায় অপরের রক্তপাত ঘটানো মু'মিনকে উচ্চ মর্যাদা থেকে স্খলিত করে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "মু'মিন ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে।"[৪০]

১২. কোন মুসলিমকে হত্যা করা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার থেকেও গুরুতর। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।"[৪১]

১৩. নিরাপত্তা প্রদানকৃত যে কোন ধর্মাবলম্বীকে হত্যাকারীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে আমার সাথে ঐ হত্যাকারীর কোন সম্পর্ক থাকবে না, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।"[৪২]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামঃ

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। আল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[৪৩] অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন, "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে

---

৩৭. ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়ঃ আল-আদাব, অনুচ্ছেদঃ ফির রহমাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

৩৮. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, অধ্যায়:আল ফিতান, অনুচ্ছেদঃ ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিনি, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ১৬৭

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, অধ্যায়:আল ফিতান, অনুচ্ছেদঃ ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিনি, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ১৬৭

৪০. ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, অধ্যায়:আল ফিতান, অনুচ্ছেদঃ ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিনি, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ১৬৭

৪১. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়ঃ আদ-দিয়াত আন রসূলিল্লাহ্ (স.), অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী তাশদীদি কতলিল মু'মিনি, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ৪২৬

৪২. ইমাম আত-তাবরানী, আল-মুজামুস সগীর, অধ্যায়ঃ হারফুল হামযাহ্, অনুচ্ছেদঃ আল আলফ মিন ইসামিহি আহমাদ, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫, খ. ১, পৃ. ৪৫

৪৩. আল-কুরআন, ৩ঃ ১৯।

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।”[৪৪] ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই শান্তি। এ জীবনব্যবস্থার এরূপ নামকরণই প্রমাণ করে যে, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ইসলামের সামগ্রিক প্রকৃতি ও মৌল দৃষ্টিকোণ হতে উৎসারিত। তাই ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান থেকে শান্তির ফল্গুধারা নিঃসৃত হয়। শান্তিময় পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য শান্তি বিঘ্নিত করে এমন সকল কর্মকান্ড প্রতিরোধ অপরিহার্য। তাই যৌক্তিকভাবেই ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর স্থয়িত্ব বজায় রাখার স্বার্থে সকল ধরনের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মূল করার নির্দেশনা দান করে। ইসলাম বলতে প্রথমত ও প্রধানত কুরআন ও রসূল (স.) এর সুন্নাহ বা হাদীসকেই বুঝায়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল-কুরআনের নির্দেশনা: আল-কুরআনে প্রথমত সাধারণভাবে সন্ত্রাসের কারণ সৃষ্টি হওয়ার ছিদ্রপথ বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১. ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ ও অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করতে নিষেধ প্রদান করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে যে, “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।”[৪৬]

২. সন্ত্রাস মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের ফলেই সৃষ্ট। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে আল-কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ বলেন, “ বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না; এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরন করো না।”[৪৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না”।[৪৮] উপরোক্ত প্রথম আয়াতে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হলেও অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি মুসলিমদের জন্যও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

৩. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ বলেন, “দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।”[৪৯]

---

৪৪. আল-কুরআন; ৩: ৮৫।
রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, এই দু'টি জিনিসকে যতক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন ও তাঁর রসূল (স.) এর সুন্নাহ তথা হাদীস।”[৪৫]
তাই সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা বলতে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও রসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহতে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাস প্রতিরোধক আয়াত, হাদীস ও রসূলুল্লাহ (স.) এর আদর্শ এত বেশি যে, তার সবগুলো এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে ঐ তিন উৎসের মৌলিক নির্দেশনাসমূহ নিম্নে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

৪৫. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, অধ্যায়: আল-ক্বাদ্‌র, অনুচ্ছেদ: আন নাহ্‌ইউ আনিল ক্বওলি বিল ক্বাদর, মিসর: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৮৯৯।

৪৬. আল-কুরআন, ১৬:৯০।

৪৭. আল-কুরআন; ৫: ৭৭।

৪৮. আল-কুরআন; ২: ১৯০।

৪৯. আল-কুরআন; ৭ : ৫৬।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্বখ্যাত মুফাসসির হাফিয ইবনে কাছীর (র.) বলেন, "শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকান্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যথাযথভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দার জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।"[৫০]

ইমাম কুরতুবী র. বলেন, "স্বল্প-বিস্তর যতটুকুই হোক শান্তি স্থাপনের পর আল্লাহ পৃথিবীতে কম বা বেশি যাই হোক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।"[৫১]

অনর্থ বিপর্যয় করতে প্রয়াসী হতে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না"।[৫২]

৪. সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।"[৫৩] আদম সন্তানকে সম্মানিত ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, "আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৫৪] এত মর্যাদাবান ও অনুগ্রহপুষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সমগ্র মানবজাতির কোন এক সদস্যের প্রাণহানি ঘটানোকে সমগ্র মানবজাতির প্রাণহানি ঘটানোর সাথে তুলনা করে আল্লাহ বলেন, "এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, যে কেউ অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে হত্যা করবে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল।"[৫৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করার শাস্তি বর্ণনা করে বলেন, "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম–সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত (অভিশাপ) করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৫৬]

৫. সম্প্রতি সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য অর্জনে আত্মঘাতি হামলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই হামলার মাধ্যমে সন্ত্রাসী তার নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। অথচ আল-কুরআনে নিজেকে ধ্বংস করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মঘাতি হামলা আত্মহত্যার শামিল, আর উভয়ই স্পষ্ট হারাম।

আল্লাহ বলেন, 'নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালবাসেন।"[৫৭]

---

৫০. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুরআন, রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬
৫১. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুরআন, রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬
৫২. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭।
৫৩. আল-কুরআন; ৬ :১৫১।
৫৪. আল-কুরআন; ১৭ : ৭০।
৫৫. আল-কুরআন, ৫ : ৩২।
৫৫. আল-কুরআন, ৪ : ৯৩।
৫৭. আল-কুরআন; ২ : ১৯৫।

এভাবে আল-কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াতে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা, আহত করা, আত্মহত্যা করা, অন্যের সম্পদ লুট করা, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা ঘটানোসহ সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম, প্রতিরোধ, শান্তি সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে। এসব আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে রসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সন্ত্রাস পৃতিরোধে আল-হাদীসের নির্দেশনাঃ

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে আল-হাদীসেও ব্যাপক নির্দেশনা এসেছে। প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "বিবাহিতা ব্যভিচারী, হত্যার বদলে হত্যা এব দ্বীন (ইসলাম) ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অপরাধ ব্যতীত 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ সাক্ষ্য দানকারী কোন মুসলিমের রক্ত বৈধ নয়।"[৫৮]

সন্ত্রাস অর্থই হচ্ছে ত্রাস, ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অন্যকে আতংকিত করা। কিন্তু আল-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, কোন মুসলিমকে আতংকিত করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতংকিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।"[৫৯]

সন্ত্রাস একটি অন্যায় কর্ম। যে কোন অন্যায় কর্ম দেখে তা প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ প্রচেষ্টা পরিচালিত করার নির্দেশনা প্রদান করে রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি অন্যায় করতে দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা প্রতিবাদ করবে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।"[৬০]

সন্ত্রাস সম্পর্কে উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন তো করেই না, বরং তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম নয়। তারা ইসলামের তথা কুরআন ও হাদীসের রীতিনীতি ও নির্দেশাকে বিসর্জন দিয়েছে। তেমনি বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা করে নির্বিচারে রিপরাধ মানুষকে হত্যা করছে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে তারা তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা সৎ ও তাকওয়াভিত্তিক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালংঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না।"[৬১] বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রতিরোধ হবে।

---

৫৮. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুরআন, রিয়াদঃ দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬

৫৯. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্কামিল কুরআন, রিয়াদঃ দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬

৬০. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭।

৬১. আল-কুরআন; ৬ :১৫১।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে রসূলুল্লাহ (স.) এর কার্যক্রমঃ

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৬২] এজন্য তিনি সর্বদাই বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও তৎপর ছিলেন এবং সন্ত্রাস, অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার প্রতিরোধে সমগ্র জীবন বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। রসূল (স.) একদিকে ছিলেন শান্তিস্থাপনকারীদের জন্য সুসংবাদকারী অপরদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য ছিলেন সতর্ককারী। আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জল প্রদীপরূপে।"[৬৩]

উজ্জল প্রদীপরূপী রসূল (স.) তাঁর সমগ্র জীবনে যে আদর্শ বাস্তবায়িত করেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমে আজো পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে রসূলুল্লাহ (স.) কেই গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

সামাজিক বন্ধনহীন পরিস্থিতি, অস্থির ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ, বল্গাহীন নেতৃত্ব, শঠতা, প্রবঞ্চনা, হত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি অকল্যাণকর কার্যকরণের ফলশ্রুতিতে আরবের গোত্রে গোত্রে কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বত্র স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মানুষের শান্তিময় জীবন মারাত্মকভাবে লংঘিত হতে থাকলে জনসাধারণ এই অশান্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উদ্বিগ্ন করেছিলেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল "হিলফুল ফুযুল" নামক চুক্তি সম্পাদন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বয়স যখন ১৫ বছর মতান্তরে ১৭ বা ২০ বছর তখন আরবের কায়স ও কিনানার গোত্রসমষ্টির মধ্যে হজ্জের পবিত্র ও সম্মানিত মাসে 'হারবুল ফুজ্জার' সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাশিম সম্প্রদায়ের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র জুবাইরের প্রস্তাবে মক্কার আব্দুল্লাহ ইবনে জাদ'আনের বাসভবনে বনী হাশিম, বনী যুহরা, বনী তাঈম, বনী মুত্তালিব, বনী আসাদ, গোত্রের সকলে সম্মিলিতভাবে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস প্রতিরোধে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুহাম্মদ (স.) এই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন।

চুক্তিটিকে ইতিহাসে "হিলফুল ফুযুল" নামে অভিহিত করা হয় এই চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রসমূহ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সারমর্ম হলো।

---

৬২. ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুবাদ-আকরাম ফারুক, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩, পৃ. ১১৫

৬৩. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল বুখারী, অধ্যায়ঃ ফাযায়িলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদঃ উফুদুল আনসার ইলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লামা বি মাক্কাতা ওয়া বাইয়াতুল আকাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩. পৃ. ১৪১৩

১. আমরা দেশের অশান্তি দুর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

২. বিদেশী লোকদের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

৩. দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সহায়তা করতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হবো না।

অত্যাচারী ও তার অত্যাচারকে দমাতে ও ব্যাহত করতে এবং দুর্বল দেশবাসীদেরকে অত্যাচারীর ও তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।" এই প্রতিজ্ঞা অনুযয়ী হিলফুল ফুযুলের সদস্যগণ বহুদিন যাবত কাজ করতে থাকেন। এই সেবা-সংঘের প্রচেষ্টায় দেশের অত্যাচার-অবিচার বহুলাংশ হ্রাস পেলো, রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুযুল সংঘ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইসলামের আগমনের পর এই সেবা সংঘ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। কারণ, সকল প্রকার অন্যায়, অমঙ্গল ও পাপের মূলোৎপাটন করার এবং সর্বাধিক ন্যায়, মঙ্গল ও পূণ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়ে যখন 'ইসলাম' আত্মপ্রকাশ করল তখন আর উক্ত সেবাসংঘের কোন প্রয়োজনই রইল না।"

সন্ত্রাস প্রতিরোধে তরুণ বয়সে মুহাম্মদ (স.) যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার বাস্তবায়ন তার সমগ্র জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তিনি নবুওয়াত পাওয়ার পরেও এই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেননি। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কোন একদিন বলেন, "আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি 'হে ফুযুল প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিবর্গ' বলে ডাক দেয়, আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেব। কারণ, ইসলাম এসেছে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে। এভাবে মহানবী (স.) মক্কানগরী থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও সন্ত্রাস দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ের জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধের আদর্শ রেখে গিয়েছেন।"

রসূল (স.) নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীভিত্তিক ফর্মূলা অনুযায়ী বিশ্বকে গড়ে তোলার জন্য সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস কোন সাফল্যজনক পদ্ধতি হতে পারে না। বিশেষ করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ যদি সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে যেমনটি মহানবী (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে হয়েছিল, তাহলে সন্ত্রাস নির্মূলে সন্ত্রাসী নির্মূলের নির্বুদ্ধিতাগত নীতির ফলে পুরো সমাজটাকেই প্রায় নির্মূল করে ফেলতে হবে। আবার সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বসে থাকলে সন্ত্রাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। উভয় অবস্থায়েই সমাজের সর্বনাশ অনিবার্য। তাই মহানবী (স.) সন্ত্রাস প্রতিরোধে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করে তথায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় মহানবী (স.) তাঁর সমগ্র নবুওয়াতী জীবন ব্যয় করেছিলেন। সন্ত্রাস প্রতিরোধ বা নির্মূলে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদক্ষেপ অগণিত। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. বাই‘আতে আকাবা:

নবুয়াতের দ্বাদশ বছর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদের মধ্যে ১২ জন রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে আকাবা নামক স্থানে সাক্ষাত করলে তারা তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণপূর্বক অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলেন। এই অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠানকে আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়। এই বাইয়াতে সাহাবাগণ যে বিষয়গুলোর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তার বিবরণ দিয়ে বাই‘আতের অন্যতম সদস্য উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না, চুরি-ডাকাতি করবো না, ব্যভিচার করবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অবাধ্যতা করবো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, “এসব অঙ্গীকার পূরণ করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। আর এর কোন একটি ভঙ্গ করলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। ইচেছ করলে মাফ করে দিবেন, ইচ্ছে করলে তিনি শাস্তি দিবেন।”

এই প্রতিজ্ঞার বিষয়াবলির সবগুলোই প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত। তাই মহানবী স. সন্ত্রাস প্রতিরোধে সর্বপ্রথম তার সাহাবাদেরকে সকল সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র ইসলামী বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হয়েছিল।

খ. মদীনার সনদ:

কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (স.) মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত ইয়াহুদীদের সাথে তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে মদীনার সনদ (Charter of Madina) নামে খ্যাত।[৬৪]

নবী (স.) এর পক্ষ থেকে কুরাইশী, মদীনাবাসী, তাদের অধীনস্ত এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু‘মিন ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পাদিত এ অঙ্গীকারনামায় সন্ত্রাস প্রতিরোধক যে ধারাগুলো ছিল তা নিম্নরূপ:

১. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে। ঈমানদারদের মধ্যে যারা যুলুম-অত্যাচার, পাপ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে, সকল মুমিন তাদের বিরোধিতা করবে।

২. মু‘মিনের সম্মিলিতভাবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে থাকবে। অন্যায়কারী কোন মুমিনের সন্তান হলেও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না।

৩. কোন ব্যক্তি যদি কোন মুমিনকে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার পরিবর্তে হত্যাকারীর কাছ থেকে কিসাস আদায় করা হবে। অর্থাৎ হত্যার অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাকে হত্যা করা হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, সেক্ষেত্রে কিসাস করা হবে না।

---

৬৪. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রবন্ধকার: ড. মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ ও মোহাম্মাদ আতীকুর রহমান, প্রবন্ধ: সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১১৪

৪. কোন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী বা বিদআতীকে সাহায্য করা মুমিনের জন্য বৈধ বিবেচিত হবে না। অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তিকে কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না। যদি কেউ আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। ইহলৌকিক জীবনে তার ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না।[৬৫]

গ. সন্ত্রাসীদের শাস্তিদান:

সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী (স.) সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ তিনি জানতেন সন্ত্রাসকে অঙ্কুরেই নির্মূল করা না হলে তা ক্রমেই সমাজ-রাষ্ট্রে ছড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছবে। তখন ইচ্ছা হলেই তা আর নির্মূল করা যাবে না। যেমনটা আজ বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে। তাই দূরদর্শী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স.) আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সন্ত্রাসবাদ সমূলেই নির্মূল করেছিলেন। নিম্নের ঘটনাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: উকল বা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। নবী (স.) তাদেরকে (সদকার) উটের নিকট গিয়ে উটের দুধ ও পেশাব পানে অনুমতি দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। অতঃপর তারা যখন উটের পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ হলো তখন তারা নবী করীম (স.) এর রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এ সংবাদ দিনের প্রথম ভাগেই নবী (স.) এর কাছে এসে পৌঁছল। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠালেন। বেলা বাড়লে তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। অতঃপর তাঁর আদেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়া হলো এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো। এমতাবস্থায় তারা পানি প্রার্থনা করছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। আবু কিলাবাহ্ বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।"[৬৬]

ঘ. সন্ত্রাসীদের উৎখাতকরণ:

দেশ থেকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসের নির্মূলের প্রয়োজনে মহানবী (স.) কখনো সন্ত্রাসীদেরকে গোষ্ঠীসহ উৎখাত করেছিলেন। ইয়াহুদী গোত্র বানূ নাযীর মহানবী (স.) এ সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পর মহানবী (স.) তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে উৎখাত করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মদীনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। ঘটনাটির বিবরণ হলো, "সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়্যা আদ-দামরী রা. বানু আমীরের দু'জন লোককে ভুলবশতঃ শত্রুপক্ষ মনে করে হত্যা করেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, বানূ আমীরের সাথে মহানবী (স.) এর মৈত্রীচুক্তি ছিল। ফলে মহানবী (স.) তাদেরকে 'রক্তপণ' দিতে মনস্থ করেন। আর এ কাজে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় গোত্র বানু নাযীরের কাছে যান। তাদের ব্যবসা ছিল মদীনা

---

৬৫. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

৬৬. ইমাম বুখারী, ছহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-উযূ, অনুচ্ছেদ: আবওয়াবুল ইবিলি ওয়াদ্দাওয়াবিক্ষ ওয়াল গানামি ওয়া মারাবিযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১

থেকে দুই মাইল দূরে উপকণ্ঠে। বানূ আমিরের সাথে বানূ নাযীরেরও মৈত্রীচুক্তি ছিল। বানূ নাযীরের লোকজন মহানবীকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তার সাথে প্রথমত খুবই ভাল ব্যবহার করে। তারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। মহানবী (স.) তাদের একটি দেয়াল ঘেষে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে আবু বকর, ওমর, আলী (রা.) প্রমুখ দশজন সাহাবীও ছিলেন। বানূ নাযীরের লোকজন নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন যে, এমন মোক্ষম সুযোগ আমরা আর কখনো পাব না। আমাদের কেউ যদি ঘরের ছাদে উঠে তাঁর মাথার উপর একটা ভারি পাথর ছেড়ে দেয় তবে আমরা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। আমর ইবনে জাহ্হাশ ইবন্ কাব নামে তাদের এক লোক বলল, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত। এই বলে সে ঠিকই মহানবী (স.) এর উপরে পাথর ছেড়ে দেয়ার জন্য সবার অলক্ষ্যে ঘরের ছাদে উঠে গেল। তখনই মহান আল্লাহ্ মহানবী কে ওহী মারফত এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। সাথে সাথে মহানবী (স.) সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং কাউকে কিছু না বলে সোজা মদীনায় চলে আসেন। তাঁর সাথে থাকা সাহাবীগণও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তিকে পেয়ে তারা মহানবী (স.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বলল, আমি তাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। অতঃপর তারা মদীনায় এসে মহানবী (স.) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাদেরকে ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানালেন এবং সকলকে রণপ্রস্তুতি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কে মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সেনা সমভিব্যহারে বানূ নাযীরের বসতিতে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। ছয়দিন অবরোধ করার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলেন এবং বাগান জ্বালিয়ে দেন।”[৬৭]

তখন মহানবী (স.) এর সমর্থনে আয়াত নাযিল হয়, “তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছো এবং যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখেছো তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; তা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।”[৬৮]

মূলত সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যুদ্ধকৌশল হিসেবে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অবশেষে বানূ নাযীরের মনে মহান আল্লাহ ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার পথ বেছে নিল। অন্যত্র গিয়ে যাতে তারা আবার সন্ত্রাস করতে না পারে সেজন্য মহানবী (স.) তাদেরকে সাথে করে অস্ত্র নিয়ে যেতে দেননি। শুধুমাত্র নিজেদের উটের পিঠে করে যে পরিমাণ মালপত্র নেয়া যায় সে পরিমাণই নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

---

৬৭. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আত তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ মা কতা‘তুম মিন লিনাতিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭৯

৬৮. আল-কুরআন, ৫৯:০৫

এ আদেশ এত কঠোর ছিল যে, তিলতিল করে গড়ে তোলা নিজেদের ঘরবাড়ি তাদের নিজেদের হাতেই ভেঙ্গে ফেলতে হলো। আর তার যতটুকু পারা যায় ততটুকু সাথে নিয়ে অবশিষ্ট আসবাবপত্র ছেড়ে চলে যেতে হলো। তাদের কতক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, আর কতকে চলে যায় সিরিয়ায়। ফলে মদীনা মুনাওওয়ারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের এ গোত্রটির কূটিল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায়।

ঙ. সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান:

সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহানবী (স.) প্রয়োজন হলেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন। এমনই একটি অভিযানে তিনি তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনার নিকটবর্তী যু'আমর নামক স্থানে মুসলিমদের পরাজিত ও নিঃশেষ করার দৃঢ় সংকল্পে একত্রিত বনী ছা'লাবা এবং বনী মুহারিব গোত্রদ্বয়ের এক বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোতে আত্মগোপন করে। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ সন্ত্রাসীদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গমন করেন এবং কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।[৬৯] এই অভিযানের পর পরই মুহারিব গোত্র সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে চলে এসেছিল। তবে ছা'লাবা গোত্র এর পরও কিছুদিন ধরে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রাখে। এর ফল হিসেবে ৬২৬-৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আরো পাঁচটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতুর রিকার বিরুদ্ধে মহানবী (স.) এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযান। পঞ্চম হিজরীর মুহাররম মাসে পরিচালিত এই অভিযানে যাতুর রিকাহ্ গোত্রের অবাধ্যতামূলক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে এক বিরাট নিবৃত্তকারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরপর থেকে মহানবী স. এর বিরুদ্ধে ছা'লাবার তীব্র বিরোধিতার অবসান ঘটে। এবং সপ্তম হিজরীর শেষ নাগাদ ছা'লাবা গোত্রের মধ্যে ইসলামের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।[৭০]

এভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) তাঁর সমগ্র মাদানী জীবনে দেশী ও বিদেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাত থেকে সমসাময়িক মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের এবং পরবর্তীকালের সমগ্র আরব উপদ্বীপকে সন্ত্রাসমুক্ত করে সন্ত্রাস নির্মূলে বিশ্ববাসীর সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যান। সন্ত্রাস নির্মূলে তাঁর কার্যক্রমের উপর আত্মবিশ্বাস থেকে তিনি ঘোষণা দিয়ে যান যে, "এমন একদিন আসবে যেদিন একজন আরোহী একাকী সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে এবং সে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে (কোন সন্ত্রাসীকে) ভয় পাবে না।"[৭১]

---

৬৯. অধ্যাপক এটিএম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৬, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৭০. ড.মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর সরকার কাঠামো, অনুবাদ-মুহাম্মাদ ইবরাহীম ভূঁইয়া, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩০-৩১

৭১. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ: মা লাকিয়ান নাবিয়্যি (স.) ওয়া আসহাবুহু মিনার মুশরিকীনা বি মাক্কাতা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৯৮

এ প্রবন্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা ও রসূলুল্লাহ্ (স.) এর কার্যক্রম বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় সহনশীলতা বৃদ্ধি, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি রোধ, আদর্শ সমাজ গঠন, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। আর ইসলামী দন্ডবিধি প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাসসহ যেকোন অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বর্তমান সৌদি আরব। সেখানে ইসলামী দন্ডবিধি কার্যকর থাকায় অপরাধের হার সারাবিশ্বের চেয়ে অনেক নিচে।[৭২]

বিশ্বব্যাপী ইসলামের ব্যাপক আবেদন থাকা সত্ত্বেও হিংসা ও স্বভাবজাত শত্রুতাবশত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ করে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের নামে নানা কুৎসা রটনা করছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইসলাম ও এর অনুসারীরা ইসলাম বিরোধীর নিকট থেকে যেসব ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বর্তমান সন্ত্রাসকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টাও সেসবের অন্যতম। একদিকে ইহুদী-খ্রিস্টান-পৌত্তলিকদের ষড়যন্ত্র অপরদিকে জন্মগতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি, এ দুয়ে মিলে ইসলাম আজ পৃথিবীতে 'ভুলবোঝা' ধর্ম (The misunderstood Religion) এ পরিণত হয়েছে, যেমনটি বলেছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ কুতুব (র.)।[৭৩] তবে আশার কথা, মুসলিমরা এখন ধীরে ধীরে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করার চেষ্টা শুরু করছে। সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন রকম সম্পর্ক নেই সে কথা উপরোক্ত আলোচনায় কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে। ইসলামের অবস্থান কুরআন, হাদীস ও রসূল (স.) এর জীবনাদর্শে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও রসূলুল্লাহ্ (স.) এর জীবনাদর্শ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, বরং চরম বিরোধি। শান্তিকে বিঘ্নিত করে এমন কোন কর্মকান্ডকে ইসলাম সমর্থন করে না, উপরন্তু বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের চিরন্তন নীতি। ইসলাম স্বভাবগত কারণেই কখনো সন্ত্রাসে বা বিশ্বশান্তি নষ্ট করে এমন কর্মে উৎসাহ, সমর্থন, অনুমোদন দেয় না। মুসলিম কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। তাছাড়া গুটিকতক তথাকথিত মুসলিমের কর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করা কখনোই সমীচীন নয়।

---

৭২. মোহাম্মাদ আলী মনসুর, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২০

৭৩. Muhammad Qutb, Islam-The Misunderstood Religion, Kuwait International Islamic Federation of Student Organizations. 1401 A. H/ 1981 A.D.

চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলাম

মানব দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, মানব জীবনের জন্যও তেমন ধন-সম্পদের প্রয়োজন। ইসলাম এ ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা এবং হারাম পথে অর্জিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। আর এ জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে ।

নিতান্ত প্রয়োজন মেটানোর কোন ব্যবস্থাই না থাকলে মানুষ একান্ত ঠেকায় পড়ে হয়ত চুরি করতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এমন সুন্দর ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে কেউ না খেয়ে বা অভাব অনটনে কষ্ট পেতে পারে না। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে কারো চুরি করার পয়োজন পড়ে না। এ রূপ সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল সে লোকই চুরি করতে পারে, যে অন্যায়ভাবে অধিক সম্পদ অর্জন করার অভিলাষী কিংবা যে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা বেহিসাব অর্থ ব্যয় করতে অভিপ্রায়ী।তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পক্ষে এ ধরনের চুরি খুবই মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলাম চুরিকে নিষিদ্ধ করেছে, চুরির যাবতীয় পথ ও উপলক্ষকে সর্বাত্মকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

চুরির সংজ্ঞাঃ চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে বোঝানো হয়।[১] আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভূক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে ‘চুরি’ বলে।[২]

চুরির মৌলিক উপাদানঃ

চুরির চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলো হলঃ এক. চোর, দুই. মালের মালিক অর্থাৎ যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে । তিন. চুরিকৃত সম্পদ ও চার. গোপনে সম্পদ হস্তগত করা । এ উপাদানসমূহের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে, যেগুলো পাওয়া গেলেই হদ্দের বিধান প্রযোজ্য হবে ।

চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীঃ চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে হলে চোরের মধ্যে আটটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ শর্তগুলো হলঃ মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়ষ্ক ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন) হওয়া ।

চোরকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়ষ্ক হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক বালক-বালিকা চুরি করলে তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে চোরকে সুস্থ বিবেকসম্পন্নও হতে হবে। কোন পাগল চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, যদি সে পুরো পাগল হয় । যদি সে মাঝে মাঝে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তা হলে এরূপ অবস্থায় চুরি করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৩]

অনুরূপভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং মতিভ্রম ব্যক্তিদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না, যদি তারা ঐ অবস্থায় চুরি করে।[৪]

---

১. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৩৩

২. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫. পৃ. ৩৩৫; আল-মাওসূ’আতুল ফিকহিয়া, খ. ২৪. পৃ. ২৯৩

৩. মালিক, ইমাম, আল-মুদাওয়ানাহ, দারুল কুতুব আল-‘ইলমিয়্যাহ, খ. ৪. পৃ. ৫৩৪

৪. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, কিতাবুল হুদুদ; হাদীস নম্বরঃ ৮১৭০, ৮১৭১।

তবে কোন মাতাল ব্যক্তি স্বচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে কোন মাদক দ্রব্যগ্রহণ করে মাতার অবস্থায় চুরি করলে এর জন্য সে হদ্দযোগ্য হবে। কারণ সে নিজেই তার মতি বা বোধশক্তি নষ্ট করেছে এবং তা এমন জিনিস দ্বারা করেছেযো গ্রহণ করা স্বয়ং একটি দন্ডযোগ্য অপরাধ। এরূপ অবস্থায় শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হলে দুষ্কৃতিকারীরা মদ্যপান করে অপরাধ করতে দুঃসাহসী হবে।[৫]

(মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া।)

চুরির শাস্তি কার্যকর করার জন্য চোরকে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে যদি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম নাগরিকের কোন মাল চুরি করে, তা হলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে কি না তা নি‌ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । মালেকী ও হাম্বলী ইমামগণ এবং হানাফী মাযহাবের আবু ইউসুফ (রহ.) মতে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। কেননা, নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান স্বীকার করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর মতে, তার উপরে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা, সে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত নয়। তাদের মতে, সে চুরির সম্পদের জন্য দায়ী থাকবে।[৬]

চুরির উদ্দেশ্য মাল হস্তগত করা:

কোন মাল হস্তগত করা চুরি কিনা তা হস্তহতকারীর নিয়তের ওপর নির্ভর করে। যেখানে অন্যায়ভাবে গ্রহণের নিয়ত থাকে না, সেখানে চুরি বলে গণ্য করা হবে না। তাহলে তাকে শাস্তিও দেয়া যাবে না যদি তার কথার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭]

অপরের মাল জেনে শুনে হস্তগত করা:

অপরের মাল জেনে শুনে মালিকের কোন রকমের অবগতি বা সম্মতি ছাড়া হস্তগত করলেই তা চুরি বলে গণ্য হবে। তাই যদি কেহ কোন মালকে মুবাহ্ (বৈধ) বা পরিত্যক্ত মনে করে হস্তগত করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

স্বেচ্ছায় ও প্রলোভন বশতঃ চুরি করা:

কোন চোর যদি অনন্যোপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয় যেমন দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করলে, তার উপরে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

চোর ও মালিক পরস্পর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় না হওয়া:

চোর ও মালিক যদি পরস্পর রক্ত সম্পর্কিত উর্ধ্ব বা অধঃস্তন আত্মীয় যেমন-পিতা সন্তানের এবং সন্তান পিতার বা মা সন্তানের এবং সন্তান তার মার সম্পত্তি চুরি করলে হদ্দ কার্যকর হবে না। অপরাপর আত্মীয়-স্বজন–ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফী, মামা-মামী, খালা-খালু বা তাদের ছেলে-মেয়ে, দুধ মা ও ভাই-বোন, সৎ পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও স্ত্রীর অপর ঘরের সন্তান ইত্যাদি এক অপরের মাল চুরি করলে অধিকাংশ ইমামের মতে হাত কাটা হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অনুসারী ইমামগণের মতে, রক্তসম্পর্কিত মুহরাম আত্মীয়-স্বজনরা একে অপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মাল চুরি করলেও হদ্দ কার্যকর হবে না।[৮]

---

৫. আওদাহ, আত তাশরী'উল জিননা'ঈ, খ. ১. ৫৮৩

৬. আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৭৮; আল-মাওসূ' আতুল ফিকহিয়া, খ. ২৪. পৃ. ২৯৬

৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া, খ. ২৪. পৃ. ২৯৮

৮. আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৪০; ইবনু নুজায়ম, আল বাহরুর রা'ইক, খ. পৃ. ৫৮

হস্তগত মালের মধ্যে চোরের কোনরূপ মালিকানা বা অধিকার না থাকা:

চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয় এবং তার নিজের অংশ বাদ দেয়ার পর চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তা হলেও অপরাধীর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না বরং তাযীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[৯] ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার মাল থেকে চুরি করে এবং চুরিকৃত মাল থেকে প্রাপ্য অংশ পরিমাণ বাদ দেয়ার পর নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে, তা হলেও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১০]

চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা:

অধিকাংশ ইমামের নিকট চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা হবে, চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তা জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক–তাতে পার্থক্য হবে না।[১১] পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর অনুসারী ইমামগণের মতে, চুরিকর্মের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে চোরের জ্ঞান থাকতে হবে।

মালের মালিকের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী:

চুরির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মালের মালিক বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল কারো মালিকানাধীন না হয়, তাহলে এরূপ মাল হস্তগত করার কারণে হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণের জন্য ইমামগণ মালের মালিকের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন।

এক. যদি চুরি প্রমাণিত হয় কিন্তু মালিক কে তা জানা যাচ্ছে না বা তার কোন সন্ধান মিলছে না সে অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[১২]

দুই. যার মাল চুরি গিয়েছে, তাকে চুরি-যাওয়া মালের যথাযথ মালিক বা বৈধ অধিকারী হতে হবে। যদি কেউ কোন অপহরণকারীর অপহৃত বস্তু বা কোন চোরের চোরাই মাল ফের চুরি করে তাহলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[১৩]

তিন. মালের মালিক মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হলে তবেই চোরের হাত কাটা হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক তার মাল চুরি করলে তাতে হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

---

৯. ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫. পৃ. ৩৩৭; যাকারিয়া আল-আনসারী, আসনাল মাতালিব, খ. ৪. পৃ. ১৪০- ১৪২; রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭. পৃ. ৪৪৫

১০. আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৭৮; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫. পৃ. ৩৭৭

১১. নববী আল-মাজমু' খ. ৭. পৃ. ৩৬২; আল-মাসূ'আতুর ফিকহিয়্যা, খ. ২৪, পৃ. ২৯৭

১২. মালিক, ইমাম, আল-মুদাওয়ানাহ, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, খ. ৪. পৃ. ৫৩১; আল-কাসানী, বদা'ই খ. ৭. পৃ. ২৯৭

১৩. আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, ৮০; ইবনুল মুফালিহ, আল-ফুরূ' খ. ৬. ১৩৪।

চুরিকৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী:

চুরির তৃতীয় মৌলিক উপাদান হলো চুরিকৃত মাল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে। শর্তগুলো হচ্ছে:

১. চুরি-করা বস্তুটি মাল হওয়া: হানাফী ও শাফেয়ী ইমামগণের মতে, চুরিকৃত জিনিস যদি মাল না হয় যেমন, মানব-শিশু, তাহলে চুরির হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে তার সাথে যদি নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক মূল্যের দামী কাপড়-চোপড় বা অলংকার থাকে, তাহলে অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে হাত কাটা হবে না।

তাদের বক্তব্য হলো, এক্ষেত্রে কাপড়-চোপড় বা অলংকার শিশুর অনুবর্তী হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু ইমাম মালিকের মতে কোন শিশু চুরি করা হলে তার হাত কাটতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) শিশু চুরির ব্যাপারে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪]

অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে, কুরআন শরীফ বা অন্য কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক চুরি করলে চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা, সে ব্যাখ্যা করতে পারে যে, সে পড়ার জন্য নিয়েছে। কিন্তু মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণ এবং ইমাম আবূ ইউসূফ র. এর মতে, এগুলো চুরি করলে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি ঐগুলোর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়। কেননা, লোকেরা কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় বই-পুস্তক উৎকৃষ্ট মাল হিসেবে গণ্য করে।[১৫]

২. চুরিকৃত বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকা: বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকার অর্থ হলো তা এমন হওয়া যা কেউ নষ্ট করলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অতএব, শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব বস্তুর কোন মূল্য নেই যেমন: শূকর, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণি, বাদ্য যন্ত্র, অশ্লীল বই পুস্তক, ক্রস চিহ্ন ও মূর্তি এগুলো কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, এগুলো ভেঙ্গে ফেলার পর যদি মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে হাত কাটা হবে।[১৬]

৩. চুরিকৃত মাল তুচ্ছ বস্তু না হওয়া: তুচ্ছ বস্তু বলতে এমন মালকে বোঝায় যা সচরাচর লোকেরা গুরুত্বের সাথে হিফাযত করে না। যেমন মাটি, ঘাস, ভূসি, বাঁশ ও লাকড়ি ইত্যাদি। এ ধরনের কোন মাল চুরি হলে তাতে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৪. চুরিকৃত বস্তু সংরক্ষণযোগ্য হওয়া: চুরিকৃত মাল যদি অসংরক্ষণযোগ্য দ্রুত পচনশীল হয়, তা হলেও হদ্দ কার্যকর হবে না বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে। তবে মালিকীগণ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে, দ্রুত পচনশীল দ্রব্যও যদি নিসাব পরিমাণে চুরি করা হয়, তাতেও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে গাছে ঝুলন্ত ফল চুরির জন্যও হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে।[১৭]

---

১৪. মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮; বাজী, আল-মুন্তকা, খ. ৭. পৃ. ১৮০

১৫. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ. ৮; পৃ. ৩৭০; যাকারিয়া আল-আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৬. শাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৬. পৃ. ১৫৯; ইবনুল মুফলিহ, আল-ফুরূখ, খ. ৬. পৃ. ১২৬

১৭. আল-হাদ্দাদী, আল-জাওহারাহ, খ. ২. পৃ. ১৬৬; হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯; পৃ. ১৩১

৫. চুরির বস্তু সাধারণভাবে সকলের জন্য বৈধ না হওয়াঃ

চুরিকৃত মাল যদি এমন কোন বস্তু হয় যা ব্যবহার করা সকলের জন্য সাধারণভাবে বৈধ, যেমন-পানি, বাতাস, আগুন বা ঘাস প্রভৃতি তাহলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে না। তবে মালিকী, শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে এ ধরণের মাল যদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং মূল্যবান হয় তাহলে চুরির জন্য হাত কাটা হবে যদি তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়।[১৮]

৬. চুরিকৃত মাল অপরের দখলভূক্ত হওয়াঃ

চুরিকৃত মাল অপরের মালিকানায় কিবা আমানতে থাকতে হবে। দখলবিহীন বা মালিকানাবিহীন কোন মাল কেউ তার হস্তগত করলে সেটা চুরি বলে গণ্য হবে না। কারণ, এতে কারোর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই।[১৯]

১. নিরাপদ সংরক্ষণ-স্থান হতে মাল চুরি করাঃ

মাল সযত্নে পাহারাতে বা কারোর তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। অযত্নে বা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মাল কেউ হস্তগত করলে তাকে চুরির শাস্তি প্রদান করা যাবে না।[২০]

২. চোরাই মাল সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলে থাকাঃ

চোর কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল সরিয়ে নিলেই হবে না, পুরোপুরি তার দখলভুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা চুরি বলে গণ্য হবে না।[২১]

৩. নিসাব পরিমাণ মূল্যের হওয়াঃ

চুরিকৃত মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে। অন্যথায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি কার্যকর করা হবে।

চুরির নিসাবঃ

কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চুরির হদ্দ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে-তা নিয়ে ইমাগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[২২] মালিকীগণের মতে, চুরির নিসাব তিন দিরহাম। তাদের দলীল হলো, রাসূল (স.) এবং হযরত উসমান রা. দু'জনেই তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরিতে হাত

---

১৮. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৫৩, ১৮১; আল-কাসানী, বদা'ই, খন্ড ৭, পৃ. ৭০ সাভী, লুগাতুল সালিক, খ-৪, পৃ-৪৭২।

১৯. হায়তমী, তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯, পৃ. ১২৮; রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭. পৃ. ৪৪৩

২০. মালিক, ইমাম, আল-মু'আত্তা, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৫১৭; বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৭০০১।

২১. ইবনুল কুদামা, আল-মুগনী, খন্ড. খ. পৃ. ৯৮

২২. ইবনুল হাযম, আল-মুহাল্লা, খন্ড. ১২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯; আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৯

কেটেছেন।[২৩] শাফি'ঈগণের মতে, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব হিসেবে গণ্য হবে।[২৪] পক্ষান্তরে, হানাফীগণের মতে, ন্যূনতম দশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করলে হদ্দ কার্যকর করা হবে। বর্তমানে দশ দিরহামের সমপরিমাণ প্রায় ২৯.৭৫ গ্রাম রৌপ্য বা তার সমমূল্যের কোন মাল চুরির নিসাব বলে গণ্য হবে।[২৫] এর কম মূল্যের কোন বস্তু চুরি করলে তা হদ্দের আওতায় পড়বে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

১. মাল স্থানান্তরযোগ্য হওয়াঃ

চুরিকৃত মাল স্থানান্তর যোগ্য হতে হবে। এটা চুরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ, চুরির অর্থ হলো অন্যের সম্পদ সরিয়ে নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া। এটা কেবল স্থানান্তরযোগ্য মালের বেলায় সম্ভব। যে সমস্ত মাল এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নেয়া যায় না, তা চুরি করা সম্ভব নয়।[২৬]

২. গোপনে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করাঃ

চুরির চতুর্থ উপাদান হল গোপনে মাল হস্তগত করা অর্থাৎ মালিকের সম্মতি বা অবগতি ছাড়া কিংবা তার অনুপস্থিতিতে বা নিদ্রিতাবস্থায় তার মালিকানাধীন কোন মাল হস্তগত করা। এ ক্ষেত্রে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হতে হবে।[২৭]

সম্পূর্ণরূপে হস্তগতকরণ বোঝাতে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে। শর্ত তিনটি হচ্ছেঃ

ক. চোর চুরিকৃত বস্তু নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনবে। খ. চুরিকৃত মাল মালিকের দখলভুক্ত হতে হবে। গ. তা সম্পূর্ণরূপে চোরের নিজের দখলে আসতে হবে। এ তিনটি শর্তের কোন একটি শর্ত পূরণ না হলে হস্তগতকরণ পূর্ণ হবে না এবং সেক্ষেত্রে হদ্দ ও প্রযোজ্য হবে না বরং চুরি শুরু হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তা'যীরের শাস্তি প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে চুরির কাজে সহায়তাকারীকেও তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।[২৮]

চুরির শাস্তিঃ

চুরির শাস্তির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "পুরুষ চোর ও মহিলা চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহ্ (র) পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[২৯]

---

২৩. মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ, খন্ড ৪. পৃ. ৫২৬; বুখারী, ইমাম, আল–জামি, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩।

২৪. শাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৬. পৃ. ১৪০

২৫. ইবনূর হুমাম, প্রাগুক্ত, খ.৫. পৃ. ৪০৭

২৬. সম্পাদিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (সংকলন), ইফাবা, ঢাকা; ২০০৪; খ. ১, পৃ. ৩২১; Siddiqi, Mohammad Iqbal, Penal law of Islam, New Delhi, 1988, P. 38.

২৭. আস-সারাখনী, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১৩৯, ১৪৭, ১৪৮; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭. পৃ. ৬৫, ৬৬

২৮. ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫. পৃ. ৩৮৯, ৩৯০; ইবনুল মুদামা, আল-মুগানী, খ. ৯. পৃ. ১২২

২৯. আল-কুর'আন, ৫ঃ৩৮।

আয়াত থেকে জানা যায়, চুরির শাস্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ণীত। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ সম্পূর্ণ একমত।[৩০] তবে হাত কতটুকু কাটতে হবে, কিভাবে কাটতে হবে এবং কোন্ হাত কাটতে হবে-এ সকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কবজি থেকে কাটতে হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার চুরির শাস্তি:

দ্বিতীয় বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে।[৩১] এতে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই। তবে তৃতীয় বার চুরি করলে কী শাস্তি দেয়া হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও কতিপয় হাম্বলী ইমামের মতে তৃতীয় বার চুরি করলে তার শাস্তি হল কারাগারে আটক রাখা। তাদের বক্তব্য হলো, তৃতীয়বারও যদি তার হাত বা পা কেটে ফেলা হয় তাহলে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই বাকি থাকবে না। এটা একরকমের ধ্বংস করাই। হদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধ্বংস করা নয়-অপরাধের ব্যাপারে ভীতি সৃষ্টি করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, তৃতীয় বার চুরি করলে বাম হাত এবং চতুর্থ বার চুরি করলে ডান পা কেটে ফেলতে হবে। তারপরও যদি চুরি করে তবে তাকে তা'যীরের আওতায় কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে।[৩২]

হাত-পা কাটার নিয়ম: চোরের ডান হাতের কব্জি থেকে কাটতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের হাত কেটে দাও।" এখানে কোন্ হাত কাটতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতে, তাদের ডান হাত কেটে দাও। প্রসিদ্ধ কিরআত দ্বারা জানা যায় যে, চোরের ডান হাতই কাটতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেও ডান হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল ও বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, চোরের ডান হাতই কাটতে হবে।

পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকগণও কব্জি থেকে কেটেছেন। দ্বিতীয়বার চুরির ক্ষেত্রে বাম পা গোড়ালি থেকে কাটতে হবে। তবে কারো কারো মতে, পায়ের গোড়ালি বরাবর ঠিক রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলতে হবে। যাতে সে পায়ের ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে।[৩৩] হাত-পা কাটার পর সাথে সাথে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে, যাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। প্রচন্ড শীত বা তীব্র গরমের কালে কাটা ঠিক নয়। যতটা সম্ভব অতি দ্রুত এবং সহজভাবে কাটার কাজ সেরে ফেলতে হবে। চোরের হাত কাটার পর হাতকে তার গলায় লটকিয়ে রাস্তায় বা বাজারে প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘুরাতে হবে কিনা-তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, এটা সুন্নাত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফী ইমামগণের মতে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) সকল চুরির ঘটনায় এমনটা করেছেন-তা প্রমাণিত নয়। ব্যাপারটি বিচারক কিংবা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত থাকবে।[৩৪]

---

৩০. ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১০৫, ১০৬

৩১. ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১০৫, ১০৬; দারু কুতনী, আস-সুনান, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ২৯২।

৩২. শাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৮. পৃ. ৩৭১

৩৩. ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১০৬; আল-হাদ্দাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩. পৃ. ১৭০

৩৪. সাবিক, সাইয়িদ, ফিতহুস সুন্নাহ, খন্ড, ২. পৃ. ৪২৬; ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১০৭

চুরির তা'যীরী শাস্তি:

চুরি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শর্তে ত্রুটি দেখার দেয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি চোরের ওপর হদ্দ কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ি তা'যীরী শাস্তি ভোগ করবে।

চুরিকৃত মাল কিংবা মূল্য ফেরত দান:

চুরিকৃত মাল যদি মজুদ থাকে, তাহলে চোর অবস্থাসম্পন্ন হোক বা দারিদ্র্যক্লিষ্ট হোক, চোরের হাত কাটা হোক বা নাই হোক, চুরির মাল চোরের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে থাকুক- সর্বাবস্থায়ই মাল মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত।[৩৫] যদি চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে যায় কিবা খরচ হয়ে যায়, তাহলে চুরিকৃত মালের মূল্য বা তার সমতুল্য মাল মালিককে ফেরত দিতে হবে। তবে চুরির শাস্তি হিসেবে যদি চোরের হাত কাটা হয়, তবে চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা খরচ হয়ে গেলে তার মূল্য কিবা তার সমতুল্য মাল পরিশোধ করতে হবে না। আল-কুর'আনের আয়াতে শুধু হাত কাটার শাস্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে যে অপরাধ করেছে তার সবটুকু শাস্তিই হচ্ছে হাত কাটা। অতএব, এর সাথে আর কোন শাস্তি যোগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "চোরের হাত কাটা হলে তাকে কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।"[৩৬]

চুরির প্রমাণ:

যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ ও চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে, শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণিত করা যেতে পারে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ:

চুরি প্রমাণের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দু'জনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তের ওপর চুরির হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৩৭]

মিথ্যা বা ভুল সাক্ষ্য দান:

যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদান করতে ভুল করে এবং এর ফলে হাত কাটা হয় এবং পরে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়া প্রকাশ পায় কিবা তারা বলে যে, তারা জেনে শুনেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহলে কর্তিত হাতের জন্য সাক্ষীদ্বয়কে দিয়াত আদায় করতে হবে এবং এক্ষেত্রে হাতের বদলে হাত কাটা যাবে না।[৩৮]

---

৩৫. ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৫. পৃ. ১৭১; খ. ৯. পৃ. ১১৩-১১৪; গানিম, মাজমা'উদ দিয়ানাত, পৃ. ২০৩

৩৬. ইবন 'আবদিল বারর, আত-তামহীদ, খ. ১৪, পৃ. ৩৮৩; আহকামুল কুর'আন, খ. ৪. পৃ. ৮৪

৩৭. ইবন 'আবদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪. পৃ. ৮৬, ৮৭; আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ-৭, পৃ. ৮১

৩৮. আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিকহ, 'আলালা-মাযাহিবিল 'আরবা'আ, খ. ৫. পৃ. ১৬৫

মৌখিক স্বীকারোক্তি:

চোরের অভিযোগে অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে চুরির সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে চুরি প্রমাণিত হবে এবং তাকে চুরির হদ্দ ভোগ করতে হবে।[৩৯] এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। তবে কতবার স্বীকারোক্তি দিতে হবে-তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। তবে হাম্বলীগণ ও হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে, দু'এজলাসে দু'বার স্বীকৃতি দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে। যদি একবার স্বীকৃতি দেয় তবে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে এবং তাতে চুরিকৃত মাল কিবা তার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।[৪০]

স্বীকারকারী যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে যে, সে একান্ত চাপে পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তাহলে তার কথা আমলে নেয়া হবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।[৪১]

শপথের মাধ্যমে:

যখন চুরিকৃত সম্পদের মালিকের দাবির পক্ষে কোন সাক্ষী থাকে না, আর চোর ও স্বীকার করে না, তখন চোরকে স্বীকার করতে বলা হবে। যদি সে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবির পক্ষে শপথ করে বলে, তবে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে এবং চোরের হাত কাটা যাবে। তবে হানাফী,মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের নিকট এ অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।[৪২]

লক্ষণ-প্রমাণ:

কারো কারো মতে, বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও চুরি প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে চোরের হাতও কাটা হবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিবা স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই হদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণ করা যাবে না।[৪৩]

শাস্তি রহিত হবার কারণসমূহ:

বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে চুরির হদ্দ রহিত হয়ে যায়। তার মধ্যে কিছু বিষয় চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: তাওবাহ। আর কিছু বিষয় চুরি-যাওয়া মালের মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: ক্ষমা ও সুপারিশ। আর কিছু বিষয় চুরিকৃত মালের সাথে জড়িত। যেমন: চুরিকৃত বস্তুতে চোরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আবার কখনো আদালতে নালিশ পেশ করতে দেরি হয়ে গেলেও শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

---

৩৯. আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ-৭, পৃ. ৮১; ইবন 'আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ৮৬, ৮৭; ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১১৮

৪০. আল-বাহুতী, কাশফুল কিনা' খ. ৬. পৃ. ১৪৪, ১৪৫; ইবনু মুফলিহ, আল-ফুরূ', খ. ৬. পৃ. ১২২; ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১১৮

৪১. আস-সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃষ্ঠা-১৪১; আল-বাজী, আল-মুন্তাকা, খ. ৭. পৃ. ১৬৮

৪২. যায়'ঈ, তাবয়ীন, খ. ৪. পৃ. ২৯৭; যাকারিয়া আল-আনসারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ১৫০

৪৩. ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১১৮

সুপারিশঃ

মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন এবং তাওবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আদালতে চুরির দাবি উত্থাপিত হওয়ার আগে চোরের জন্য সুপারিশ করা জায়েজ যদি সে কুখ্যাত ও পেশাদার চোর না হয়। তবে আদালতে নালিশ দায়েরের পর তার জন্য সুপারিশ করা হারাম। কেননা, যখন হযরত উসামা (রা.) মাখযূম গোত্রের জনৈকা মহিলা চোরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি রাগান্বিত স্বরে বলেছিলেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র একটি হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?"

ক্ষমাঃ

আদালতে চুরির অভিযোগ দায়েরের আগে চোরকে ক্ষমা করে দিতে অসুবিধা নেই। চোর যদি কুখ্যাত ও পেশাদার না হয় তাহলে সে রকম ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। আদালতে নালিশ করার পরে তাকে ক্ষমা করে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর একে অপরের হদ্দ ক্ষমা করে দাও। তবে যখনি আমার কাছে নালিশ আসবে, তখন হদ্দের কার্যকারিতা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে।"[৪৫]

তাওবাহ্ঃ

চোর যদি তাওবাহ্ করে চুরিকৃত মাল মালিককে ফেরত দেয় এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছে সমর্পন করে তাহলেও হদ্দ রহিত হবে না। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত।[৪৬] বর্ণিত আছে, হযরত 'আমর ইবনে সামুরাহ্ (রা.) উষ্ট্র চুরির ঘটনায় তাওবাহ্ করে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট আসলে তিনি তার হাত কেটে দেন।

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারঃ

চোরের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হবার পর হাত কাটার আগে যদি নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ, এমতাবস্থায় অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত।

হদ্দের শাস্তির অনুপযোগী লোকদের সাথে মিলে চুরিতে অংশগ্রহণঃ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল-যারা হদ্দের শাস্তিযোগ্য নয়, এমনসব লোকদের সাথে মিলে চুরি করলে কারো জন্য হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এখানে চুরিকর্ম হল একটি আর একটি অপরাধে জড়িত বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এটা হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ যোগ্য লোকদের হদ্দ রহিত হবে না। মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামগণও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৪৭]

---

৪৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৮৮; মুসলিম বিন হুজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৪৩৮৬, ৪৩৮৭।

৪৫. ইবন 'আবদিল বারর, প্রাগুক্ত, খ. ১১. পৃ. ২২৪; ইবনুল কুদামা, প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ. ১২০

৪৬. আস-সাভী, বুলগাতুল সালিক, খ. ৪. পৃ. ৪৮৯; ও ইবন 'আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ১০৪

৪৭. ইবন নুজায়ম, আল-বাহরুর রা'ইক, খ. ৫. পৃ. ৫৫

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা

বিশ্বে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের (Gender violence) মধ্য দিয়ে নারীর মানবাধিকার হরণের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যার প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতনের ঘটনাবলীকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমতুল্য অপরাধ হিসেবে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। “Women rights are human rights” এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য অর্জনের পথে নারী নির্যাতন ও সহিংসতা একটি প্রতিবন্ধকতা। নারী নির্যাতন যেমন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা দলিত করে, তেমনি নারী অধিকার ক্ষুণ্ন করে। আয়, শ্রেণী, সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব সমাজে নারীরা কমবেশি শারীরিক, যৌন, মানসিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

বাংলাদেশে সামাজিক এবং মানবিক সমস্যাগুলোর মধ্যে নারী নির্যাতন (Women’s Oppression) অন্যতম। সমাজের সর্বস্তরে নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, প্রচলিত আইনে নারী নির্যাতমূলক অপরাধ দমন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সরকার ১৯৮৩ সালে এবং ১৯৮৫ সালে বিশেষ নারী নির্যাতন আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হন। নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না তারপরেও।

নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা:

নারী নির্যাতন একটি ব্যাপক অর্থবহ প্রত্যয়। এক কথায় নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা বলপ্রয়োগ বা ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করাই নারী নির্যাতন। আরো স্পষ্ট ভাবে বলা যায়, নারীর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমষ্টি বিভিন্ন অজুহাতে নারীর উপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো অথবা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করাই নারী নির্যাতন। দৈহিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ এবং মানসিক নির্যাতনে আত্মহত্যা হলো নারী নির্যাতনের শেষ পরিণতি। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে জেলাভিত্তিক সহিংসতা ও নির্যাতনের (Gender violence) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion or arbitrary deprivation and a violation of human rights,”[১] এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, লিঙ্গীয় শোষণ, যৌন হয়রানি, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ প্রভৃতি সব ধরনের নির্যাতনই নারী নির্যাতনের পরিধিভূক্ত।

নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ, যার ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের অপরাধ ঘটানোর হুমকি, জোর-জরবদস্তি ও চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটানোও নারী নির্যাতনের সংজ্ঞার পরিধিভুক্ত। ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন নিবর্তক আইনে নারী নির্যাতনের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা (Operational definition) দেয়া হয়েছে।

---

১. মোঃ আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন: নীতি-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী (ঢাকা: কোরআন মহল ও অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০০ ইং), পৃ. ৩১৬

উক্ত আইনে নারী নির্যাতন বলতে যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগে অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধষর্ণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধষর্ণ করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটানো বা জখম করা ইত্যাদি অপরাধকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাপক অর্থে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিক বা নৈতিক যে কোন ধরনের নিপীড়নকে নারী নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারী নির্যাতন বলতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার যে কোন ধরনের তৎপরতাকে বোঝায় যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন, মানসিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটে অথবা ঘটতে পারে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি:

বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন হচ্ছে। হত্যা, ধর্ষণ, যৌতুক বিষয়ক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, বিদেশে পাচারসহ বিচিত্র পন্থায় নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে। সাত বছরের শিশুসহ মধ্যবয়সী পৌঢ়াও রেহাই পাচ্ছে না নির্যাতনকারীদের নিষ্ঠুর হাত থেকে। বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের ঘটনার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য দ্বারা নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

নারী নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, লিঙ্গীয় অঙ্গহানি, কন্যা শিশু হত্যা, মেয়ে শিশুর ভ্রণ হত্যা, নারী হত্যা, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, বিবাহের মাধ্যমে নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সময় গণধর্ষণ, পাচার, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মাত্র সতের বছরে নারী নির্যাতনের মতো দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় এক লাখ দশ হাজারের মতো। এ সংখ্যা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

পত্রিকার পাতায় বা থানার ডায়রীতে উল্লেখ নেই এমন নারী নির্যাতন বা হত্যার ঘটনা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাত লাখের উপর হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় ১৯৮৮ সালের পর নারী নির্যাতন এবং গৃহবধূ হত্যার ঘটনা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ৫২৫ জন গৃহবধূকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যৌতুক প্রদানে ব্যর্থতার কারণে আত্মহত্যা করেছে প্রায় ২৭৫ জন গৃহবধু। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের পরিণতি হিসেবে ৩২০ জন নারী ঘাতক স্বামীর হাতে খুন হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ৭২০ টি অপহরণ এবং ৩৮৪ ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। তবে অপহরণ বা ধর্ষণের সংখ্যা আরো বেশি হবার আশংকা রয়েছে। কারণ লোকলজ্জা ও সামাজিক কারণে এ ধরনের নির্যাতনের কথা ফাঁস বা মামলা দায়ের করা হয়নি।[২]

২. সাপ্তাহিক রোববার, (ঢাকা : ২০ মে, ১৯৯০ ইং)

১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী দশ-এগার বছরে ঝিনাইদহ জেলায় প্রায় ৩,৫২২ জনের মতো আত্মহত্যা করেছে। যার শতকরা ৯০ ভাগ মহিলা। ১৯৮৭ সালেই ৫২২ জন আত্মহত্যা করেছে, যার শতকরা ৭০ ভাগ গৃহবধু। বেশির ভাগ আত্মহত্যার কারণ দাম্পত্য কলহ এবং দারিদ্র্য।

১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ১৪শত মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৫০০টি যৌতুক, দৈহিক নির্যাতন ও খোরপোষ সংক্রান্ত। ১৯৮৯ সালে নারী সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ২,৫০০ টি। যে সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় এক হাজার বেশি।[৩]

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বছরে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোট ২৩৬০টি। অন্যান্য নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫,৮৪৩টি। ১৯৯৪ সালে যেখানে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৯৯টি, ১৯৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৩৬টিতে পৌছে।

বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনা ১৯৯৪ সালে ছিল ১,২০৬টি তা ১৯৯৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৫০৭ টিতে। নির্যাতনের ধরন ছিল গণধর্ষণ, ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নিপীড়ন, এসিড নিক্ষেপ, নারীকে দোষী করে ফতোয়া, পারিবারিক নির্যাতন, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালে মানবাধিকার পরিস্থিতি রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী ১৯৯৭ সালে ৩৯১ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নারী ও কিশোরী পাচারের হার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সারাদেশে মোট ৫,৪৩৪ টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপের ১১৭টি কেস, ধর্ষণ ২,২২৪ টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ২,০২৯ টি, নারী ও শিশু পাচার ২৪৫টি, যৌতুক সংক্রান্ত ৭৪৭টি। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সরাদেশে মোট ৬,২১০টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপের ১২৮টি কেস, ধর্ষণ ৩,২৫২টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ১,৫৩৭টি, পণবন্দী-অপহরণ ৭২টি, নারী ও শিশু পাচার ১৮৯টি, অবৈধ নারী ব্যবসা ১২৯টি এবং যৌতুক সংক্রান্ত ৯০৩টি কেস। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২,৫৮৩টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপের ৫০টি কেস, ধর্ষণ ১,৩২১টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ৬৯৪টি, পণবন্দী-অপহরণ ৩৬টি, নারী ও শিশু পাচার ৪২টি, অবৈধ নারী ব্যবসা ৪২টি এবং যৌতুক সংক্রান্ত ৩৯৮টি কেস।[৪]

১৯৯৫ সালে বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে "Coalition Against Trafficking in Women-CATW" প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে প্রায় দু'লাখ নারী বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাচার হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী পাচারকৃত নারীর সংখ্যা প্রতি মাসে দশ থেকে চার'শ জন ছিল।[৫]

---

৩. আসিফ আদনান, নারী নির্যাতন বাড়ছে, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা : ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯০ ইং।

৪. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা : ১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং।

৫. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন: কিছু পরিসংখ্যান: আন্তর্জাতিক নারী দিবস: স্মরণিকা-৯৯, (ঢাকা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

ইউনিসেফ (UNICEF) এবং সার্কের (SAARC) হিসেবে অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়।[৬]

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে অহরহ ঘটছে। যেগুলো সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার ভয়ে অথবা নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রকাশিত হচ্ছে না। এসব বাস্তব তথ্যাবলী হতে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিবিত্র ধরন এবং ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধর্ষণের সংজ্ঞা: ধর্ষণ একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম যৌনাচার। এটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। এটা চরম মানবতাবিরোধী ও নীতিগর্হিত কাজ যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে কলুষিত করে। ধর্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ Rape। শাব্দিক অর্থে Sexual intercourse with a woman without her consent.[৭] বাংলা ভাষায় বলাৎকার, সতীত্ব নাশ ইত্যাদি ধর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮]

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "সাধারণত কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখাইয়া সম্মতি আদায় করিয়া বা অন্যায়ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া অথবা স্ত্রী যার বয়স ১২ বছরের কম তাহার সম্মতি লইয়া যৌন সহবাস করিলে উহা ধর্ষণ নামে পরিচিত হয়।"[৯]

আমরা লক্ষ্য করছি এখানে শুধু নারী ধর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নারী কর্তৃক কোন পুরুষ ও ক্ষেত্রে-বিশেষ ধর্ষিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ষণের সংজ্ঞায় এ কথাটি ও সুস্পষ্ট হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,[১০]

"কোন পুরুষ বা নারী বল প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে কোন নারী বা পুরুষের সাথে সঙ্গম করে তাহা 'যেনা' হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের যেনাকে বল প্রয়োগ যেনা বা ধর্ষণ (Rape) বলা হয়।[১১]

প্রচলিত আইনে ধর্ষণের শাস্তি:

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নারী ধর্ষণকারী যাবজ্জীবত কারাদন্ডে (যার মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে) দন্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

যদি না ধর্ষিতা নারীটি তার নিজ স্ত্রী হয় এবং সে বার বছরের কম বয়স্ক না হয়। শেযোক্ত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।[১২]

---

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা : ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৯৯ ইং।

৭. Ashu Tosh Dev, Students favourite Dictionary, (English to Bengali and English) edition June 1990, P. 1059.

৮. প্রাগুক্ত।

৯. বাসুদেব গাঙ্গুলী, দন্ডবিধি, (ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী, ৯৪ইং) প্রথম প্রকাশ, পৃ.৫৫৩. ধারা ৩৭৫

১০. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ করণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং) খ. ১, পৃ. ৩৩৬

১১. প্রাগুক্ত।

১২. বাসুদেব গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪ ধারা ৪৭৩।

ইসলামী আইনে ধর্ষণের শাস্তিঃ

ইসলামী আইনে ধর্ষণকারী যেনার শাস্তি ভোগ করবে এবং যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে শাস্তিযোগ্য হবে না যদি এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ প্রমাণ করা যেতে পারে।[১৩] পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় নারীদেরকে যেনায় বাধ্য করতে বারণ করে দিয়েছে এবং কোন নারীকে এরূপ কাজে বাধ্য করা হলে উক্ত নারীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ "তোমাদের দাসীর নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমার পার্থিব জীবনে সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৪]

মহানবী (সা)- এর সময়ে এক মহিলা অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলে এবং জোরপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হয় এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলে। মহানবী (সা) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বললেন তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বিস্তারিত হাদীসটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।[১৫]

একটি ক্রীতদাস একটি ক্রীতদাসীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করলে হযরত উমর (রা) ক্রীতদাসের উপর হদ্দ জারি করেন কিন্তু ক্রীতদাসীকে শাস্তি দেননি। কারণ, তাকে বলাৎকার করা হয়েছিল। সহীহ বুখারী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

বাংলাদেশে ধর্ষণের চিত্রঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে সবচাইতে জঘন্যতম নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে ধর্ষণ। দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালে ২/১ টি ধর্ষণের খবর পাওয়া যাবে না এমন দিনের নজির নেই। কোলের শিশু থেকে শুরু করে ষাটোধর্ক্ষ বৃদ্ধা পর্যন্ত কোন নারীর ইজ্জত ও জীবন আজ আর নিরাপদ নয়। পাঁচ বৎসরের শিশু তানিয়াও এ দেশে ধর্ষিত হয় তাও আবার সি.এম.এম আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থিত দেশের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান বলে কথিত পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। নিজ গৃহ, শিক্ষাঙ্গন, থানা হাজত, আদালত প্রাঙ্গণ কোথাও আজ নারীদের নিরাপত্তা নেই। এ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী জানোয়ারেরা শত নারী ধর্ষণ করে উদ্‌যাপন করে ধর্ষণের সেঞ্চুরী। বিভিন্ন মামলা ও দৈনিকে প্রকাশিত খবরের উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইনকিলাব একটি পরিসংখ্যান তৈরি করে যা ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এতে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে ৫ বৎসরে মোট ৩৬৩৫টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৫জন : ১ জন শিশু।[১৭] ঢাকা মহানগরী থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে ১৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা। এর মধ্যে এক জসিম উদ্দীন মানিক একাই ধর্ষণ করেছে ১০১টি মেয়েকে এবং শেষ ধর্ষণের পর স্লোগান দিয়েছে "এ্যাকশন এ্যাকশন,

---

১৩. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
১৪. আল-কুরআন, সূরা আন্ নূর, ২৪:৩৩।
১৫. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১২৭৩।
১৬. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ্।
১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ বুধবার, ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৯।

ডাইরেক্ট ধর্ষণ"। ধর্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্থানে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করেছে। লাইব্রেরী, নাটকের সাজঘর, মিলনায়তন প্রাঙ্গণ শহীদ মিনার চত্বর, প্রতিটি হলে, সুইমিংপুলেও ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণকারীরা এত ধর্ষণ করেও শুধুমাত্র সরকারী দলের পরিচয়ে নিজেদেরকে এর শাস্তির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদেশে পুলিশের নিরাপত্তা হেফাজতে পুলিশ কর্তৃক গ্রুপ ধর্ষণের শিকার হয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ হারায় সীমা চৌধুরী। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে ভাসমান পতিতা হিসেবে দাঁড় করাতে কোশেশ করে। হতভাগিনী মুসলমান হলেও পুলিশ তড়িঘড়ি করে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে চেষ্টা করে। এ দেশে গৃহবধু চামেলীকে তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে নরপশুরা। স্বামী যাতে কোন প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য তার হাত-পা ঘরের খুটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বিভিন্ন পত্রিকায় প্রাপ্ত ধর্ষণের খবরের ওপর ভিত্তি করে দেখেছে ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে ২৪০টি, ১৯৯৬তে ২৬২টি, ১৯৯৭ সালে ৭৫৩টি, ১৯৯৮ সালে ১৪২৫টি এবং ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বৎসর বয়সের ধর্ষিত হয়েছে প্রায় ১০০০ জন এবং ১৯৯৯ পূর্ব পাঁচ বৎসরে ১৯ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত ধর্ষিত হয়েছে ৪০০ জন।[১৮]

এসব ধর্ষণের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটে শহরে। অথচ শহরে ভদ্রলোকের বাস্ এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত তিন বছরে রাজধানীতে ৪২৫টি, রাজশাহীতে ৩১৭টি, চট্টগ্রামে ২০৬টি, খুলনায় ২২১টি, বরিশালে ১০৭টি, সিলেটে ৭০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

১৯৯৯ সালে ২ জন বি.এস.এফ. সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। একই সালে আমাদের আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে ধর্ষিত হয়েছে ৯ জন। একই বছর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে ২৭৮টি। ১৯৯৮ সালে আইন-শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি। দলবদ্ধভাবে ২৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের হাতে ২১টি। দলবদ্ধভাবে ১০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দলবদ্ধভাবে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তাতে ছাত্র, বেকার যুবকদের সংখ্যা বেশি। অনেক সময় বয়স্ক পুরুষ কর্তৃকও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ওয়ার্ড কমিশনাররাও ধর্ষণ করে।[১৯]

কারা হচ্ছে ধর্ষণের শিকার?

১৯৯৮ সালে ধর্ষিতাদের মধ্যে ১৫০ জন ছিল ছাত্রী, গৃহবধূ ৪৩জন, গার্মেন্টস কর্মী ১৮ জন, স্বামী পরিত্যাক্তা ১৭ জন, বিধবা ১৮ জন, শ্রমিক ৪৭ জন, গৃহ পরিচারিকা ১২ জন, কর্মজীবী ৭ জন, আদিবাসী ৮১৩ জনের পরিচয় জানা যায়নি। একজন শিশুকে সবাই স্নেহ করে, কিন্তু নিষ্পাপ শিশুটিও ধর্ষিত হচ্ছে। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯- এর জুন পর্যন্ত ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ১৪০ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। ১৯৯৯ এর অক্টোবর পর্যন্ত তৎপূর্ব পাঁচ বৎসরে ৭ থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৫৩৮ জন ধর্ষিত হয়েছে, যার হার হচ্ছে ৫১.৪১%।

---

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত।

১৯৯৯ এর জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যাও ধর্ষিত হয়েছে। মৌলভী বাজার, নোয়াখালী, যশোর, কিশোরগঞ্জের, পাকুন্দিয়ায় মোট ৪ জন ইউপি সদস্যা ধর্ষিত হয়েছে।

ধর্ষণ শেষে হত্যা:

অনেক সময় দেখা গেছে বিকৃত রুচিধারী নরপশুরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা কখনও কখনও ধর্ষিতাকে মেরে ফেলেছে। কখনও বা খালে-বিলে ফেলে দিয়েছে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। কখনও বা গলা, হাত-পা, কেটে বনে-বাদাড়ে ফেলে দিচ্ছে হতভাগিনীর লাশ। আবার দলবদ্ধভাবে বা পালাক্রমে ধর্ষণের কারণেও অনেকের মৃত্যু ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনায় প্রায় ৬৭ জন, ১৯৯৮ সালে ১০৫ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৮ জন, ১৯৯৬ সালে ৯ জন, ১৯৯৫ সালে ১০ জন নিহত হয়েছে। এদের কেউ কেউ ধর্ষণের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।[২০]

বর্তমানে বাবা-মায়ের সামনে মেয়ে, স্বামীর সামনে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের সামনে মা ধর্ষিত হচ্ছে। এর চাইতে বর্বরতা আর কী হতে পারে? আর একটি ঘটনা যা আদিম বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। নিজ কন্যাকে কয়েক দফা ধর্ষণ করেছে এক পাষন্ড পিতা। ষাটোর্ধ এই পিতা কুষ্টিয়া শহরতলীর ছেউরিয়াস্থ নিজ বাড়িতে আটকে রেখে রাতের পর রাত। দশম শ্রেণী পড়ুয়া ষোড়শী কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। এক পর্যায়ে কাহিনীর কথা কুষ্টিয়া থানায় এসে বর্ণনা করেছে। পুলিশ অবশ্য ওই ইতরকে গ্রেফতার এবং জের-হাজতে পুরতে সক্ষম হয়েছে।[২১]

উপরের আলোচনায় এ দেশের ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কারণ ধর্ষণের অনেক ঘটনাই থানায় বা পত্রিকায় আসে না। অনেকেই লজ্জা-শরমের কারণে এ ঘটনা চেপে রাখেন। কেউ কেউ সাহসী হয়ে অথবা ঘটনাপ্রবাহের কারণে থানা বা পত্রিকার সাংবাদিকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কাজেই থানা ও পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে কেবলমাত্র গোটা সমাজের একটা খন্ডচিত্র মাত্র ফুটে ওঠে। থানায় গিয়ে ধর্ষণ প্রমাণ করা অনেক কঠিন। সেখানে ধর্ষিতাকে আরও বেশি অপমানিত হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ষণকারীরা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কোন শাস্তি ছাড়াই বেরিয়ে যায়। উপরন্তু ধর্ষণকারীরা সাধারণত প্রভাবশালী হয়ে থাকে। আর সে কারণেই সমাজের অপেক্ষাকৃত অসহায় শ্রেণীর মানুষ ধর্ষণের বিচার চেয়ে জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যান।

তাছাড়া একজন ধর্ষিতা প্রথমেই হোচট খান ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার ধর্ষণ প্রমাণের জন্য। ডাক্তার বিভিন্ন অজুহাতে ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষায় বিলম্ব করেন। ফলে আলামত বিনষ্ট হয়। আবার যদিও বা ধর্ষিতা হতভাগিনীকে পরীক্ষা করা হয় তখন বাঁধে বিপত্তি। তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয় এবং শরীরের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হয়। অনেকে মনে করেন এটাও এক প্রকার ধর্ষণ। তাই আর এ ধরনের নাজেহাল হওয়ার চেয়ে অপমানের গ্লানি কাঁধে নিয়ে সবকিছু চেপে গিয়ে মুখ বুজে বসে থাকেন। ফলে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা : ১৮ ই জানুয়ারি, ২০০১ ইং।

মহানবী (স.) এর আর্দশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্ষণ রোধের উপায়সমূহঃ

বিশ্বামানবতার মুক্তির অনন্য দিশারী মহানবী (স.) এর আদর্শের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের অপরাধ রোধ করা সম্ভব। একমাত্র তাঁর প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নারী সমাজের ইজ্জত-আব্রুর যথাযথ সংরক্ষণ এবং সমাজে নারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক অবস্থায় সুনিশ্চিত হতে পারে। আজ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী মুক্তি, নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদির হাজারো স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত নারী সংগঠন পৃথিবীর বুকে জন্ম লাভ করেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে প্রতিনিয়তই নারীর মুক্তির জন্য বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এর মাধ্যমেই কেবল নারীকে রাস্তায় নামানো এবং পুরুষের কাছে সস্তা পণ্যের ন্যায় সহজলভ্য করে তোলা হচ্ছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে তাদের অধিকার এক রকমে নষ্টই করা হচ্ছে। নারীর মর্যাদার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির হাজারও চেষ্টা করে অধুনা বিশ্বের সভ্যসমাজের মানুষগুলোর বিবেকবোধ জাগ্রত করা সম্ভব হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.) এর গৃহীত পন্থা এবং নারীর ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের জন্য তার প্রদর্শিত নীতিমালা থেকে আজ সবাই দূরে সরে গেছে। মহানবীর আদর্শ তথা কুরআন-হাদীসের আলোকে বাংলাদেশের ধর্ষণ বন্ধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১. চলাফেরায় নারীদের মার্জিত হতে হবেঃ

বাংলাদেশের নারীরা যতই খোলামেলাভাবে চলাফেরা বেশি করছে ততই ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগের দিনে আমাদের নারীরা পর্দাসহকারে সভ্য শালীন হয়ে গৃহে অবস্থান করত। বিনা প্রয়োজনে খুব একটা বাইরে বের হতো না। সে সময় এত ধর্ষণও হতো না। এখন নারীরা যতই পর্দাহীনভাবে রাস্তায় বের হচ্ছে সেজে-গুজে পর পুরুষের চোখের সামনে দিয়ে সদর্পে বিচরণ করছে ততই তারা পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। সুতরাং নারীকে ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে মহানবী (স.) প্রদর্শিত পর্দা প্রথার পূর্ণ অনুশীলন এবং তা পুরোপুরি পালন করে মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে হবে। বেপর্দা চলাফেরা করা যাবে না। অল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতা-যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[২২]

নিতান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদিগকে বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটি তাদের চেনার সহজ উপায়- ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"[২৩]

---

২২. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৩।

২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ ঃ ৫৯।

অন্যত্র অল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে আনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপতি, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের তারা ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।"[২৪]

অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তা স্বাভাবিকভাবে বলতে হবে। এমনভাবে মিষ্টি মিষ্টি, রসালো কথা বলা যাবে না যাতে পর-পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা তো সাধারণ নারী গণের মতো নও, তোমরা যদি আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে চাও, তবে ইনিয়ে-বিনিয়ে নরম করে কথা বলো না। কারণ এর দ্বারা যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে তোমাদের প্রতি খারাপ লালসা পোষণ করতে পারে। আর তোমরা উত্তম ও সহজ-সরল কথা বলবে।"[২৫]

সুতরাং নারীকে কথাবার্তায়, চলাফেরায় অত্যন্ত সংযত ও শালীন হতে হবে। কারণ নারীর প্রকৃতিতে চুম্বকধর্মী অম্লের প্রভাব বিদ্যমান, আর পুরুষের প্রকৃতিতে ক্ষারের প্রভাব প্রবল। নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আগুনের পরশে যেমন মোম না গলে পারেনা তেমনি নারীর সংশ্রবে পুরুষ উদ্বেলিত না হয়ে পারে না। যে অন্ধকার যুগের নারীরা সদা-সর্বদা পুরুষের তুষ্টির জন্য নানা ভাবে নিজেদের উপাস্থাপন করার পরও তারা পুরুষের হাতে বিভিন্নভাবে ধর্ষিত ও নির্যাতিত হতো, ইসলাম এসে যেসব নারীকে পরিমার্জিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করার মাধ্যমে তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে একশভাগ সক্ষম হয়েছে। বর্বর আরব জাতি ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবার মানসিকতাও প্রদর্শন করনি।

মহানবী (সা) প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি নারীকে যেমন পরিশীলিত করেছে, পুরুষকেও নারীমোহ থেকে ফিরিয়ে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছে। সুতরাং নারীর অশালীন পোশাক পরে বাইরে নগ্নভাবে চলাফেরা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সৌদি আরব ও ইরানে এ বিধান চালু আছে বিধায় সেখানে আমাদের দেশের মতো নারী হত্যা বা ধর্ষণের কোন ঘটনা নেই।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগে বিশ্বের উন্নত দেশসসূহের মতো আমাদের দেশেও ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। অফিসে, আড্ডায়, বিভিন্ন ক্লাবে, পার্টিতে, পার্কে, গাড়ি-ঘোড়ায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকলক্ষেত্রে বর্তমানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যভিচার ও ধর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রাণীকুলের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এ প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ

---

২৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪:৩১।

২৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৩২।

মানবজাতিও মুক্ত নয়। বরং যৌবন শক্তি সম্পন্ন প্রতিটি পুরুষ ও নারীই তার যৌন ক্ষুধার তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। এমনকি যৌন উত্তেজনাবশে দুর্বল মুহূর্তে তারা ব্যভিচার ও ধর্ষণের ন্যয় জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাই পবিত্র ইসলাম শুধুমাত্র ব্যভিচার ও যৌন অনাচারকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তৎসঙ্গে এর যাবতীয় উপকরণ এবং উপলক্ষ্যকেও হারাম করে দিয়েছে। যেহেতু নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নারী সৌন্দর্য যত্রতত্র প্রকাশ করা ব্যভিচারিতা ও ধর্ষণের পথকে সুগম করে দেয়, পুরুষেরা নারীর মোহনীয় দৈহিক রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে অবৈধ যৌনাচারে প্রলুব্ধ হয় তাই ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ একজন পুরুষ আর একজন নারী একান্তে মিলিত হলে তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয় ইবলিশ শয়তান, যার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে অপকর্মে লিপ্ত করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের পথে চালিত করা। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, "একজন নারী ও পুরুষ যেন একান্তে কোন ঘরে না বসে, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হয় শয়তান।"[২৬]

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধের লক্ষ্যে নারীদের জন্য পৃথক কর্মস্থল, আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নারীদের জন্য মহিলা ডাক্তার, পৃথক পরিবহণ ব্যবস্থাসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সমাজের অভিভাবক শ্রেণী এবং সরকারের যৌথ প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

৩. সহশিক্ষা বন্ধ করে নারীদের জন্য পৃথকশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে:

প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শিক্ষার সকর স্তরে সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে। এজন্য চাহিদামাফিক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদ্রাসা, মহিলা কলেজ ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একসাথে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়সাধ্য বিধায় পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলদা শিফ্‌ট চালু করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চূড়ান্তরূপ দেয়া সম্ভব না হবে ততদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী পরিবেশ ও পর্দাপ্রথা চালু করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় বাজেটে নারীদের শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে পুরুষের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। মহানবী (সা) নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর সময়েই নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার হাদীস পুরুষরা নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যেদিন আমরা সবাই আপনার খেদমতে হাজির হবো। জবাবে রাসূল (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা), যদি দু'টি হয় ? তখন রাসূল (সা) বললেন দুই দুই।"[২৭]

---

২৬. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-২০৯১

২৭. হাজিফ ইবনু হাজার আসকালানী, ফতুহুল বারী (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ), খ. ১, পৃ. ২০৪

আমেরিকা, রাশিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলা হচ্ছে। খোদ আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্সের দেশে সহশিক্ষার ভয়াবহ কুফলের দিক বিবেচনা করে ১৭০টি মহিলা কলেজ এবং রাশিয়াতে ১২০টি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং সহশিক্ষা বন্ধ এবং নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব।

৪. অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবেঃ

সিনেমা, টেলিভিশনে, পত্র-পত্রিকায়, বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষের, যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠান, অশালীন পোশাক পরিহিত চিত্র বা ছায়াছবি প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যৌন উত্তেজনাকর গান, কবিতা, সাহিত্য, নভেল, নাটক বন্ধ করতে হবে। প্রাইমারী শিক্ষার পর থেকে জাতীয়, সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন অনুষ্ঠানে তরুণী-তরুণী, যুবক-যুবতী এবং মহিলা ও পুরুষদের একত্রে অনুষ্ঠান বন্ধ করে পৃথকভাবে করার সুন্দর এবং নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও, টিভি ও সিনেমায় শিক্ষামূলক, জাতিগঠন মূলক এবং নির্মল আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান করে আমাদের দেশের যুবকদের সঙ্গে একত্রে নাচানাচি, ঢলাঢলির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে। দেশের সকল পতিতালয় বন্ধ করে দিয়ে পতিতাদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে

প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যার্জন অত্যাবশ্যক। মহনবী (সা) ইরশাদ করেন, “প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিদ্যা অর্জন কর ফরয।”[২৮]

এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা হতে হবে। সুশিক্ষা যেমন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয় তেমনি অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদেরকে ধক্ষংসের মুখে ঠেলে দেয়। একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ-পরিবেশ, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই নারীর জন্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে পারে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক জানে যে, ব্যভিচার বা নারী ধর্ষণ তো দূরের কথা গাইরে-মুহরিমাহ্ কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়াই পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিয়েছে। সেইসাথে প্রতিটি নারী-পুরুষের নিজ নিজ লজ্জাস্থানের যথাযথ হেফাজতের ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ পথে পা বাড়ালে তাকে পৃথিবীর আদালতের সোপর্দ করা না গেলেও পরকালে সকল বিচারকের বিচারক আহকামুল হাকিমীনের দরবারে হাজির হয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। আর দুনিয়ার ধরা পড়লে প্রস্তর নিক্ষেপে তার জীবননাশ করা হবে। এসব ভয় একজন মু'মিনকে সবসময় পাপাচার থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে ধর্ষণকারীদের বেশিরভাগই ধর্মীয় শিক্ষায় একেবারেই অজ্ঞ। ফলে তারা এর ভয়বহ পরিণামের আদৌ তোয়াক্কা করে না। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র খোদভীতি বা পরকালের ভয় নেই।

---

২৮. সুনানু ইবনে মাজাহ, আল-মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং-২২০

জন্মগতভাবেই এরা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দুই ধারায় প্রবাহিত। মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। এ দেশের মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয় বিধায় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের হাতে কেউ ধর্ষিত হয়েছে এমন খবর পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা খুবই অপ্রতুল। যা আছে তাও আবার গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা ধর্মের বিষয়ে সবসময় অজ্ঞই থেকে যায় এবং ক্ষেত্রে বিশেষ কেউ কেউ প্রচন্ড ধর্মবিদ্বেষী ও নাস্তিক হয়ে বেড়ে ওঠে।

আনন্দের বিষয় হলো আজ বিলম্বে হলেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করতে শুরু করেছে। গত ১ ডিসেম্বর ২০০১ বিশ্ব এইডস দিবসের আলোচকবৃন্দ প্রায় সমস্বরেই বলেছেন, "এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন।" সুতরাং তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বিশ্বব্যাপী এইডস বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেই একজন যুবক অবৈধ যৌন মিলন থেকে দূরে থাকবে এবং এতে করে এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি থেকে গোটা সমাজ পরিত্রাণ পাবে।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ইসলামী আকীদা ও তাহজীব তামাদ্দুন অনুযায়ী জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে ইসলামের প্রয়োজনীয় আহকাম ও ইবাদতের বিধিবিধান এবং ইসলামের অপরাধ দমন আইন প্রভৃতি বিষয়-সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে বৃটিশরা। যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমাদেরকে গোলাম বানানো। "Edcucation in the harmonious development of body, mind and soul." কিন্তু এর কোনটিরই উন্নয়ন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে একটি জেনারেশন, যারা আমাদের আর্দশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী।

সুতরাং এদেশের যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবেই ধর্ষণ সহ অগণিত সামাজিক অপরাধ বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যে বর্বর আরব জাতি এক সময় নারীকে নিছক ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো, পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ভাগ করে নিত এবং তাদেরকে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করত তারাই একদিন মহানবীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীকে একজন মা, কন্যা ও বোন হিসেবে তাদের যথাযথ মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল।

৬. বিচারব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হবে:

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, "যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবর্তীণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।"[২৯] অন্যত্র তিনি বলেন, "যারা আল্লাহর অবর্তীর্ণ বিধান মুতাবিক ফয়সালা করে না তারাই জালিম।"[৩০] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ যা অবর্তীণ করেছেন তদানুযায়ী যারা ফয়সালা না করে তারাই পাপাচারী।"[৩১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর। আর তোমার নিকট যে সত্য আগমন করেছে তা বিস্মৃত হয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ো না।"[৩২]

---

২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৪৪।

৩০. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ঃ ৪৫।

৩১. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ঃ ৪৭।

৩২. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ঃ ৪৮।

হাদীস শরীফে এসেছে,[৩৩] "হযরত মা'আয (ইবনে জাবাল) (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) মা'আয (রা) ক ইয়েমেনে (বিচারক করে) প্রেরণ করলেন। অতঃপর (প্রেরণের প্রাক্কালে) বললেন, তুমি কিভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করবে? জবাবে মা'আয (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) যা আছে তদনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করব। রাসূল (স.) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে (বিচার্য বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু) না থাকে? তিনি (মা'আয) বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের আলোকে করব। তিনি [রাসূল (স.)] বললেন যদি রাসূলের সুন্নাতেও (সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ) না থাকে? জবাবে (মা'আয) বললেন, আমি আমার চিন্তার আলোকে ইজতিহাদ করব। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন কিছু (জ্ঞান) দান করেছেন যা তিনি ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিধান এবং দু'য়ের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের আলোকেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় মনগড়া আইন দিয়ে বিচার হলে সেক্ষেত্রে বিচারক কাফির, জালিম বা ফাসিক হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই ধর্ষণের বিচার করার ক্ষেত্রেও কুরআন-সুন্নাহ ও তদানুযায়ী ইজতিহাদের আলোকে বিচার কার্য নিষ্পত্তি করতে হবে। বিচার কার্যে কোন প্রকার সময়ক্ষেপন, ছলচাতুরী, প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করে দ্রুততার সাথে ন্যায়বিচার প্রদান করে ধর্ষণকারীকে শাস্তি দিতে হবে। আদালত সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে ধর্ষণকারীকে তাৎক্ষণিক শাস্তিদান করবে। প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইবুনালে এ বিচার সম্পন্ন করতে হবে। কোনমতেই কোন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কোন ধর্ষণকারীর পক্ষাবলম্বন করবেন না এবং এদের জন্য কোন তদবির/সাহায্য সহযোগিতাও করবেন না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "সৎকর্ম ও আল্লাহ্ ভীতিতে তোমরা একে অপরেকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্গনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[৩৪] বিচার কিংবা স্বাক্ষী বা কোন আইনজীবীকে যে কাউকে কোন প্রকার উপহার, উপঢৌকন বা উৎকোচ দান-পূর্বক বিচারের রায়কে ধর্ষণকারীর পক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা যাবে না। অনুরূপভাবে বিচারক কোন পক্ষের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে বিচার কার্যে পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ভাষ্যঃ "তোমার অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং বিচারকগণের নিকট এর (ধন-সম্পদের) সাহায্যে জেনেশুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করার নিমিত্তে প্রলোভন সৃষ্টি করো না।"[৩৫] হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিচার কার্যে উৎকোচ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।"[৩৬]

পুলিশ ধর্ষিতাকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং কোনমতেই ধর্ষণকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় বা সাহায্য-সহযোগিতা দিবেন না।

আদালতের আইনজীবীগণ ধর্ষিতাকে হেনস্তা করা থেকে বিরত থাকবেন এবং ধর্ষণকারীকে বাঁচানোর জন্য আইনের কূট-কৌশলের ব্যবহার করবেন না।

সর্বোপরি ধর্ষণকারীর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ধর্ষণকারীকে আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকবেন। সমাজের সকল মানুষ ধর্ষণ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন এবং ধর্ষণকারীকে ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। ধর্ষণকারীদেরকে ঘৃণা করবেন এবং সামাজিকভাবে এদেরকে বয়কট করবেন। পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন সহ প্রচার মাধ্যমসূহে ধর্ষণকারীর ছবি এবং নাম-ঠিকানা এবং ধর্ষণের শাস্তি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্ষণ নামক এই জঘন্য অপরাধটি আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে আশা করা যায়।

---

৩৩. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং-১২৮৯।

৩৪. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ২।

৩৫. আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ ১৮৮।

৩৬. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আকদিয়াত, হাদীস নং- ৩১০৯।

বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রভাব: এর উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মাদক ও মাদকাসক্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য:

যেসব প্রাকৃতিক, রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদান গ্রহণ করলে স্নায়ুবিক উত্তেজনা, কিছুটা মানসিক প্রশান্তি ও সাময়িক আনন্দ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তাই হলো মাদকদ্রব্য, আর বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নির্ভরতাই হচ্ছে মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন একটি অবস্থা যাতে ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি ব্যবহারকারীর শারীরিক ও মানসিক-নির্ভরতা জন্ম নেয়, এর প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহৃত মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ ও চিন্তার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে।

মাদকাসক্তি শব্দটি যুগল শব্দ। যার একটি হলো মাদক, অপরটি হলো আসক্তি। অর্থাৎ মাদক + আসক্তি = মাদকাসক্তি। মাদক শব্দটি মদ শব্দের বিশেষণ। মাদক অর্থ মত্ততা জন্মায় এমন (মাদকদ্রব্য)। আর মাদকতা (বি) অর্থ মত্ততা বা নেশা উৎপাদন শক্তি।[২] আর ইংরেজি প্রতিশব্দে মাদক (Adj.) অর্থ intoxicating; inebriant; addictive; stupefying. অর্থাৎ মাদক অর্থ durg; intoxicant.[৩] আর আসক্তি হলো বিশেষ্য পদ। যার অর্থ গভীর অনুরাগ, লিপ্সা, পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা। অর্থাৎ মাদকাসক্তি অর্থ হলো নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ বা পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা। অন্যকথায় বলা যায়, যা পাবার জন্য মনপ্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে তাই হলো মাদক নেশা। আর মাদকদ্রব্যের প্রতি যার আসক্তি রয়েছে তাকেই বলে মাদকাসক্তি।[৪]

যে কোন ধরনের নেশা বা আসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আসক্তি হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিশনের (Neurotransmission) স্ব-আবেশিত এমন এক পরিবর্তন যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্ম দেয়।[৫] মাদকাসক্তি সম্পর্কে অনেক মতামত পাওয়া যায়। যেমন-ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) বলেন, "মাদকাসক্তি বা নেশা হলো যার সাথে 'হল' ও 'নিষেধাজ্ঞা' সম্পৃক্ত। উহা জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে, এমনকি মাতাল ব্যক্তি কোন কিছু বোঝে না, কথাবার্তায় জ্ঞান থাকে না, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে এবং ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।[৬]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকাসক্তি হলো, "মাদকদ্রব্যের উপরে আসক্তি বা নির্ভরশীলতা হচ্ছে একটি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যার উপর নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয় তখন সে মাদকদ্রব্য সেবনের অবর্তমানে উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সে যেকোনো অপরাধ সংঘটন করতে পারে। মাদকদ্রব্যের অর্থ সংকুলানের জন্য যা খুশি তা করতে পারে।

---

১. আল-কুরআন, ৫:৯০
২. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৯২৫
৩. Bengali-English Dictionary, Dhaka: Bangla Academy, 2000, P. 659
৪. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন প্রমুখ, 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মে সংখ্যা-২০০৪, পৃ.৩
৫. এ.কে. নাজিবুল হক, মন ও মনোবিজ্ঞান, ঢাকা: ১৯৮৯, পৃ. ২০০
৬. ড. ওয়াহাবাতু আয যুহায়লি, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতু, দামেস্ক: দারুল ফিকরি মুআমির, ২০০৬, পৃ. ৫৪৮৬

এক কথায় মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অবিরাম বা পর্যায়ভিত্তিক নেশাগ্রস্ততা যার ফলস্বরূপ ক্ষেত্র মতে এক বিশেষ মাকদ্রব্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে সেবন করতে হয়। ক্রমাগত মাদকদ্রব্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনের তাড়নায় সাধু বা অসাধু যেকোনো উপায়ে হোক ঔষধ যোগাড় করতে হয়। শারীরিক, মানসিক বা উভয়ভাবে এই মাদক ক্রিয়ার উপরে নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সাথে বৃত্তিমূলক দিকের অবনতি হতে থাকে।”[৭]

মাদকাসক্তির ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, æThe concept of durg addiction is concernd with three terms–tolerance, physical dependence and habituation. Tolerance is a physiological survival mechanism of the body in which an organism adopts to a drug and thus becomes better able to withstand continual exposure to its toxic substance.”[৮]

মাদকাসক্তিকে এইডস, ক্যান্সার বা হার্টের অসুখের চেয়েও ভয়াবহ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, Durg addication of course is manifested as a state in which a person has lost the power of self control with reference to a drug and abuses the drug to such an extent that the person or society is harmed.[৯]

১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী–মাদকাসক্ত বলতে এমন একজন মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীকে বুঝায় যে, অভ্যাসগতভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, মাদকদ্রব্য সেবন কিংবা গ্রহণ যেন তার নিকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধের সমতুল্য। মাদকদ্রব্য গ্রহণ তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের ও অবক্ষয়ের দিকে পদে পদে ঠেলে দেয়।[১০]

সুতরাং মাদকাসক্তি বলতে বুঝায়, কোনো ব্যক্তি প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি মাদক জাতীয় দ্রব্য কোনো ঔষধ কারণ ব্যতীত বার বার সেবন করে এবং উক্ত ঔষধের উপর শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, æDrug addiction means strong attraction for any harmful things. In this sense taking tea, coffee, smoking and drinking alcohol may be called addication. Now a days drug addication means taking opium, heroine, cocaine, marijuana morphine etc.”[১১]

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে, রোগী ড্রাগের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহারে ভালো লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুনঃ পুনঃ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবহারকারীকে ড্রাগের মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ

---

৭. এ.কে. এম মনিরুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯, পৃ. ১

৮. B. Klienmuntj, Essentials of Abnormal Phycology, NewYork: Herper & Row Publishers, 1974, P. 39

৯. Bacher (ed.), The Foundation of Health, NewYork: Meredith Publishing Company, P. 134

১০. আব্দুল মতিন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০, ঢাকা: মাদল প্রকাশনী-১৯৯৫, পৃ. ৪

১১. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, সমাজকল্যাণ অনুক্রম, ঢাকা: ১৯৯৫, পৃ. ৯১

প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আর এরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ড্রাগের দিকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তি একমাত্র ড্রাগ ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের বাকি সব চাহিদা, দায়িত্ব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও পরবর্তীতে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরো ড্রাগ সংগ্রহ ও ব্যবহার। এভাবেই তার পরিণতি হয় মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক জটিলতা, যার পরিণাম মৃত্যু।[১২]

মাদকদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ: নেশা সৃষ্টিকারী বা চিত্তবিভ্রাটকারী দ্রব্যসমূহ মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। পূর্ব প্রচলন ছাড়া বর্তমানে মাদকদ্রব্য হিসেবে নতুন নতুন নামে বা পদার্থে বেশ কিছু দ্রব্য মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। মাদকদ্রব্য দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃতিক এবং (খ) রাসায়নিক।

(ক) প্রাকৃতিক: প্রাকৃতিক উপায়ে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাই প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য। প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য গাছ থেকে আসে যেমন: তাড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক: পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়; তা-ই রাসায়নিক মাদকদ্রব্য। রাসায়নিক মাদকদ্রব্য প্রকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন মাদকদ্রব্য থেকে বেশী নেশা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকর। যেমন: হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেডিন, ফেনসিডিল, সঞ্জীবনী সুরাসহ বিভিন্ন প্রকার এলকোহল ইত্যাদি।[১৩]

অধুনাকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ভরতা সৃষ্টিকারী ঔষধের এক আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাজন করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. আচ্ছন্নভাবে উদ্রেককর মাদক; যেমন:

(ক) আফিম ধরনের; যথা-মরফিন, হেরোইন, পেথেডিন, কোডেইন, মিথাডন ইত্যাদি।

(খ) বার্বিচ্যুরেট ধরনের; যথা-গার্ডিনাল, সোনেরিল, ক্রোরাল, মেপ্রোবামেট, ডায়াজিপাম, মেথাকোয়ালোন প্রভৃতি।

২. উত্তেজক ধরনের মাদক; যেমন :

(ক) ক্যানাবিস জাতীয়; যথা-গাঁজা, চরস, ভাঙ, সিদ্ধি ইত্যাদি।

(খ) অ্যামফিটামিন জাতীয়; যথা- মেথেড্রিন, ডেক্সিড্রিন, ফেনপ্লোরামিন ইত্যাদি।

(গ) কোকেন জাতীয়; যথা: কোকেন বড়ি বা নস্যি।

৩. ভ্রম বা মায়া উৎপাদনকারী মাদক; যথা-এল.এস.ডি মেসক্যালিন।

৪. বিভিন্ন ধরনের ঔষধ; যেমন:

(ক) যন্ত্রণানিবারক ঔষধ; যথা-অ্যাসিপিরিন, পেন্টাজেনিন ইত্যাদি।

(খ) পেট্রোলিয়াম উদ্ভূত দ্রব্য: যথা-আটা শোঁকা, পেট্রোল শোঁকা, জুতো পালিশ শোঁকা ইত্যাদি।[১৪]

---

১২. আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, 'বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা: সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৫৬, ১৯৯৯, পৃ. ২০৬–২০৭

১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই আগস্ট-২০০৮

১৪. সাপ্তাহিক রোববার, সংখ্যা-২১, এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ৩০

বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য: গাঁজা, হাশিশ, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকো, ক্যাফেইন, অ্যামফেটামিন, বার্বিচ্যুরেট, মেথাকোয়ালেন, ট্রাংকুইলাইজার্স, এলএসডি, পেথেডিন, আফিম, কোডিন, থিবাইন, প্যাপারাভিন, নোসকাফাইন, নারকটিন, মেথাডন, ডেকাট্রোমোবামাইড, ডাই-পিপানল, ডাই-হাইড্রোকোডিন, পন্টানাইল, কেন্টাযোকাইন, আলফা প্রোডাইন, হাইড্রোমরফাইন, অ্যালফেন্টানাইল, আলফামিথাইল, ফেন্টানালই, সুপেন্টানাইল, লোফেন্টানাইন, এন্ট্রোফাইন, অক্সিকোডন, ডিমেরাল, ক্যানাবিস, রেসিন, মদ, হুইস্কি, জিন, রাম, ভদকা, তাড়ি, পচাই, সুরাসার, ডিনেচার্ড, স্পিরিট বা মেথিলেটেড স্পিরিট, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, ডায়াজিপাম, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, ফরাজিপাম, ক্লোরোজিপেট, ফেন্সিডিল, নাইট্রাজিপাম, ট্রায়াজেলাম, ট্রেমাজিপাম, ইয়াবা ইত্যাদি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য।[১৫]

কয়েকটি মাদকদ্রব্যের পরিচিত:

গাঁজা: গাঁজা বা ক্যানবিস হচ্ছে এক ধরনের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। এর ল্যাটিন নাম "ক্যানবিস স্যাটাইভা"। এতে রয়েছে টি.এইস.সি বা 'টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল' নামক এক সক্রিয় উপাদান যা ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনার পরিবর্তন ঘটায় এবং মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে।

হেরোইন: আফিম থেকে প্রস্তুত একটি মারাত্মক মাদকদ্রব্যের নাম হেরোইন। সাধারণত সাদা অথবা বাদামী রঙের পাউডার আকারে পাওয়া যায়। 'চেজিং দ্যা ড্রাগন' পদ্ধতিতে ধুমপানের মাধ্যমে হেরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয়া হয়। এর ফলে নেশার সৃষ্টি হয়।

কোডিন: কোডিন আফিম থেকে উদ্ভূত একটি উপজাত দ্রব্য। বেদনা-নাশক অথবা কাশি দমনকী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এলিকসার, সলিউশান আকারে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কোডিন ফেনসিডিলের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেনসিডিল: ফেনসিডিল একটি কাশির ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম থেকে উদ্ভূত কোডিন ফসফেট। এ ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ হলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৈধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে আসে। এটা একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং গন্ধ তীব্র। বাংলাদেশে এর ব্যবহারকারীদের নিকট 'ডাইল' বা ফেনসিডিল নামে পরিচিত।

পেথেডিন: পেথেডিন বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি ওষুধ জাতীয় মাদকদ্রব্য। এটি সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে তৈরী ওষুধ যা সাধারণত ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। একাধিক ব্যক্তি একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে বলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি/সি এবং এইচআইভি/এইডস বিস্তার লভ করে।

আফিম: পপি গাছের ফল থেকে কষ সংগ্রহ করে আফিম প্রস্তুত করা হয়। খয়ের বা পিচের আকৃতিবিশিষ্ট গাঢ় বাদামী রংয়ের পিন্ড বা খন্ড আকারে পাওয়া যায়। গিলে খাওয়ার বা ধুমপানের মাধ্যমে আফিম গ্রহণ করা হয়। আফিমের গন্ধ তেঁতুলের মতো, স্বাদ অত্যাধিক তেতো। বৃটিশ আমল থেকে এদেশের আফিমের প্রচলন ছিল।

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

মরফিন: আফিম থেকে উদ্ভূত বেদনা-নাশক ওষুধরূপে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। ইনজেশনের জন্য, সলিউশনের আকারে এবং ট্যাবলেট বা সাপোজিটরি আকারেও পাওয়া যায়। এটি পেথেডিনের মতোই মারাত্মক আসক্তির সৃষ্টি করে থাকে। এর গন্ধ তেঁতুলের মতো, ইটের গুড়ার মতো লালচে।

ট্রাংকুলাইজার: টেনশন, উদ্বেগ বা অস্থিরতা অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ। এ ধরনের ওষুধ অপব্যবহার হলে মস্তিস্ক ও শরীরের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হলো ডায়াজিপাম, ক্লোবাজাম, ক্লোনানিপাম ইত্যাদি।

ইয়াবা: 'Yaba' ইয়াবা শব্দটি থাই শব্দ (Yar বা bah) থেকে এসেছে। এল অর্থ হলো 'Crazy Madicine' বা উত্তেজক ওষুধ। উত্তেজক মাদক (Amphetanine) এর অ্যানালগ Metham Phetamine সঙ্গে আরো কতিপয় যৌগ-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইয়াবা তৈরি করা হয়। রাসায়নিক চরিত্র, শক্তি, কার্যকারিতা, প্রতিক্রিয়া বিচারে অ্যামফিটামিন, মেথামফিটামিন কিংবা কোকেনের চেয়েও ইয়াবা শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। সাধারণত ৪ থেকে ৫ মি.মি. ব্যাস এবং আড়াই থেকে ৩ মি.মি. পুরু গোলাকৃতির ট্যাবলেট আকারে এটি তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা ছোট আকারের ক্যান্ডির মতো। এর রং লালচে, কমলা, কিংবা সবুজাভ। এটি আঙ্গুর, কমলা, ভ্যানিলা ইত্যাদি স্বাদ ও গন্ধের হয়ে থাকে। এ কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোর ও তরুন-তরুণীদের শক্তিদায়ক ক্যান্ডি বলে বিভ্রান্ত করে সহজে ধরিয়ে দেওয়া যায়। এর গায়ে æWY", æR", æOK", æSY" ইত্যাদি লোগো অঙ্কিত থাকে যা দেখে ব্যবহারকারীরা সহজে একে সনাক্ত করতে পারে। ইয়াবা পাউডার আকারেও তৈরি হয়। ইয়াবা সেবন করলে ২ বা ৩ ঘন্টার মধ্যে স্নায়ু উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। মাদকের প্রভাব কেটে যাবার পর ব্যবহারকী দ্বিগুণ পরিমাণে ভেঙে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে নিস্তেজতা, নিঃস্বতা ও অসারতা।[১৬]

মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী: মাদকাসক্তির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

* যারা মাদকাসক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে মাদক গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা প্রবল মাত্রায় বর্তমান থাকে।
* নিয়মিত নেশা গ্রহণের সাথে সাথে নেশা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।
* মাদক গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আসক্ত ব্যক্তির কাছে তার প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান।
* নেশা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদক গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।
* আসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চিন্তনসহ অন্যান্য কর্মক্ষমতা মারাত্মকভাবেহ্রাস পায়।
* মাদকাসক্তি সমস্যা শুধু ব্যক্তির একার সমস্যা নয়। এটা ব্যক্তি, দল, পরিবার, সমষ্টি ও গোটা সমাজের জন্য সমস্যা।
* মাদকাসক্তি সমস্যার সাথে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম জড়িত থাকে। যেমন-চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, পতিতাবৃত্তি, পুরুষদের পতিতালয়ে গমন ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, বিবাহ বিচ্ছেদসহ পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি।

---

১৬. মোঃ আবু তালেব, ইয়াবাঃ পরিচিতি ও পরিণতি, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৭২

* আসক্ত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

* প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অসঙ্গতির কারণে আসক্তদের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

মাদক ও মাদকাসক্তির আদিকথা: মাদকদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ অতি পুরনো। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল-কখনো নির্জলা আনন্দের উপাদান হিসেবে, কখনো বা ধর্মীয় উৎসবে। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অভ্যাসগুলোর চাইতে পুরনো। তারা মনে করেন, All the naturally occuring sedatives, narcotics, euphoriants, hallucinations and excitants were discovered thousands of years ago, before the dawn of civilization .... by the late stone age man was sastematically poisoning himself .... there were dope addicts long before there were farmers.[১৭]

মাদকাসক্তি মানব সভ্যতার একটি জটিল ও পুরোনো সামাজিক ব্যাধি। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিকাশের সাথে এর গভীর যোগাযোগ রয়েছে। আমরা যাকে 'ড্রাগ' বলি প্রাচীন গ্রীসে একে বলা হতো Pharmacon; যার প্রচলিত অর্থ দাঁড়ায় বিষ ও ঔষধ। উদ্ভিদ থেকে তৈরী ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা করার রীতি তখনো প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে চিকিৎসা জগতে অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যকরী ঔষধ হিসেবে আফিমের ব্যবহারের কথা জানা যায়। চিকিৎসার পাশাপাশি অবসাদমুক্ত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি ও সুখকর বিনোদন হিসেবেও আফিমের ব্যবহার হয়ে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে।[১৮] প্রাচীন শিলালিপির তথ্যানুযায়ী পন্ডিতগণ মনে করেন ৬,০০০ বছর পূর্বে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যুগে আফিয়াম পপিকে আনন্দ উদ্দীপক নেশা হিসেবে ব্যবহার করা হত।[১৯] এভাবে প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৪,০০০ উদ্ভিদজাত বিভিন্ন সাইকো এ্যাকটিভ ড্রাগসের নাম জানা গিয়েছে। এগুলোর মাঝে প্রায় ৪০ প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে যা মানুষকে নানাভাবে আসক্ত করে তুলতে সক্ষম।

চিকিৎসার প্রয়োজনে, সামাজিক বিনোদন, ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে এবং তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুষঙ্গরূপে দীর্ঘদিন ধরে মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে আদিবাসীদের মধ্যে উদ্ভিদ থেকে তৈরি ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হেরোডোটাস, হিপোক্রাটিস, এরিস্টটল থেকে ভার্জিল, প্লিনি, এন্ডারসহ বহু প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকের লেখায় চিকিৎসার জন্য পপি ও আফিম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০] মেসোপটেমিয়া, এশিয়া ও ইউরোপ ঔষধ হিসেবে আফিমের ব্যবহার শুরু হয় খৃস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে। ১৫০০ খৃস্টপূর্ব থেকে মিসরের চিকিৎসকগণ আফিমের ব্যবহার করত এ্যানেসথেটিকরূপে। সেখানকার আদিম অধিবাসীগণ তখন কোক পাতা চিবিয়ে খেত। মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানগণ খৃস্টপূর্ব ১০০ অব্দে ধর্মীয় উৎসব ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য Hallucinogenic Psitocybin mashroom's নামক উদ্ভিদ নির্যাস গ্রহণ করত; যাকে তারা বলত 'ইশ্বরের দেহমাংস'। ফনীমনসা জাতীয় (Pyote) গাছের নির্যাসও তারা ব্যবহার করত। আমেরিকার গির্জাগুলোতে Pyote ক্যাকটাস ব্যবহারের নিয়ম ছিল।[২১]

---

১৭. A Huklety, The doors of perception, Chatto & Coindus, London, 1954, P. 67

১৮. Narcotics Control Bulletin, No-5, Department of Narcoties Control, Dhaka: Ministry of Home affairs, 1992, P.35

১৯. A Tyler, Street Drugs, London: 1957, P. 36

২০. এ.ই. হক, মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষিত, ঢাকা: ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ২৮

২১. শাহীন আকতার, মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব, ঢাকা: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ১১

খৃস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যুগে এশিয়ার মাইনরে আফিম ও পপিকে আনন্দ উদ্দীপক নেশা হিসেবে ব্যবহার করত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাইওয়ানে প্রস্তর যুগের ১০,০০০ বছর পূর্বেও গাঁজার ব্যবহার ছিল। চীনে খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে 'মাহুয়াং' নামক ড্রাগ 'ইনথেলেন্ট' রূপে ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রায় একই সময়ে চীনে সম্রাট সেনমুঙ্গ-এর শাসনামলে নেশাকর ড্রাগ হিসেবে গাঁজার ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে চীন ছাড়াও পারস্য, তুরস্ক, মিসর, ইটালী, জার্মান এবং অন্যান্য দেশে গাঁজার ব্যবহার ছিল।[২২]

খৃস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্যানাবিসের প্রচলন শুরু হয়। সম্ভবত ভারতীয়রাই প্রথমবারের মতো আফিম, ধতুরা এবং ভাঙ ব্যবহারের সূচনা করে। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু সাধক ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ক্যানাবিস ব্যবহার করতেন। এটি সম্ভবত ধ্যানে মগ্ন বা মনকে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করত। ক্যানাবিস এক ধরনের পানীয় হিসেবে বহু মন্দিরে পরিবেশন করা হত। ক্যানাবিস বিভিন্ন উৎসাবাদি যেমন হোলি, শ্রীভারতী এবং বিবাহ উৎসবে ব্যবহার করা হত।[২৩]

সাধু-সন্ন্যাসী, বাউল, যোগী, তান্ত্রিক ইত্যাদি ধরনের লোক গাঁজা, ভাঙ ও সিদ্ধি সাধনায় 'একাগ্রতা সৃষ্টি ও ধ্যানস্থ' হওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন পুরাণ ও উপকথায় নানা প্রসঙ্গে গাঁজার কথা পাওয়া যায়।[২৪] হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুরাণে ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান করে বলা হয়, ইন্দ্র তাঁর সহস্র চক্ষু, রোগ নাশক শক্তি ও দৈত্যনাশক ক্ষমতা দিয়েছেন এই গাঁজাকে। সেই থেকে হিন্দুদের কাছে গাঁজা গাছ 'পবিত্রতার' প্রতীক হয়ে আছে। তাদের কাছে স্বপ্নে গাঁজা গাছ-এর পাতা দেখা সৌভাগ্যস্বরূপ। বেদে গাঁজা ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত পানীয় ভাঙকে দুশ্চিন্তানাশক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৪]

মাদকদ্রব্য সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে, æNor does any one put new wine into old skin, if he does, the new wine will burst the skin, the wine will be wasted and the skin ruined fresh skins for new wine! And no one after drinking old wine wants new, for he says, the old wine is good."[২৬]

অজ্ঞতার যুগে অন্যান্য অপরাধ ও অপকর্মের পাশাপাশি মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুরা পান তখন আভিজাত্য বলে মনে করা হতো। প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে সুরা পান ছিল অপরিহার্য উপাদান। ইসলামের বিকাশ লাভের পূর্বে আরব দেশে সুরা পান ছিল একটি গ্রহণযোগ্য রীতি। কিন্তু নেশাগ্রস্ততা মানুষের জীবনে অনেক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে বলে ইসলাম এর প্রতি পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কার্যের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[২৭]

---

২২. আব্দুল হাকীম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২৪. এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে নেশা, ঢাকা: মা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৮৬

২৫. আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২৬. The New English Bible, 1961, P. 100

২৭. আল-কুরআন, ৫:৯০

যা হোক, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পপি ফুলের শুকনা রস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপরে পপি ফুলের রসের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গ্রীক ও রোমানগণ অবহিত ছিল। ইংরেজ ভেষজবিদ ১৭০০ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, অনেক দিন ধরে মাদকদ্রব্য সেবনে এর উপরে প্রচণ্ড আসক্তির জন্ম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কার হয় মরফিনের। মরফিন হচ্ছে আফিমের বিশুদ্ধ প্রকরণ। ১৮৯৮ সাল হতে হিরোইন ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ধমনীতে এর ইনজেকশন দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হেরোইন এ সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত এবং আলোচিত ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য, সাদা বা বাদামী রঙের পাউডারের মতো। মাদকাসক্তদের কাছে 'ব্রাউন সুগার' নামে বেশি পরিচিত। এ মাদকদ্রব্যটির মূল উৎস হচ্ছে আফিম।

পোপাভার সমনিফেরাম নামক এক ধরনের উদ্ভিদের ফুলের রস থেকে আফিম তৈরি হয়। ১৮০৫ সালে মাটারনাম নামে একজন বিজ্ঞানী আফিম থেকে আরো শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং গ্রীক নিদ্রাবেদী 'মার্ফিউস' এর নামানুসারে এর নাম দেয় 'মরফিন'। পরবর্তীকালে ১৮৯৫ সালে একজন জার্মান ফার্মাসিস্ট মরফিন থেকে অধিক গুণ শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য হেরোইন প্রস্তুত করেন। হেরোইনের নেশা মরফিনের তুলনায় ৩ গুণ এবং আফিমের তুলনায় ৩০ গুণ অধিক।[২৮] গাঁজা তৈরি হয় ক্যানবিস স্যাটাইভা নামের এক ধরনের উদ্ভিদের পাতা, ডাল, ফুল ও বীজ থেকে। গাঁজাতে সাধারণত তামাকের চেয়ে ১২ গুণ টার ও ১০ থেকে ২০ গুণ কার্বন মনোক্সাইড বেশি থাকে, যার ফলে এ মাদকদ্রব্য সেবনে ফুসফুসে ক্ষত বা ক্যান্সারের আশংকা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোকো পাতা হতে তৈরি হয় কোকেন। ১৫৩২ সালে পিজারো এটা আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালে কোকো পাতা থেকে কোকেন পৃথক করা হয় এ্যালকালোয়েড রূপে। ১৮৮৪ সালে সিগমন্ড ফ্রয়েড মনস্তাত্বিক চিকিৎসায় কোকেনের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারের সময় এ্যানাসথেটিক রূপে কোকেনের ব্যবহার শুরু হয়।[২৯]

অ্যামফেটামিন এক জাতীয় কৃত্রিম ড্রাগ। ১৯৪০ সালে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও জাপান সরকার সৈন্যদের মানসিক অবসাদ দূর করে কর্মোদ্দীপক করে তোলার জন্য এ্যামফেটামিন চালু করে। কোকেইন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ড্রাগ। ১৮৬৪ সালে দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফনমেরিং ও ফিশার বারবিচ্যুরেট আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সাল হতে এটা ঔষুধ রূপে ব্যবহার হতে থাকে 'ভারনাল' ট্রেড নামে। ১৯৪০ সনে গবেষণায় ধরা পড়ে যে, এটা এক আসক্তিজনক দ্রব্য। ট্রাংকুলাইজারসের আবির্ভাব ঘটে ১৯৫০ সনে আমেরিকায়। উদ্ভিদের নির্যাস হতে তৈরি এই ঔষুধ ভারতবর্ষে শত শত বর্ষ ধরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৩৮–১৯৪৩ সনের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের স্যানডোজ ল্যাবরেটরীর দু'জন কেমিষ্ট ড. আলবার্ট হকম্যান ও ডিব্লিউ এ স্টোল এল.এস.ডি আবিষ্কার করেন। এটা বন্দীদের নিকট হতে তথ্য বের করতে এবং শত্রুদেরকে অসমর্থ করতে ব্যবহৃত হয়। এটা চিকিৎসার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩০]

---

২৮. মুহাম্মদ সামাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ১৪৯

২৯. এ.কে. এম. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

বাংলাদেশে ধূমপানের সূত্রপাত হয় সম্ভবত চট্টগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজদের আনাগোনার সাথে সাথে। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার চুরুটের ব্যবহার ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেনসহ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৩১] তাই বলা যায়, অতীতকালে বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য বেদনানাশক উপকরণ হিসেবে গাঁজা, মদ প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এর সাথে সংযোজিত হয়েছে হেরোইন, প্যাথিড্রিন, ফেন্সিডিলের মতো মারাত্মক নেশাকর দ্রব্য। আর এই মাদকদ্রব্য ইতিহাসের ক্রমধারায় এখন শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে মাদকের বিস্তার ও ব্যবহারঃ

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব, প্রতিক্রিয়া জানা এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে মাদকাসক্তি সমস্যা বিদ্যমান। ৬০০–১০০০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত চর্যাপদে বাংলাদেশের প্রাচীন শুড়িখানায় গাছের ছাল-বাকল দিয়ে চোলাই মদ তৈরির তথ্য পাওয়া যায়।[৩২] বাংলাদেশে চোলাই মদ, তাড়ি, গাঁজা ইত্যাদির প্রচলন অনেক পুরানো হলেও এগুলোর ব্যবহার মূলত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সীমিত ছিল। ব্যাপকহারে মাদকের বিস্তার এবং প্রযুক্তির ছত্রছায়ায় লালিত আধুনিক নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এদেশে খুব পুরানো নয়। সবচেয়ে ভয়াবহ নেশাজাতীয় দ্রব্য মরফিন বা হেরোইনের মত স্বর্গানন্দ উদ্রেককারী মায়াবিস্তারূপী নেশা দ্রব্যের অনুপ্রবেশ এদেশে ১৯৮৩ সালের দিকে ঘটে বলে অনুমান করা হয়।[৩৩]

বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত হেরোইন, প্যাথেডিন, ফেনসিডিল, বিয়ার, ব্রান্ডি, হুইস্কি, কোকেন, আফিম, ডায়াজেনাস, নাইট্রোজেনাম ইত্যাদি নেশাজতীয় দ্রব্যের অনুপ্রবেশ বহিরাগত অপসংস্কৃতির হাত ধরে হয়েছে। বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তির ছত্রচ্ছায়ায় প্রস্তুত হয়ে সেগুলো আজ যুব সমাজকে সবচেয়ে বেশী আসক্ত করেছে; ধ্বংস করছে তাদের সত্তাকে, দংশন করছে তার আত্মাকে। নেশাজাতীয় দ্রব্য মহামারী আকারে সবচেয়ে বেশী প্রবেশ করেছে তরুণ সমাজে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা সম্পর্কে তেমন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ১৫ লাখ থেকে ১৭ লাখ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে এই সংখ্যা ১৫ লক্ষ যার মধ্যে ৭০% যুব সম্প্রদায় এবং ১০% নারী।[৩৪]

বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারের ব্যাপক প্রসার ঘটে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন কারণে সমাজ ভারসাম্যচ্যুত হতে থাকলে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত তরুণ সমাজ যে উৎসাহ উদ্দীপনায় যুদ্ধে নেমেছিল পরবর্তীকালে সেই উদ্দীপনা নানা কারণে গঠনমূলক দিকে না গিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়। কলেজ ও জীবনাচরণের প্রভাবে অনেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে নতুনত্ব আনার চেষ্টা চালায়। অনুষঙ্গ বিষয় হিসেবে দেখা যায় নেশার ভুবনে তরুণদের বিচরণ। হাল ফ্যাশনের যুগে উচ্চবিত্ত, উচ্চ শিক্ষিত, কিছুসংখ্যক শহুরে পরিবারে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অনেকটা কালচারে পরিণত হতে চলেছে।

---

৩১. Encyclopedia Britanica (1978), Vol-20, P. 839

৩২. আবু তালেব, হোরোইন: আর এক মারণাস্ত্র, খুলনা: অমরাবতী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৬

৩৩. স্মরণিকা-মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

৩৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিবেদন, ১৯৯৪, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা-পৃ. ১৯

বাংলাদেশের ২৫-৩০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরাই সবচেয়ে বেশী মাদকাসক্ত। এ বয়সী তরুণেরাই মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ। আবার এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। এদের মধ্যেই প্রায় ৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত বলে মনে করা হয়। এদেশের যুব শ্রেণী আজ নানাবিধ আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এদেশের শহুরে যুবশ্রেণীর মধ্যে এর প্রকোপ বেশী। তবে গ্রামে-গঞ্জেও নেশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া ও খুলনা শহরের তরুণদের মাঝে নেশা গ্রহণের প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই ১ লক্ষ মাদকাসক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৩৫] কয়েক বছর আগের এক পরিসংখ্যানে শুধু ঢাকার মোহাম্মদপুরেই ২২ হাজার মাদকাসক্ত রয়েছে বলে "মুক্তি" নামের একটি বে-সরকারী ক্লিনিক উল্লেখ করে।[৩৬] অন্য এক তথ্য অনুযায়ী কেবল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১২,০০০ জন হেরোইন আসক্ত। কয়েক বছর আগের তথ্যে দেশে ৬০,০০০ লাইসেন্স প্রাপ্ত মধ্যপায়ীদের মধ্যে ৪০,০০০ তরুণ বয়সী বলে জানা যায়, আবার ১,০০০ জন মদ্যপায়ীর মধ্যে ১০ জনের বেশীর লাইসেন্স নেই।[৩৭] অন্য এক তথ্যে জানা হয় প্রতি ২,৪৪৩ জন মদ্যপায়ীর মধ্যে প্রায় ২৮৫ জন অর্থাৎ ১১.৬৭% ছাত্র।[৩৮]

পেশা অনুযায়ী মাদকাসক্তের হার[৩৯]

পেশা	শতকরা হার
বিভিন্ন কর্মচারী	৪৫%
ব্যবসায়ী	১৯%
চোরাচালানী	৫%
ছাত্রী	৬%
ছাত্র	৬%
বেকার	১৫%
অন্যান্য	৫%

মাদকাসক্ত ছাত্রদের প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য রয়েছে এই সারণিতে। প্রথম পর্যায়েই ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্বে মাদকাসক্তির বৃদ্ধির হার ২% ভাগ; বাংলাদেশে এই বৃদ্ধির হার ৩.৮% অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।[৪০] ঠিক এই হারটির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়তে থাকে এদেশের ছাত্রসমাজে মাদকাসক্তির প্রবণতাও। তবে বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কোন ধারাবাহিক পরিসংখ্যান নেই বলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৩৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশ সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও সমাধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২৬৬

৩৬. এম ইমদাদুল হক, মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত স্মরণিকা-১৯৯৬, পৃ. ১৫

৩৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ. ৪

৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা-৬৮, ২০০০, পৃ. ১৭৮

৩৯. স্মরণিকা-২০০০, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পৃ. ২২

৪০. স্মরণিকা-২০০০, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পৃ. ৩০

মাদকাসক্তির কারণঃ

মাদকদ্রব্যে আসক্ত হওয়ার পেছনে একক কোন কারণ দায়ী নয়। কিন্তু তারপরেও বলতে হয় এর মূলে রয়েছে এর সহজ প্রাপ্তি। পেছনে রয়েছে এক সংঘবদ্ধ মাফিয়া চক্র যারা সুকৌশলে এবং কেবল নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য এটিকে বাজারে ছাড়ছে। একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মাদকাসক্তি হল বাজার অর্থনীতির কুফল যেখানে একদল স্বার্থান্বেষী কালো টাকা লাভের আশায় সে কাজ করছে; পিছনে রয়েছে আরো নানা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্বিক কারণ।[৪১]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শহরায়ন ও নগরায়নের ফলে সৃষ্ট জটিলতা, ছাত্র-রাজনীতিতে ঢুকেপড়া কু-প্রভাব, রাজনীতিবিদদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া, আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া, সন্ত্রাস, হতাশা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মানুষকে মাদকাস্ত হতে সাহায্য করেছে। এছাড়া বন্ধু-বান্ধবের কু-সর্গ, পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক অস্থিরতা, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হওয়া এবং মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত জরিপে দেখা যায় স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা বেশী। ধনীর দুলাল-দুলালীদের কাছে এটি আভিজাত্যের প্রতীক। সুখের হতাশায় মাদকদ্রব্যের সম্মোহনে হারিয়ে যেতে এরা ভালবাসে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। রক্ত প্রবাহে মাদক দ্রব্যের জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এদেরকে প্রদান করে এক উষ্ণ অনুভূতি। এই পুলক অনুভূতি, স্বপ্নিল তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও নষ্ট আনন্দ এক সময় তাকে আসক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।[৪২]

এছাড়াও আমাদের দেশে শিক্ষিত সচেতন মাদকাসক্তদের এমন অনেকেই পাওয়া যায় যারা মনে করেন যে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মস্তক স্বচ্ছ থাকে, কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, সাফল্য আসে। মাদকদ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে যুক্তিগুলোর অধিকাংশই দুর্বল মানসিকতার পরিচায়ক। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে আমাদের ছাত্র সমাজ মাদকাসক্ত। উল্লেখ্য, মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে একজন ছাত্রের যেমন একটি কারণ থাকতে পারে, তেমনি একাধিক কারণও থাকতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ দায়ী তবে তার জন্য পরিবারকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করা যায়। পারিবারিক স্নেহ, আদর, ভালবাসা, পারিবারিক অশান্তি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থাকে এরজন্য দায়ী করা যায়।

মাদকাসক্তির প্রভাবঃ

মাদকাসক্তি ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে। মাদকাসক্তির ফলে কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ প্রথমেই রুদ্ধ হয়ে যায়। ছাত্র হলে সে আর লেখাপড়া করতে সক্ষম হয় না। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন কেউ মাদক উপ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আত্মহননের পথই বেছে নেয়। এভাবে সমাজের সম্ভাবনাময় একটি অংশ যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন উন্নত-অনুন্নত যে কোন দেশের জন্যই তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

---

৪১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৪২. স্মরণিকা-১৯৯৩, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-পৃ. ৭০

(১) মাদকদ্রব্যের ব্যবহার শারীরিক ও মানসিক দিককে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ব্যবহারকারীকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। কিছু মাদকদ্রব্য রয়েছে যা গ্রহণ করলে উঠতি বয়সের ছেলে নিজেকে অত্যধিক শক্তিশালী অনুভব করে। আর এই 'শক্তির' সাথে বিভ্রান্তির যোগ হলে তখন ঐ তরুণ যে কোন মারাত্মক অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে। এদের কেউ কেউ এক পর্যায়ে ছিনতাই অবৈধ চাঁদা আদায়, চুরি-খুন, মারামারি, কালোবাজারী, দেহ ব্যবসা ইত্যাদি মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধমূলক কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

(২) মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দিককে ক্রমাবনতির দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পঙ্গু করে দেয়। সেই সাথে ব্যক্তিকে নিঃসঙ্গ ও মর্যাদাহীনের স্তরে নিয়ে আসে। মাদক নির্ভরতা ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, রোগব্যাধি সৃষ্টি করে; ওজনহীনতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষুধামন্দায় ভোগায়। এদের কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়, মতিভ্রম দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহীন ও কংকালসার হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

(৩) মদ মানুষের শরীরে বহুমুখী ক্ষতিসাধন করে থাকে। মদের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজম শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্য স্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ূ দুর্বল হয়ে আসে, সামগ্রিকভাবে শারীরিক অক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়, মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, মদ যকৃৎ কিডনী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে, যক্ষা রোগ মদ পানেরই একটি বিশেষ পরিণতি। বর্তমানে এইডস এর প্রাদুর্ভাবেও মদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।[৪৩] মাদকসেবীদের মধ্যে ৯০% বহুগামীতায় অভ্যস্ত। তবে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করতে সমকামিতা, যৌনাচার পরিহার করা অন্যতম উপায়।[৪৪] তবে HIV (Human Immune Viruse) শরীরে প্রবেশ করলে তার প্রতিষেধক ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অত্যধিক সুরা পানের ফলে কিডনীর সন্নিহিত অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে বেশি প্রস্রাব উৎপন্ন করে। মাদকাসক্ত অমাদকসেবীর তুলনায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে মারা যায়। স্নায়ুতন্ত্র মাদকাসক্তদের মুখগহবর, গলা ও স্বরতন্ত্র (Voice Box) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুরার সাথে যারা ধূমপান করে তাদের পাকস্থলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবর্তী মহিলা যদি সূরা ও ধূমপান একসাথে করে তাহলে Fetal Alcohol Syndrome দেখা দিতে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে গর্ভজাত শিশু মানসিক ও শারীরিক বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে।[৪৫]

(৪) বিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। যেমন:

* মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস করে দেয়, যেটা কোনভাবেই সারানো সম্ভব নয়।

* মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে দেহের ত্বকের ইলাস্টিসিটি ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

* অনেক সময় মদ্যপায়ীরা আইকেমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

---

৪৩. মাসিক অগ্রপথিক, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-২০০৭, পৃ. ৮৭-৮৮

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪৫. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা.), কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (স.), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১৫৮

* অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

* মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে হজমশক্তি হ্রাস পায় ও খাওয়ার স্পৃহা কমে যায়।

* মাদকদ্রব্য সেবনকারী ব্যক্তি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা দুরূহ।

* অতিরিক্ত মদ পান করলে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া মন্থর হয় এবং রক্তের চাপ বেড়ে যায়।[৪৬]

(৫) ক্যানাবিস জাতীয় মাদকদ্রব্যের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি, চরস, হাসিস, মারিজুয়ানা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ক্যানাবিস স্যাটাইভা নামের এক ধরণের উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফুলের ঊর্ধ্বভাগ, রস, ডাল ও বীজ থেকে এগুলো তৈরী। এর মধ্যে টেট্রাহাইডো-কেনাবিল রয়েছে যাতে তামাকের চেয়ে বার গুণ বেশি Tar এবং বিশ গুণ বেশি কার্বন-মনোক্সাইড (CO) বিদ্যমান যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। ক্যানাবিস মানুষের চিন্তাশক্তি, শিক্ষাগ্রহণ ও স্মৃতিচারণ ব্যাহত করে। মস্তিস্কের টিস্যুর ক্ষতিসাধন করে, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ হ্রাস করে। ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা জাতীয় ব্যাধি সৃষ্টি করে। এটা জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কেননা, এর ব্যবহার পুরুষের টসটোসটরেন্ট এবং মহিলাদের এসট্রোজেন হরমনের উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে মানব জাতিকে বিকৃত মস্তিষ্কের জাতিতে পরিণত করে। এধরনের মাদক পুরুষের শুক্রাণুর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। কৈশোরে এ মাদক গ্রহণ করলে তা 'পিটুইটারী' গ্ল্যান্ডের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। জীবনের সূচনাতেই শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।[৪৭]

(৬) মাদকাসক্তির ফলে মানুষের বিবেকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। কারণ মাদকাসক্ত তার নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে। সুন্দর মনের অধিকারী ব্যক্তির মানসিকতা পরিবর্তিত হয়। ২ অথবা ৩ আউন্স পরিমাণ হুইস্কি পান করলে পানকারীর চিন্তা ও বিচার শক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। উদ্বেগ-অস্তিরতা হ্রাস পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হলেও তা তাৎক্ষণিক ও স্বল্পমেয়াদী। রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা যদি ৩০% হয় তাহলে সুরা পানকারীর মানসিক বিভ্রাট ঘটবে এবং ক্রমশই চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে; যদি রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ৪৫% হয় তাহলে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে; যদি ৭০ হয় তবে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।[৪৮]

মাদকসেবীর বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার ফলশ্রুতিতে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। এমনকি সে পরিবারের অন্য সদস্যদের জান-মাল ও অর্থের নিরাপত্তা, মান-সম্মান ও বংশীয় গৌরবের ঐতিহ্য বিনষ্ট করতে একচুলও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই মাদকাসক্তি শুধু মাদকসেবীকেই ক্ষতি করে না বরং পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও প্রভাবিত করে।[৪৯]

(৭) মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে শিক্ষিত সমাজও রেহাই পায়নি। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রণীত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বাংলাদেশে মাদক সেবীর সংখ্যা ১৭ থেকে ১২ লাখ। তন্মধ্যে ১৯৯৯ সালের International Drug Control Program (IDCP) এর পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশে ৪ লাখ ৪০ হাজার

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

৪৭. মাসিক অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪৮. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

শিক্ষিত মানুষ মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৩ জন রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৫% ফেন্সিডিল ও হেরোইনের প্রতি, ১৩% প্যাথেড্রিন ইনজেকশনের প্রতি, ৬% হাশিশের প্রতি এবং ৩% এ্যালকোহলের প্রতি আসক্ত।[৫০] ফলে এটা আমাদের জন্য বিরাট হুমকি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাদক সেবন করছে, যা জাতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে।[৫১]

(৮) একথা সত্য যে, কোন মানুষ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয় না। বরং বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে জীবনের বিশেষ সময় সে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে Teenage এ মাদকাসক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং এটাই তার অপরাধ জগতে অনুপ্রবেশের হাতে খড়ি। মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে বাস, ট্রাক, রেল, বিমান ইত্যাদি যানবাহন চালনা করলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে জান-মালের অনেক ক্ষতি হয়। নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকে দুর্বল করে দেয়, যার কারণে হত্যা, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, ছিনতাই, রাহাজানি, আত্মসাৎ ইত্যাদি ঘৃণ্য অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করেনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ লাখ মানুষ নিয়মিত মাদকাসক্ত এবং আরো ৬০ লাখ মানুষ অনিয়মিত মদ পান করে। প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আমেরিকায় যে ২০ হাজার মানুষ মারা যায় তার জন্য এসব মদ্য পায়ীরাই মূলত দায়ী। আমেরিকায় বছরে ২৫ হাজার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তার পেছনেও রয়েছে মদ ও মাদকের অপব্যবহার। সম্প্রতি এক তথ্য মতে বাংলাদেশের জেলখানায় আটককৃত কয়েদিদের মধ্যে ৩৭% মাদকাসক্ত।[৫২]

(৯) মাদকদ্রব্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিসংখ্যানবিদদের মতে একটি শহরে মদের ব্যয় সমগ্র জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান। এ বিষয় এক জার্মান ডাক্তার মন্তব্য করেন, "যদি অর্ধেক মদের দোকান বন্ধ করে দেয়া হয় তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। একজন মাদকসেবীর প্রতিদিন মাদক বাবদ খরচ গড়ে ১৩০ টাকা। মৃত্যু ছাড়াও মাদকের অপব্যবহারজনিত অপরাপর ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৫৩] বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের বয়স ১৮-৩৫ বছর। এদের মধ্যে ৪০% বেকার, ২৫% ছাত্র, ১৫% ব্যবসায়ী এবং ২০% অন্যান্য পেশার লোক। মাদকাসক্তদের প্রতিদিনের খরচ ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা।[৫৪]

মোটের উপর, মদের কুপ্রভাব সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ফ্রান্স পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মাদক উৎপাদনকারী দেশ। পৃথিবীর বার্ষিক মদের চাহিদা হচ্ছে ৪,৫০০,০০০,০০০ গ্যালন। চাহিদার এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে ফ্রান্স। ফ্রান্সের পর জার্মানের অবস্থান। মদ রপ্তানীকারী দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকার অবস্থান আট-এ। ৯০% মদ উৎপন্ন হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইতালী, স্পেন, আলজিরিয়া, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম মদ উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানীকরক দেশ। ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে বছরে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ব্যারেল মদ উৎপাদন করে। এই উৎপাদন ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ।[৫৫]

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৫৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪২তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৯২, পৃ. ১৫৩

৫৫. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

মাদকাসক্তি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিঃ মাদকাসক্তি মানুষকে সাময়িক আনন্দ দেয় বটে তবে যতটুকু দেয় তার থেকে কেড়ে নেয় বেশি। মহান আল্লাহ বলেন, "উহাদের পাপ উপকার থেকে বেশী।"[৫৬] সর্বোপরি বলা যায়, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এত সূদূরপ্রসারী যা বিপদজনক মাইন থেকেও ভয়াবহ ও মারাত্মক। মাদকাসক্তি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার বিচ্ছেদ ঘটায় এবং বৈরীভাবের জন্ম দেয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা একে হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাঁধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।"[৫৭]

রাসূল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এরপর সে তা থেকে তাওবা করেনি, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।"[৫৮]

তিনি আরো বলেন, "মদ পানকারী মদ পান করার সময় মু'মিন থাকেনা।"[৫৯]

সুতরাং মাদকদ্রব্য মাত্রই ইসলামে হারাম। তার কারণও সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নায়। তা হচ্ছে এই নেশাকারী জিনিস মানুষের পরস্পরায় চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকেও মানুষকে বিরত রাখে। অন্যকথায়, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে যেমন সাধারণভাবে আল্লাহকে স্মরণে রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি স্মরণের বিশেষ অনুষ্ঠান যে সালাত, তা রীতিমত আদায় করাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব থেকে যায়। অথচ তা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ্‌র পথে কোন বাধা বাঞ্ছনীয় নয়, এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব আড়াল উৎপাটিত করাই আল্লাহর বান্দাদের কর্তব্য। কিন্তু নেশা বা মাদকদ্রব্য এ কাজে প্রধান বাধাদানকারী। অতএব ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় থাকতে পারে না। সর্বোপরি বহুমুখী ক্ষতির কথা চিন্তা করে ইসলামে বিশ্বাসী না হয়েও বহু রাষ্ট্র ও সরকার মদপান নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি।

ইসলামের মদ্যপান সংক্রান্ত নিষেধবাণী একদিনে অবতীর্ণ হয়নি। এটা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক যুগে মদের ব্যবহার এত বেশি ছিল, তা তখন আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এ মারাত্মক জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা, জিনিসটিকে তখন হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল।[৬০] এ কারণেই দেখা যায়, শুধু মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য ইসলামকে চার পর্যায়ের আয়াত নাযিল করতে হয়েছে। মক্কাতে প্রথমে যে আয়াত নাযিল হয় তা হল, "এমনিভাবে তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুরের ছড়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।[৬১]

---

৫৬. আল-কুরআন, ২:২১৯

৫৭. আল-কুরআন, ৫:৯০

৫৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, সহীহ আল বুখারী, ৫ম খন্ড, মারকাতুয তুরাছি লিআবহাছিল হাসিব, আমান, ১৯৯৯, হাদীস নং-৫২৫৯

৫৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২৫৬

৬০. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "কুরআনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা ও সূরাসমূহে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমানের উল্লেখ রয়েছে। তা গ্রহণ করে লোকেরা যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল, তারপর হালাল-হারামের বিধান অবতীর্ণ হল। এ না হয়ে প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হত, তোমরা মদ পান করনা, তাহলে তারা অবশ্যই বলত, আমরা কখনই মদপান ত্যাগ করব না। (আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৬০৯)

৬১. আল-কুরআন, ১৬:৬৭

এখানে ইঙ্গিত করেছেন, ফলের এই রসে মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে পাবে এ্যালকোহলে পরিণত হয়ে মাদক হওয়ার যোগ্যতা। মূলতঃ হালাল এ বস্তু থেকে মানুষ হালাল ও উত্তম কল্যাণকর খাদ্য গ্রহণ করবে, না বিবেক-বুদ্ধি-স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী মদে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এতে আরও ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে মদ পবিত্র রিযিকরূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মদের প্রতি ঘৃণার বীজ মানুষের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথমবারে অবতীর্ণ আয়াত-এর মূল উদ্দেশ্য।[৬২] অতঃপর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়, "লোকেরা তোমার নিকট মদ ও জুয়ার কথা জানতে চায়। তুমি বল, এ দু'টি কাজে খুব গুনাহ রয়েছে এবং লোকদের উপকারও আছে বটে। তবে উপকারের তুলনায় গুনাহ অধিক।"[৬৩]

অন্য কথায়, মদ্যপানে ও জুয়া খেলায় কিছুটা ফায়দা ও উপকার যে আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কেননা, মদ ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ, জুয়া খেলায় জয়ী হলে বিপুল অর্থ হঠাৎ হাতে আসে। কিন্তু তাতে ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দিক রয়েছে। তা উপকারের তুলনায় বেশি মারাত্মক ও পরিহারযোগ্য। এ কথাটুকু বলে মূলতঃ মদ যে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, যে জিনিস অত্যন্ত ক্ষতিকর তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য, যদিও এ মুহূর্তে তা সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না।

এরপর সালাত আদায়ের সময়কালে মদপান করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! নেশা করে তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না। যতক্ষণ না তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে কি বলছ, তা বুঝতে পার।"[৬৪]

এ আয়াতে সালাতকালীন সময়ে মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সালাতকালীন সময়ের বাইরে লোকেরা মদপানে রত থাকত। কেননা, অন্যান্য সময়ে মদপান করা নিষিদ্ধ হয়নি। এভাবেই চলতে থাকল। এ সময়ই হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিজের ঘটে এক ভোজনসভার আয়োজন করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবী যোগদান করেন। ভোজ শেষে প্রথানুযায়ী সকলে মদপানে রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে কেউ কেউ হযরত সাদ (রা.)- কেই আঘাত করেন। ফলে তাঁর নাকে জখম হয়ে যায়। এ সম্পর্কে মদপান চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাযিল হল নিম্নোক্ত আয়াত, "হে বিশ্বাসীগণ! মদ, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা সকলে তা সম্পূর্ণ পরিহার কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ পাবে। মনে রেখ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট এবং সে তোমাদের বিরত রাখতে ইচ্ছুক সালাত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। তবে কি তোমরা এ কাজ থেকে বিরত থাকবে না?"[৬৫]

---

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ঢাকা: খায়রুল প্রকাশনী, ৯৯৬, পৃ. ২৪৩

৬৩. আল-কুরআন, ২:২১৯

৬৪. আল-কুরআন, ৪:৪৩

৬৫. আল-কুরআন, ৫:৯০–৯১

এছাড়া হাদীসে মদপানের জন্য নানা ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও মদ্যপানকে মূর্তিপূজকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার কোথাও মদ্যপানকে মূর্তিপূজার সমতুল্য বলা হয়েছে। এসবই হল মদপান করার ক্ষতির দিক যা উপকারের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। যেমন:

* নবী করীম (স.) বলেছেন, "অভ্যাসরত মদপায়ী যদি মারা যায়, সে আল্লাহর সাথে সেই ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাৎ করবে যে ব্যক্তি মূর্তি পূজা করে।[৬৬]
* হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মদই পান করি, আর মূর্তি পূজাই করি, এর ভেতর পার্থক্য দেখি না।"[৬৭]
* হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী পানীয় এবং তেজ উৎপাদনকারী খাদ্য নিষেধ করেছেন।"[৬৮]

* যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা উৎপাদন করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম।[৬৯]

ইসলাম শুধু যে মদপান হারাম করেছে, তাই নয়। মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সব কিছুকেই হারাম ঘোষণা করেছে। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্‌তা'আলা লানত বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, তার যে উৎপাদন করায় তার উপর, তার বহনকারীর উপর এবং তা যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, তার উপর।"[৭০]

একদা নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মদ বিক্রির অর্থ দিয়ে কিছু করা যাবে কি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ইহুদীরা তাদের গরু-ছাগলের চর্বি হারাম হওয়ার পরও তা সংগ্রহ করে বিক্রি করত। এই করে তারা আল্লাহর লানত কুড়ায়। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ মদ ও এর মূল্য হারাম করে দিয়েছেন।"[৭১]

মদপান ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পাপ এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য। কিন্ত আল-কুরআনে এর কোন শাস্তি উল্লেখ নেই। হাদীস শরীফেও কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। ইহা অবস্থাবেধে সামান্য ভর্ৎনা হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। হযরত উমর (রা.) এর রাজত্বকালে মদপানের শাস্তি ৪০ হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত ছিল।[৭২] এ শাস্তি দিতে হলে দু'জন সাক্ষী বা স্বীয় স্বীকারোক্তি দরকার।

* হযরত ইবনু উমর (রা.) হতে বর্ণিতঃ মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে মদ পান করে এবং তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে পরকালে পানীয় পান করতে পারবে না।[৭৩]
* মহানবী (স.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম-মদখোর, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং অসতর্ক গৃহস্বামী, যে তার পরিবারের ভিতরে অশ্লীলতা স্থাপন করে।"[৭৪]

---

৬৬. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহমাদ, বায়রূতঃ দারুল-মায়ারিফ, ১৪০৯ হিজরী, হাদীস নং-২৩২৫
৬৭. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ আন নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়্যা, ১৪১০ হিজরী, হাদীস নং-৫৫৬৯
৬৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৫৭
৬৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, দিল্লীঃ কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-১৭৮৮
৭০. আবু দাউদ সুলায়মান, সুনানু আবি দাউদ, দিল্লীঃ কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৩১৮৯
৭১. আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭৩১০
৭২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬২৭৫
৭৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহুলি মুসলিম, দিল্লীঃ কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৩৭৩৩
৭৪. আবু আবদুর রহমান আহমাদ, আননাসাঈ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৭৭

* মহানবী (স.) বলেছেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন তার ঈমান থাকে না, আর মদ্যপ যখন মদ পান করে, তখন তার ঈমান থাকে না।"[৭৫]

* "একবার মদ পান করলে ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন না ।[৭৬]

সর্বনাশা মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের অত্যাধুনিক সংস্করণ মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, এ্যালকোহল, ক্যানাবিস, মদ, ডিডোব্রিন, হেরোইন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। ফলে দিনের পর দিন হত্যা ও ধর্ষণসহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের পরিণামে। মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আরেক বিচারপতি। আমাদের এই বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যসেবীর সংখ্যা ১৭ লক্ষাধিক। আর এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে অভিজাত মহলের লোক। ইনজেকশন জাতীয় মাদকদ্রব্যের সুবাদে অনেক কোটিপতিও প্যাথেড্রিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। যুবসমাজ মাদক সেবন করে হচ্ছে নারী আসক্ত। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, রাহাজানী, ছিনতাই ও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ এই মাদকাসক্তি। এর ফলে যেমন দুরারোগ্য ব্যধির প্রসার ঘটছে তেমনি নৈতিক গুণাবলীও হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোটায় চলে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে, তা সমাজ জীবনের গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। ধর্মীয় মূল্যকেই কেবল এ অবস্থার হাত থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করতে নেশামুক্ত, সুস্থ্য ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আজ প্রমাণিত।

---

৭৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৯৫

৭৬. আবু আবদুর রহমান আহমাদ, আন নাসাঈ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহারঃ

ধর্মবোধের প্রকৃত ভিত্তিই হলো নৈতিকতা। এজন্যে ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশি। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষের নৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ও শোচনীয় ছিল। মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার, রাহাজানি, লুটতরাজ, যুল্‌ম, সীমালঙ্ঘন, অন্যায়-অবিচার ও সমাজ গর্হিত অপরাধ ইত্যাদির চরম নৈতিক অধঃপতন বিরাজ করছিল। মহান আল্লাহ্‌ এ মানবজাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[১] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[২] এ আয়াতের তাৎপর্য নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে।"[৩] এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলি উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে সেক্ষেত্রে তার বাণী অনুসরণ করা অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, তিনি বলেন, সকলের কাছে তাঁর (রাসূল (স.) এর জীবনাদর্শ এক উজ্জ্বল দর্পণ বিশেষ। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও উহা সম্পূর্ণ অবিকৃত, অপরিবর্তিত, নিষ্কলুষ ও প্রজ্জ্বল। অনন্তকাল পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতি তাঁর দীপ্ত আলোকশিখা, সাদৃশ্য জীবনাদর্শ থেকে অভ্রান্ত ও কল্যাণময় জীবনের দিক নির্দেশনা লাভে ধন্য থাকবে।"[৪] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা সকলেই কালেমার দাওয়াত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। কোন প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও বাঁধা-বিপত্তি তাঁদেরকে আনীত মিশন ও ভিশন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কারণ তারা ছিলেন পরীক্ষিত সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিদ্যমান নৈতিকতা যেমনঃ সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সুবিচার, অঙ্গিকার রক্ষা, দানশীলতা ও উদারতা ইত্যাদি। এগুলো ইসলামে সকলের জন্য আখলাকে হাসানা তথা চিরন্তন, সচরাচর পালনীয়, শোভনীয় ও সার্বজনীনভাবে কাম্য ও গ্রহণীয়।"[৫] পক্ষান্তরে, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা অগ্রহণযোগ্য আখলাকে সাইয়্যেয়াহ্‌ বা মন্দগুণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই মানুষ, দেশ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ডের ভাল-মন্দের মাঝে ও মানবতা ও মানবিকতাকে সবসময় এক ও অভিন্নরূপে গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। বস্তুতঃ মানবতার এই চিরন্তন স্বীকৃতিই হলো ইসলামের নৈতিকতা ও নীতিবোধ।

---

১. আল কুরআন, ৬৮:৪।
২. আল কুরআন, ৩৩:২১।
৩. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) মা'আরেফুল কুরআন, (হারামাইন শরীফাঈন বাদশাহ্‌ ফাহাদ, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প। (হি. ১৪১৩) পৃ. ১০৭৩
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, কাওকাবুদ দুররী, (ঢাকাঃ সুফী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ/ডিসেঃ/২০০৭), পৃ.৫
৫. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামের ভূমিকা, (ঢাকাঃ ওরিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৬) পৃ. ১৪৮

কুরআনী নৈতিকতা:

কুরআনী নৈতিক বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, মানুষকে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত করা[৬] এবং মানুষের জীবন বিধান (দীন) কে আল্লাহ্‌র ফিতরাত ও প্রাকৃতিক আইনের [Laws of Nature] সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুগ্রথিত করা।[৭] পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো বিশ্বজনীন প্রতিপালন ও রহমাত[৮] এবং এক মানব জাতিবাদ [Pan Humanism][৯] এবং জাতিতে জাতিতে যে বিবেধ ও মতানৈক্য তার মিমাংসা বিধান।[১০]

পবিত্র কুরআনের সবরকম আলোচনা ও ভাষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আপোষহীন তাওহীদবাদ। দীন ইসলামের গোটা ইমারতটার মূল বুনিয়াদ হলো তাওহীদবাদ। এই জন্য দীন ইসলামকে তাওহীদ বিজ্ঞানও বলা হয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিমের মতে, "ইসলাম হচ্ছে একটি বিজ্ঞান যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সমষ্টিগত পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কারবার করে।"[১১]

দীনের বিশেষজ্ঞগণ ইসলামকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করেছেন। (১) ঈমান, (২) ঈবাদত-এতে মানুষের সব রকমের দীনদারী ও দুনিয়াদারী সৎকর্ম, সাধনা, কর্মপ্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ শামিল রয়েছে (৩) মু'আমিলাত অর্থাৎ ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবন ও (৪) আখলাক-অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টির চরিত্র ও নৈতিকতা। দীনের এ চারটা অঙ্গের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও জীবদেহের মত একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত যেমনটা মানুষের দেহে–মস্তিষ্ক, হার্ট, লিভার, কিডনী, অন্ত্র ও রক্ত ইত্যাদি স্বাধীন অস্তিত্ব বিশিষ্ট হলেও পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এদের একটা অকেজো হলে বাকীগুলোও আস্তে আস্তে বিকল হয়ে মানুষের প্রাণনাশ হয়। ঈমানকে জীবদেহের হার্টের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হার্টফেল করলে যেমন জীবন মারা যায়, ঈমান না থাকলেও মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

দীন ইসলামে দীনদারী ও দুনিয়াদারী বলে দুটো কোন আলাদা বিভাগ নেই। মানুষের সবরকম সাধনা, কর্মপ্রচেষ্টা, কার্যকলাপ, কর্মকান্ড ইত্যাদি মোদ্দা কথায় মানুষের সামগ্রিক জীবন দীন ইসলামের আওতাভুক্ত। মানুষের যে কোন ভালো কাজ সওয়াব হাসিল করবে এবং যে কোন মন্দ কাজ গোনাহ্‌ অর্জন করবে।[১২]

সালাত, সিয়াম করলাম; মসজিদ-মাদ্রাসায় দান-খয়রাত করলাম; হজ্ব পালন করলাম এবং অন্যদিকে বৈষয়িক ব্যাপারে শঠতা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, কালোবাজারি, দুর্নীতি,জোর-জুলুম ও শোষণ করলাম–এরূপ দুটো বিপরীতমুখী নীতির কোন অবকাশ দীন ইসলামের জীবন বিধানে নেই। এ রকম দু'মুখো নীতি নেহাত আত্মপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুনিয়ার মানুষের মত আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। ইসলামে হক্কুল্লাহ্‌ ও হক্কুল ইবাদ পরস্পর অনুপূরক।

---

৬. আল কুরআন, ২: ১৩৮
৭. আল কুরআন, ৩০:৩০
৮. আল কুরআন,১:১-২
৯. আল কুরআন, ১০:১৯
১০. আল কুরআন, ২:২১৩
১১. The Creed of Islam. p.-2
১২. আল কুরআন, ৯৯:৭-৮

বিজ্ঞান বলে, বস্তু জগতে প্রত্যেক কাজের একটা প্রতিক্রিয়া ও ফল আছে। কুরআন বলে যে, প্রত্যেক কাজ-কর্ম তার আত্মায় একটা স্থায়ী প্রতিক্রিয়া বা ফল উৎপন্ন করে। কুরআনে তাকে প্রতিফল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভাল কাজের ভালো ফলকে সওয়াব আর মন্দ কাজের মন্দ ফলকে গোনাহ্ বলে। 'পুনরুত্থানে প্রত্যেক মানুষ তার কৃত পুণ্য ও পাপকে উপস্থিত দেখতে পাবে।'[১৩] সৃষ্টির বিধান জড় জগতে ও আত্মিক জগতে একই রকম এবং কাজের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল জড় জগৎ ও আত্মিক জগত-এই উভয় জগতেই রয়েছে।

আখেরাতের পুরস্কার বা আযাবের ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র খেয়াল-খুশি, গোস্বা, প্রতিশোধস্পৃহা ও গযবের ব্যাপার নয় বরং সৃষ্টির অন্যতম বুনিয়াদী নীতি 'হক' এর একটা প্রধান অনুসিদ্ধান্ত। আফসোসের বিষয় এই যে অনেকেই প্রতিদান দানের ব্যাপারটাকে আল্লাহ্‌র খেয়াল-খুশি ও গযবের আযাব হিসেবে ব্যাখ্যা করে রহমানুর রহীম আল্লাহকে 'স্বেচ্ছাচারী শাসক'রূপে চিত্রিত করে। নাউযুবিল্লাহ! কিন্তু সত্যিকারভাবে পুরো ব্যাপারটাই ইনসাফের ব্যাপার-গযব আযাবের বা খুশি-না খুশির নয়।

নৈতিকতা একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ইসলামী জীবন বিধানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামে নৈতিকতার উপর ভিত্তি করেই সব রকম আইন-কানুন রচিত হয়েছে; নৈতিকতা হলো মূল এবং নৈতিক মানগুলো সব সময় অপরিবর্তনীয়। সামাজিক বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন কেবল মানুষের বহির্ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আর নৈতিক বিধান নিয়ন্ত্রণ করে মনকে। সামাজিক আইন-কানুনকে অমান্য করার ও ফাঁকি দেয়ার অনেক পন্থাও ফাঁক-ফোঁকর আছে; নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে সে অবকাশ নেই। নৈতিকতা হলো মানবতার স্রষ্টা। দীন ইসলামে মানুষের সামগ্রিক জীবন নৈতিকতার আওতাধীন এবং সব রকম বৈষয়িক ব্যাপার যেমন পারিবারিক, গোত্রীয়, সামাজিক, জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, জৈবিক ও বিচার ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ব্যাপার সভ্যতা ও সংস্কৃতির আওতাধীন। কুরআনের নিম্ন উদ্ধৃত আয়াত সমূহ থেকে নৈতিকতা সম্বন্ধে কুরআনী মতবাদের মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যাবে। 'শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; পুণ্যের পথ হলো আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ ও সব নবীর উপর ঈমান রাখা; আর আল্লাহ্‌র প্রেমে নিজের সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও ভিক্ষুককে দান এবং দাস মুক্তির জন্য খরচ করা আর সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা, ওয়াদা পালন করা আর দুঃখে কষ্টে বা ভয়-ভাবনায় সবর থাকা-এরাই সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[১৪]

উপরোক্ত আয়াতে ঈমান, হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদকে এক সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। "আমি (আল্লাহ্) তাকে (মানুষকে) কি চক্ষুদ্বয়, জিহক্কা ও অধর-ওষ্ঠ দেইনি এবং আমি কি তাকে ভাল-মন্দ দুটো পথই দেখাইনি? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কি, এ হচ্ছে: দাসমুক্তি অথবা অনাথ আত্মীয়কে অথবা দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্রকে ক্ষুধায় অন্নদান; তদুপরি ঈমানদারদের একজন হওয়া-যারা পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যশীল ও দানশীল হতে উৎসাহিত করে; তারাই সৌভাগ্যশালী।"[১৫]

---

১৩. আল কুরআন, ৩:৩০
১৪. আল কুরআন, ২:১৭৭
১৫. আল কুরআন, ৯০:৮-১৮

আল্লাহ্ মানুষকে ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান দান করেছেন যাতে সে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে পূর্ণ মানবে পরিণত হওয়ার জন্য ভালো ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করতে পারে। "মুসলমান পুরুষ ও নারী, ঈমানদার পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী,আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী–এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।" [১৬] "অহংকার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।"[১৭]

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তাদের প্রাপ্য এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।" "যেনার নিকটবর্তী হবে না; এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। অন্যায়ভাবে কাকেও হত্যা হত্যা করবে না; অনাথ ও ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং ওয়াদা পালন করবে; এ সম্বন্ধে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দেবার সময় পূর্ণভাবে মাপবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়; এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হবে না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়–ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনো পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" [১৮] "কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু ওরা নয় যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য, ন্যায়পরায়ণতা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" [১৯] "তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সৎ কার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং সৎ কার্যে প্রতিযোগিতা করে, তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভূক্ত। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় [সৎ কাজে] ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল–আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।"[২০] "বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার।"[২১]

"হে মুমিনগণ, তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[২২] "যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।" " তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল।"[২৩] "হে মুমিনগণ, কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।" "তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না।" " তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে?"[২৪]

---

১৬. আল কুরআন, ৩৩:৩৫
১৭. আল কুরআন, ৩১:১৮
১৮. আল কুরআন ,১৭:২৬, ৩২-৩৭
১৯. আল কুরআন ,১০৩ :১-৩
২০. আল কুরআন,৩:১১৪,১৩৪
২১. আল কুরআন, ৭:২৯
২২. আল কুরআন ,৪:২৯
২৩. আল কুরআন,২৫:৭২,৭৫
২৪. আল কুরআন , ৪৯:১১,১২

"মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার দুশমনি আছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[২৫]

পাক কুরআনে ইসলামী নৈতিক বিধান সম্বন্ধে এরূপ আরো বহু আয়াত আছে। উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে আমরা নৈতিকতার কুরআনী মতবাদের একটা সুন্দর চিত্র পেয়ে যাই।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রায় ক্ষেত্রে ঈমান, ইবাদত, সামাজিক ও নৈতিক বিধানের জরুরী বিষয়সমূহ একত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, দীন ইসলামে ঈমান, ইবাদত, মু'আমিলাত ও নৈতিকতা ইত্যাদি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বিশিষ্ট হলেও এরা জীব দেহের হৃদয়, মস্তিষ্ক, লিভার, কিডনী, অন্ত্র, রক্ত ইত্যাদির মত নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

'ইবাদতঃ

দীন ইসলামে সালাত সওমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরম সত্ত্বার সাথে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করে জীবনে এগিয়ে চলার জন্য শক্তি আহরণ ও পথের দিশা তথা হিদায়েত–জীবন ও জীবিকার পথ খুলে দেয়ার জন্য দু'আ করা " আমি নিজ প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথের দিশা দিবেন।"[২৬] এবং বিনা দ্বিধায় ও বিনা শর্তে পরম সত্ত্বার কাছে আত্মসমর্পণ করে "নিশ্চয়ই আমার সালাত এবং আমার ইবাদত এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য।" [২৭] নিজের অহংসত্তাকে (egoism) দমিয়ে বিশ্বজনীন খোদায়ী গুণাবলি ও পরার্থপরতা (Alturism) অর্জনের জন্য সাধনা করা, মনের ক্ষুদ্র পরিসরকে প্রসারিত করে এই বিশাল বিশ্বের সাথে একাত্ম বোধ করা যা মানুষকে জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে এবং মানুষকে করে তোলে সমস্ত জীবনের জীবের প্রতি আগ্রহশীল এবং মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি সহানুভূতিশীল।

'ইবাদত পরকালের নাজাতের উপায় মাত্র নয়, পার্থিব জীবনেও তা মানুষকে মানব দরদী ও সমাজমুখী করে তোলে। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা তাকে সৃষ্টির প্রতি একাত্ম করে তোলে। ইসলামের অনুসারী মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, নিষ্ক্রিয়, কর্ম-বিমুখ ও অসামাজিক না হয়ে হবে মানুষ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সর্বপ্রকার কর্তব্যের প্রতি সচেতন ও দায়িত্বশীল।

'ইবাদত হলো এক বৃহত্তর জগতের তোরণ খোলার চাবিকাঠি। কুরআনের সব আহক্ষান, দাওয়াত ও নসীহতের উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের ব্যাপকতম পরিপূর্ণতা সাধন। কুরআন বলে, "হে মুমিনগণ, রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে [বৃহত্তর] জীবন দান করবে, তখন আল্লাহ্ ও রসূলের আহক্ষানে সাড়া দেবে এবং জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।"[২৮] ইসলামে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য কর্মধারার কোন মূল্য নেই। কারণ এরূপ ধর্মপালন তার না নিজের জীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করে এবং না মানুষের কোন কাজে আসে; স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গন্ডিতে

২৫. আল কুরআন , ৪১:৩৪
২৬. আল কুরআন , ৩৭:৯৯
২৭. আল কুরআন , ৬:১৬২
২৮. আল কুরআন,৮:২৪

তার জীবন পাক খেতে থাকে। সূরা মাউন বলে যে, আর্তের সেবা এবং পাড়া-পড়শির প্রতি মহৎ সহানুভূতি ব্যতীত আসলে জ্ঞানের লোক দেখানো ধর্মাচার নিষ্ফল। আল্লামা ইকবালের মতে অন্বেষণ মাত্রই মূলতঃ একপ্রকার ইবাদত; প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক এক শ্রেণির 'ইবাদতরত মরমী সন্ধানী।' (Reconstruction of Religious Thoughts in Islam) কুরআন বলে, "নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং দিন-রাত্রির পরপর আগমনে সমঝদারদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের নিদর্শন, যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও হেলান অবস্থায় আল্লাহর কথা স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে এবং বলে হে আমাদের রব, তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি।"[২৯] প্রকৃতির জ্ঞান হলো আল্লাহ্‌র কার্যকলাপের জ্ঞান। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশের জন্য ও মানবতার সেবার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালানো কুরআনের মতে একপ্রকার ইবাদত ও পূণ্যময় কাজ বা আমালুস সালিহাত। আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের ধর্মবেত্তারা কুরআনের এই দৃষ্টিকোণকে প্রায় এড়িয়ে চলেছেন এবং তাদের অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবাঞ্ছিত মনে করেন। কিন্তু কুরআন ইরশাদ করে যে, "অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন-আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর বা নারীর কর্ম (আমল) বিফল করি না।" [৩০]

উত্তম জীবনাদর্শ:

উত্তম জীবনের একটা আদর্শ কুরআনের নিম্নের আয়াতসমূহে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার (আদল), পরোপকার (ইহসান), ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন। [৩১] "পরস্পর প্রবঞ্চনা করবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না; করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে।"[৩২] হয়ে ওঠে। কুরআন সব রকম জোর-জুলুম, শোষণ, প্রতারণা, চুরি, কুৎসা, অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদির নিন্দা করে; কারণ, এ সব ইনসাফ নীতিকে ভংগ করে।

সূরা ১৬:৯৪ 'আদল: ন্যায় বিচার, ইনসাফ। 'আদল: যথাযথ হওয়া, বিন্দুমাত্র কম বা বেশি না হওয়া। এই বিশাল বিশ্বটা সম্পূর্ণ খুঁতহীন ও ক্রুটিহীন।[৩২] সৃষ্টির সর্বত্র ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থেকে শুরু করে বিশাল নীহারিকা পর্যন্ত ছোট বড় সবকিছুই [অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে] পরিমাণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দিয়ে এক সূত্রে গেঁথে দেয়া হয়েছে।[৩৩] এর বিন্দু মাত্র হেরফের থাকলে গোটা সৃষ্টিজগৎই লন্ডভন্ড হয়ে যেতো। আধুনিক বিজ্ঞান 'আদল ও মীযানে এই সংখ্যা-তত্ত্বটা সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে পারছে।

---

২৯. আল কুরআন, ৩:১৯০-১৯১
৩০. আল কুরআন, ৩:১৯৫
৩১. আল কুরআন ,১৬:৯০
৩২. আল কুরআন , ৫০:৬, ৬৭:৩-৪
৩৩. আল কুরআন ,২৫:২৪ , ৮৭: ২-৩

'আদল ও মীযান হলো সৃষ্টির অন্যতম বুনিয়াদী নীতি 'হক' এর ইনসাফ বিধান। 'আদল ও মীযান প্রতিষ্ঠিত না থাকলে যেমন সৃষ্টির গোটা কারখানাই ধবংস হয়ে যেতো, তদ্রূপ সমাজে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার না থাকলে সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হয়ে সমাজ ছারখার হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কও বিষাক্ত কুরআনের ইরশাদ, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তা 'আদলের সাথে করবে।"[৩৪]

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ন্যায়-বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যদি তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়; সে বিত্তবান হোক কিবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতার অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো যে, তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সব খবরই রাখেন।"[৩৫]

" হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে; এটা ধর্মপরায়ণতা [তাকওয়া] এর নিকটতর।[৩৬]

"বলুন আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার।"[৩৭]

অতীতের ও বর্তমানের কোন সুসভ্য জাতির মধ্যে ন্যায় বিচারের জন্য এত কড়া নির্দেশ ও বিধান আর দেখা যায় না।

ইহসান-পরার্থপরতা, পরোপকার, অন্যের প্রতি সদয় হওয়া। 'আদল ও ইনসাফ সমাজ সংহতিকে বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ইহসান এই সমাজ সংহতিকে আরো মজবুত, ঐক্যময় ও সহযোগিতাময় করে তোলে এবং মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ [milk of human kindness] জন্মায় এবং মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, অন্য দিকে স্বার্থপরতা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন আনয়ন করে।

পারিবারিক ও গোত্রীয় বন্ধন মজবুত করা:

ইসলামী নৈতিক বিধানে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি, সঙ্গী-সাথী, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, চাকর-চাকরানী প্রভৃতির প্রতি সদয় হওয়াও শামিল রয়েছে।[৩৮] কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে যে," পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়া মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ, তার মাতা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করে জন্ম দেন এবং নিজের বুকের দুধ খাইয়ে লালন পালন করেন এবং যোগ্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা নিজেরা অতি দুঃখ-কষ্ট সয়ে তাকে

---

৩৪. আল কুরআন ৪:৫৮

৩৫. আল কুরআন ৪:১৩৫

৩৬. আল কুরআন ৫:৮

৩৭. আল কুরআন,৭:২৯

৩৮. আল কুরআন,৪:৩৬-৩৭

লালন পালন করেন।"[৩৯] এই ইহসান পারিবারিক ও গোত্রীয় সদ্ভাব, সম্প্রীতি, ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করে এবং একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে জীবনটা হয়ে ওঠে সুমধুর; ফলে পারিবারিক ও গোত্রীয় বন্ধন খুবই মজবুত হয় এবং কল্যাণমুখী সমাজ [Welfare society] গঠন করতে সাহায্য করে। ইসলামী নৈতিকতার একটা উদ্দেশ্য হলো-কল্যাণমুখী পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠন করা। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী জীবন দর্শন সৃষ্টি করে প্রকট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, পারিবারিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ এবং পাশ্চাত্যে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ দোযখবাসতুল্য।

পরার্থপরতা:

'ইহসান' পরার্থপরতার বিকাশকারী ও সমৃদ্ধকারী। পরার্থপরতা মানুষের অহংসত্তার উদগ্র কামনা বাসনা ও স্বার্থপরতাকে সংযত করে। বল্গাহীন অহংসত্তা যুগে যুগে বহু সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং কোটি কোটি নর-নারীর মর্মান্তিক দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে। পরার্থপরতা অহংসত্তার ধ্বংস-প্রবৃত্তিকে সংযত করে, তার কর্মশক্তিকে মানব কল্যাণমুখী ও গঠনমুখী করে সুন্দর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

পাশ্চাত্যের 'পযোগবাদ'এবং কুরআনের 'ইহসানবাদ':

পাশ্চাত্যের 'উপযোগবাদ' এবং কুরআনের 'ইহসানবাদ' এ দুটো জীবন-দর্শন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। উপযোগবাদ মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করে এবং মানুষকে পশুর পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। এ হলো অহংসত্ত্বার উৎকট প্রকাশ। পক্ষান্তরে কুরআনের 'ইহসানবাদ' মানুষের জীবন ও মন সুস্থ ফিতরাতের [good qualities] সরল ও স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নতিতে সাহায্য করে। কুরআনী নৈতিকতার উচ্চতম ও বিশুদ্ধতম আদর্শ হলো মানুষকে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করা এবং তা খিলাফত-ই-রব্বানীর দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে।

কুরআন বলে, "আমরা আল্লাহ্র রঙ [ফিতরাত বা প্রকৃতি] গ্রহণ করলাম, রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই 'ইবাদতকারী।[৪০] ইসলামী জীবন দর্শনে 'ইহসান' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কুরআনের একটা তাকীদ হলো-"তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।"[৪১] সুতরাং ইহসান করা প্রত্যেক মানুষের একটা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং 'ইবাদতের অন্তর্গত।

কুরআনের ইহসানবাদ ও পাশ্চাত্যের মানবতাবাদের পার্থক্য:

১. কুরআনের ইহসানবাদ পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। ইহসান করা ইসলামী নৈতিক বিধান তথা জীবন বিধানের একটা অপরিহার্য অংশ; কিন্তু মানবতা পাশ্চাত্য জীবন বিধানের একটা অপরিহার্য অংশ নয়-ঐচ্ছিক মাত্র।

২. ইহসান করা প্রত্যেক মুসলমানের একটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং এর জন্য পাপ-পুণ্যের ভাগী হবে এবং এক প্রসিদ্ধ হাদীস মতে এর জন্য আখিরাতে কৈফিয়ত ও জবাবদিহির প্রশ্নও জড়িত আছে; কিন্তু পাশ্চাত্যে মানবতাবাদে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

---

৩৯. আল কুরআন , ৪৬: ৫১

৪০. আল কুরআন , ২:১৩৮

৪১. আল কুরআন , ২৮:৭৭

কুরআনের ‘ইহসানবাদ’ মেনে চললে সঙ্গী-সাথী, পাড়া-প্রতিবেশি প্রভৃতির সহিত কোন সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। পবিত্র কুরআন মানুষের সকল রকম মানসিক ব্যাধির মহৌষধ। এইভাবে কুরআন মানুষের উভয় সংকট ও সংঘাত নিরসনে পথের দিশা দেখিয়েছে। এই সৎকর্মের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ‘ইবাদত, ইহসান,‘আদল,মানবতার কল্যাণমুখী বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার হিতকর কাজ ও সদুপদেশ, বিপদে আপদে সান্ত্বনা দান, মিষ্টি কথা বলা [৪২] ইত্যাদি সবই এর আওতাভুক্ত এবং এসবই পূণ্যের কাজ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,“যে কেউ ভাল কাজ করবে সে তার দশগুণ পাবে এবং যে মন্দ কাজ করবে তাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।”[৪৩]

সূরা বাকারার ২৬১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৎকাজ একটা শস্য বীজের মত, যা সাতটা শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক শীষে থাকে একশ’ শস্য কণা। অর্থাৎ ভাল কাজের ফল জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। এই সব আয়াতের তাৎপর্য এই যে, সৎ ও ভাল কাজের ফলে ক্রম বিকাশ ও ক্রম বর্ধনের শক্তি আছে এবং অন্যায় কাজ ধক্ষংসাত্মক এবং নিজের সত্তাকেই বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে সৎকাজগুলো গঠনমূলক। কুরআন অনুসারে হিতকরের প্রতিষ্ঠা [survival of the beneficient] হলো সৃষ্টির আবর্তন ও বিবর্তনের একটা উদ্দেশ্য।[৪৪] সূরা বাকারার ২৬৩-২৭১ আয়াতসমূহে দানের নীতি ও ফযীলত সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সৎ কর্মের কঠিন তাকীদই হচ্ছে নৈতিকতার কুরআনী দৃষ্টিকোণে একটা অপরিহার্য উপাদান। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাসবাদের কোন স্থান নেই। দীন ইসলাম হচ্ছে একটা কর্মসূচী এবং সৎ কর্মের কঠোর তাকীদই হচ্ছে এর নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান। এই সৎ কর্মের কর্মসূচীর বাস্তবায়নই ইসলামী জীবন বিধানের প্রাণশক্তি ও চালক শক্তি-যা তাকে জীবন্ত ও গতিময় [dynamic] করে রাখে। এটি একটি সামগ্রিক জৈবিক কর্মসূচী। এই জন্য এর কোন অংশকে অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেয়া চলবে না। বাদ দিলে ইসলামী জীবন বিধানের প্রাণ চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা হ্রাস পেতে থাকবে। ইসলামী জীবন বিধান ও নৈতিকতার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটা আদর্শ ও উন্নত উম্মাহ্ সৃষ্টি করা এবং মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন এবং তার আত্মিক চাহিদার ও বিকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করা-যা তাকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দেবে এবং আখেরাতেও কল্যাণ দেবে।[৪৫]

কুরআন বলে, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কার্যের নিদের্শ দান করো এবং অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং তোমরা ঈমান পোষণ কর আল্লাহ্‌র উপর।” “এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য একটা সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল ও

---

৪২. আল কুরআন, ২:২৬৩
৪৩. আল কুরআন, ৬:১৬০
৪৪. আল কুরআন, ১৩:১৭
৪৫. আল কুরআন, ২:২০১

তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন।” সার কথা হলো যে, নৈতিকতার কুরআনী মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্‌র ফিতরাত ও প্রাকৃতিক আইনের সাথে মানুষের জীবন বিধান [দীন] কে সঙ্গতিপূর্ণ করাও এক সূত্রে গাঁথা। কিন্তু পাশ্চাত্য নৈতিক মতবাদের এই রূপ কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই।

ঈমান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা:

ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের স্থান সর্বপ্রথম। ঈমানকে যদি বীজ সদৃশ ধরা হয় আর ইসলাম হবে সে বীজ থেকে অঙ্কুরিত বৃক্ষ। আর এটাই সত্য যে, বীজ না হলে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্বের কথা ভাবা অসম্ভব, তেমনিভাবে ঈমান ব্যতীত ইসলামের চিন্তা করাও অবাস্তব। যদি ইসলামকে একটা দেহ সংস্থা হিসেবে ভাবা যায়, ঈমান সেখানে তার মধ্যে অবস্থিত প্রাণ সদৃশ। আর প্রাণহীন দেহ মূল্যহীন, চেতনাহীন ও অপদার্থ।[৪৯] তাই ইসলামে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষকে ঈমান গ্রহণের উদাত্ত আহক্ষান জানিয়েছেন। কেননা, ঈমানই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের ভিত্তিস্বরূপ। যেমন বীজ হতেই শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবে ভরপুর বৃক্ষের উৎপত্তি। এজন্যে আল কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ঈমানদারকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “হে ঈমানদার লোকেরা কিংবা হে মানব, যারা ঈমান এনেছো বলে।” তাই ইসলামে পূর্ণ সংশয়মুক্ত, পরিপূর্ণ ঈমান আনা অপরিহার্য। বিন্দুমাত্র সন্দেহহীন, সংশয়মুক্ত ঈমানই ইসলামের দাবি ও কাম্য। আর এ ধরণের সংশয়হীন অন্তরের বিশ্বাস স্থাপনই ইসলামের ঈমান নামে পরিচিত ও অভিহিত।

আর এ ধরণের ঈমান কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালনের মূলে সদাজাগ্রত প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করবে। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে তাই প্রাণশক্তি জাগিয়ে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আল কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না-নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”[৫০]

অতএব, খাঁটি মুমিন ছাড়া সমাজের কারো পক্ষে পুরোপুরি সৎ, নীতিবান ও চরিত্রবান হওয়া সম্ভব নয়। ঈমানই কেবল মানুষের মধ্যে সুন্দর আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও নীতিবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন নিখুঁত খাঁটি ঈমানদারের যেসব গুণাবলি থাকা অপরিহার্য সেসব সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা তিরস্কৃত হবে। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাজসমূহে যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা ফিরদাওসের উত্তরাধিকার লাভ করবে যাতে তারা স্থায়ী হবে।”[৫১]

---

৪৯. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঈমান ও ইসলাম, (ঢাকা: ইফাবা, গবেষণা বিভাগ, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি/২০০৮), পৃ. ৬০-৬৬

৫০. আল কুরআন ২:২০৮

৫১. আল-কুরআন, ২৩: ১-১১।

অতএব, খাঁটি মুমিন ছাড়া সমাজের কারো পক্ষে পুরোপুরি সৎ, নীতিবান ও চরিত্রবান হওয়া সম্ভব নয়। ঈমানই কেবল মানুষের মধ্যে সুন্দর আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও নীতিবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন নিখুঁত খাঁটি ঈমানদারের যেসব গুণাবলি থাকা অপরিহার্য সেসব সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা তিরস্কৃত হবে। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাজসমূহে যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা ফিরদাওসের উত্তরাধিকার লাভ করবে যাতে তারা স্থায়ী হবে।"

তাকওয়া ও নৈতিকতা:

ঈমান ও ইসলামের সাথে তাকওয়ার সম্পর্ক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি ছাড়া খাঁটি ঈমানদার হওয়া দাবি করা অসম্ভব। তাকওয়ার দৃঢ়তা যতবেশি সে লোক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ততবেশি কাছাকাছি। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যার তাকওয়া বেশি সেই আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ।"[৫২] পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।"[৫৩] এখানে হযরত আলী (রা.) এর প্রসিদ্ধ প্রবাদটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "আল্লাহ্-ভীতিই চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[৫৪] তাই তাকওয়ার উপরই নির্ভর করছে নৈতিকতার পূর্ণ গুনার্জন। এর মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব ইহ ও পরকালের সফলতা।

সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আমানতদারিতার ক্ষেত্রে নৈতিকতা: মানুষ, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সুখ-শান্তি, সফলতা এবং পরকালের মুক্তি পেতে চাইলে, তাকে অবশ্যই সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে এবং বাস্তব জীবনে এসবের চর্চা ও অনুশীলন করা অপরিহার্য। মূলতঃ এগুলোই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ। কেননা, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার হওয়া ছাড়া খাঁটি মুমিন হওয়ার আশা পোষণ করা অবাস্তব। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "আল্লাহ্ বলবেন, আজকের দিনে সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত, তারা সেথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটিই মহা সফলতা।"[৫৫]

এ আয়াতে 'ইয়ানফাউস স-দিকীনা ছিদকুহুম' অর্থ্যাৎ, "আজকের দিনে সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে" অংশটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদ্ক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিযব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে যতদূর জানা যায়, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয় কর্মও অন্তর্ভুক্ত।"[৫৬]

---

৫২. আল-কুরআন, ৪৯: ১৩
৫৩. আল-কুরআন, ২: ১৯৪
৫৪. ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ছিদ্দিকী, আরবী প্রবাদ সাহিত্য, সাহাবীদের মাসাল (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় সংস্করণ,মে/২০০৫), পৃ. ২১০
৫৫. আল-কুরআন, ৫:১১৯
৫৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ), মা'আরেফুল কোরআন সংক্ষিপ্ত, (বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, সৌদি আরব, ১৩১৪ হি.) পৃ. ৩৬৫

এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) এর প্রসিদ্ধ প্রবাদটি উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, "সত্যবাদিতায় চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।"[৫৭] তাই সত্যবাদিতার মধ্যে ইহ ও পরকালের সফলতা নিশ্চিত।" মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও সুবিচার কায়েম করা সম্ভব। আর ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও জীবন বিধানের অনিবার্য চরিত্রই হলো 'আদল' বা ন্যায়পরায়ণতাবোধ জাগিয়ে তোলা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম, ও সীমালঙ্ঘন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন-যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনটি বিষয়ের আদেশ রয়েছে, যথাঃ সুবিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অনুগ্রহ করা। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যথাঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দকাজ এবং যুলুম ও উৎপীড়ন। এছাড়া 'আদল' শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।[৫৯]

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিকতাঃ

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন প্রাণি যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে অক্ষম। যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় যত বেশি অগ্রসর, সে জাতি ততবেশি উন্নত। তাই শিক্ষাই শক্তি, যা দ্বারা মানুষ সবকিছুই জানতে পারে, বুঝতে পারে, প্রকৃত অর্থে জ্ঞান শিক্ষার দ্বারাই মানুষ সত্য-মিথ্যা, ঈমান-কুফর-শিরক, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও বৈধাবৈধের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। আবার আমরা দুনিয়ায় চাকচিক্যময় জীবন যাপন করার প্রত্যাশায় আধুনিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতি যতটা সচেতন, পক্ষান্তরে দ্বীনী জ্ঞান তথা কুরআন, হাদীস, ফিক্হ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য ততটা উৎসাহী নই। এ কথা সকল মুসলিম নারী-পুরুষের জেনে রাখা উচিৎ যে, ইসলামে জ্ঞান শিক্ষার ন্যূনতম মাপকাঠি হচ্ছে-দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা; যেমনঃ ঈমান-ইসলাম, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ্ব, জিহাদ, কুফর, শিরক, বিদআত ও হালাল-হারাম ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা ফরয বা আবশ্যক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।"[৬০] আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন–সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।"[৬১]

---

৫৭. ড. আ.ব.ম. ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৫৮. আল-কুরআন ১৬:৯০
৫৯. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৩।
৬০. বায়হাকী, সূত্রঃ মিশকাত।
৬১. আল-কুরআন ,৯৬:১-৫

ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সকল কালের, সকল মানবের জন্য যুগোপযোগি এটি একটি জীবন বিধান। কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষাও তেমনই সুফলদায়ক নয়। কাজেই উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাই বাস্তব শিক্ষা। বৈষয়িক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো উচিৎ। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের সেই লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখেই গড়ে উঠেছে। কেননা, এ শিক্ষার কারিকুলাম-এ কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও তাক্‌ওয়া শিক্ষার সাথে সাথে ইহকালের বৈষয়িক জ্ঞান লাভ ও পরকালের নাজাতের পথ নির্দেশনা রয়েছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। এজন্যে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যেতে পারে। যাতে করে ইসলামের ধর্মীয় বিষয়, আদর্শ ও মূল্যবোধের মুখ্য উপাদানগুলো সম্পর্কে সাধারণ লোকদের সম্যক ধারণা জন্মে। এর কারণ স্পষ্ট, বর্তমান সমাজে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ভাবধারায় আধুনিক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ও অপব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়ায়, ইসলামের সার্বিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের মাঝে মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য ইসলামের কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভ্রান্তকারীরা এ যাবত এর অপব্যাখ্যা দিয়ে আছে অবলীলায়। প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ করে মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার নির্দেশ রয়েছে।[৬২] দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতি হিসেবে আমরা অপারগ। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। প্রধান প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

(ক) নৈতিক শিক্ষা মানুষের বাল্যকালেই শিক্ষা দেয়া উচিত, কিন্তু সেভাবে নৈতিকতার শিক্ষা না থাকায় আজকের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) সঠিক সময়ে সমাজের সকলকে ধর্মীয় শিক্ষা না দেয়া গেলে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং নৈতিকতা ও নীতিবোধও জাগ্রত হতে পারে না।

(গ) ধর্মীয় শিক্ষাকে সংকুচিত করে নৈতিকতার আশা করা যায় না।

(ঘ) সমাজে দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ নৈতিকতা শিক্ষার অভাব। এজন্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগি ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিই দুর্নীতি বিস্তারের বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

(ঙ) ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশে নানা ধরণের দুর্নীতি চলছে, জনসাধারণের সহজ-সরল ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রতারণা, স্বার্থ-সিদ্ধি, অর্থোপার্জন ও জনস্বার্থ বিরোধি সকল কাজই ধর্মীয় দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত।[৬৩] এসব দেখে মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছে। অতএব, সুন্দর মনের মানুষ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করতে চাইলে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ থেকে জাতির উত্তরণ ঘটানো দরকার।

---

৬২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জানু-মার্চ/১৯৯৩, পৃ. ৫০

৬৩. শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ ২০০৪), পৃ. ২৫১

পারিবারিক শিক্ষা ও নৈতিকতা:

ইসলামে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালাই হলো পরিবার। "বস্তুতঃ ইসলামে পরিবার হচ্ছে, গোটা সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে বা জাতীয় জীবনে সঠিক ভূমিকা পালনের মৌলিক শিক্ষা লাভ করা হয় পারিবারিক পরিবেশে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিবেশে সে যে অবদান রাখবে তার প্রশিক্ষণ ঘটে এই ক্ষুদ্রতর অথচ বহুমাত্রিক পরিবেশে।"[৬৪]

বাচ্চাদের মক্তবে যাওয়ার বয়স হওয়া মাত্র সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ শিক্ষা দেয়া উচিত। বাচ্চাদেরকে গান-বাজনা, টিভি, সিনেমা, অশ্লীল উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও নাটক জাতীয় বইপত্র পড়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে শিশুদেরকে বিনোদন ও শরীর চর্চার ও সুযোগ দিতে হবে। কেননা, বৈধ পদ্ধতিতে বিনোদন ও আনন্দ প্রকাশ শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই কুস্তি করেছেন, ঘোড়া চালনাসহ তীর-ধনুক চালনা করেছেন। শিশুরা ভাল কাজ করলে সাবাশ বা ধন্যবাদ দেবে। আর মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করবে। এই ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ বলেন, "স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয।"[৬৫] এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মুমিনগণ, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোযখ থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[৬৬] এই আয়াতে জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেদের রক্ষার সাথে সাথে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিকে রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে 'আহলীকুম' তথা 'তোমাদের পরিবারবর্গ ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। " যার মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকর সবাই অন্তর্ভুক্ত।"[৬৭] অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আপনি নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন।"[৬৮] এই আয়াতে 'আশীরাতা 'শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। আর 'আকরাবীন' শব্দ দ্বারা বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যে নিকটতমদের বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে পরিবারের যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব বেশি, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের পক্ষে সহজ, যখন সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি দ্বীনি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় তখন প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ পালন করা সহজ হয়ে যায়।"[৬৯]

পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক, ভাই-বোনের পারস্পরিক হক ইসলামে নির্ধারিত হয়েছে। এরই আলোকে সন্তানের দৈনন্দিন জীবনের কর্মধারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, "পিতা-মাতা সন্তানকে ভাল আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র দান অপেক্ষা উত্তম

---

৬৪. মাসউলিয়াতু আবিল মুসলিম ফী তারবিয়াতিল ওয়ালেদ, পৃ. ৫৭

৬৫. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৬৬. আল-কুরআন, ৬৬: ৬

৬৭. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮৭

৬৮. আল-কুরআন ২৬:২১৪

৬৯. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৫

কোন দান দিতে পারে না।”[৭০] সুতরাং নীতি-নৈতিকতাবোধ, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা-নম্রতা, দয়া-করুণা, সাক্ষাতে সালাম বিনিময়, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ছোটদের প্রতি স্নেহ, ওস্তাদকে সম্মান করা-এ আচরণগুলো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার জন্যই যেন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মুসলমানদের প্রতি রাসূলের এ মূল্যবান শিক্ষার আহক্ষান ও দাবি এই যে, তারা এমন কাজ করবে না যার কারণে সমাজে মানুষের মর্যাদা হানি ঘটে। অথচ আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিই আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব।

শিক্ষকের মর্যাদা:

শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ও প্রসারে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সম্মানজনক প্রয়োজনীয় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ফলে শিক্ষক সমাজ তাদের মেধা, মনন, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও পূর্ণ মনোযোগকে শিক্ষার কাজেই নিয়োজিত করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষকতার মত সম্মানজনক পেশার প্রতি সমাজে এক ধরণের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ অবশ্যই স্পষ্ট, এ পেশায় আকর্ষণীয় আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কম। অপর দিকে সামাজিক মর্যাদা ও খ্যাতি অর্থ-বিত্তের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায়, সমাজের প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত মেধাবীরা এ পেশায় আসতে নারাজ। এটা সমাজের জন্য কোন শুভ লক্ষণ হতে পারে না। “শিক্ষা একটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলেই দেশের জনগণ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি পাবে এবং দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।”[৭১] ইসলামের দৃষ্টিতে নিজে জ্ঞান শেখা এবং অন্যকে শিক্ষা দান করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, “আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।”[৭২] এই হাদীসে শিক্ষকের মর্যাদা ও স্থান দু’টোই ফুটে উঠেছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ স. আমাদের দ্বীনী ও আধ্যাত্মিক তালিমের শিক্ষক, তাই তার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, “নবী হলেন মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় (ঘনিষ্টতর) এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা হলেন তাদের জননী।”[৭৩] শিক্ষকের মর্যাদা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) দ্বীনের শিক্ষককে সেরা দাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, “তোমরা কি জান সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা কে? এর জবাবে সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, তখন তিনি বললেন, শ্রেষ্ঠতম দাতা আল্লাহ। অতঃপর আদম সন্তানের মধ্যে আমি। আমার পর শ্রেষ্ঠতম দাতা সেই ব্যক্তি যে ধর্মীয় জ্ঞান শিখে সে শিক্ষা অপরের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ইলম শিক্ষার পর তা প্রচারে আত্মনিয়োগ করা। তিনি (শিক্ষক) কিয়ামতের দিন একাই একজন আমির হয়ে আগমন করবেন।”[৭৪]

---

৭০. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ৪২৩

৭১. আব্দুল মাতীন জালালাবাদী, কুরআন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর/২০০১), পৃ. ৪১০

৭২. বায়হাকী, সূত্রঃ মিশকাত।

৭৩. আল-কুরআন, ৩৩:৬।

৭৪. বায়হাকী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ৩৭।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ:

দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য দুর্ভাগ্য যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি ও অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির জন্য এসব দুর্নীতি থেকে উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন। অন্যথায় এই দেশ, সমাজ ও জাতির ধক্ষংস অনিবার্য। এ সব দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১) কিছু কিছু শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রের স্খলন। এমনকি শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণের মত অনৈতিক ঘৃণ্য কাজ আর কী হতে পারে?

২) শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট, টিউশনি ও বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে পাঠদান।

৩) নিয়মিত রুটিন মাফিক ক্লাসে উপস্থিত না থাকা বা ক্লাস ফাঁকি দেয়া।

৪) শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা।

৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ অবৈধভাবে তসরূপ ও আত্মসাৎ করা।

৬) রাজনৈতিক দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য লোকদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান।

৭) ভাল শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।

৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংস্থাগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ।

৯) পরীক্ষায় নকল প্রবণতাসহ ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়ার মত ঘটনা ঘটা।

এ ধরণের “অসংখ্য দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে বর্তমানে দেশের শিক্ষার গুণগত মানের চরম অবনতি হয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠছে না। এ জন্য শিক্ষিত বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশ অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির দিকে এগুতে পারছে না।”[৭৫]

যৌন হয়রানি ও নৈতিকতা:

আর নয় নারীর প্রতি সহিংসতা। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে গ্রাম, শহর, অফিস আদালতে সর্বত্রই যৌন হয়রানি আতংকে মানুষ উৎকণ্ঠিত। যৌন হয়রানি বুঝাতে ইংরেজি ‘ইভটিজিং’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ‘ইভটিজিং’ এর প্রচলিত অর্থ হলো কোন উঠতি বয়সী মেয়েকে উদ্দেশ্য করে কোন বখাটের কটূক্তি, কুপ্রস্তাব, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেখে নেয়া, সর্বনাশ করা ইত্যাদির ভয়ার্ত ঘোষণা আর হুমকি। এরই প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত মেয়েটি নিজেদের পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এ পর্যন্ত দেশে কত মেয়ের জীবনহানি ঘটেছে, কত মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে, আর কত মেয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব।[৭৬]

বর্তমানে যৌন হয়রানি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে আল-কুরআনে নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “মুমিনগণ যেন একে অপরকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর

---

৭৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন/২০০৪), পৃ. ৪১১

৭৬. দেশে যৌন হয়রানি বিরোধী অভিযান চলাকালীন সময়কার পত্র-পত্রিকার ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সচিত্র প্রতিবেদন।

নারীকেও উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।" এ আয়াতে মানুষকে উপহাস করতে নিষেধ করেছে, এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সত্যকে উপেক্ষা করে চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করাই হলো অহংকার। মানুষকে উপহাস ও অবজ্ঞা করা হারাম। আর মুসলমান হয়ে ইসলাম বুঝে একে অপরকে মন্দ ও খারাপ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।[৭৭] এছাড়া অহেতুক ধারণা, অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করাও হারাম।

মহানবী (স.) অশ্লীলতার মূলোৎপাটনে বলেন, "ঈমানদার ব্যক্তি কারো প্রতি ভর্ৎসনা ও লানত করে না এবং সে অশালীন ও অশ্লীল কথাও বলে না।"[৭৮]

ইসলামে অহংকার ও উদ্ধত আচরণ নিষেধ এবং তা নৈতিকতার চরম বিরোধী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাজহারী বলেন, "এর অর্থ তাদের প্রতি অনীহা দেখাবে না এবং অহংকারবশতঃ পাশ কাটিয়ে যাবে না। ইবন আবব্বাস বলেন, "যেমন তোমরা বলে থাক, (তুমি অহংকার করো না। ফলে লোকজন যখন তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।)[৭৯] যৌন হয়রানি এর ভয়াবহতা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চাইলে নিচের উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা উচিৎ।

ক. পারিবারিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অনুশীলনের তাগিদ দেয়া ও বাস্তবায়ন করা।

খ. যৌন হয়রানি বিষয়ক বিদ্যমান আইনের যথাযথ এবং নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা এবং ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম জোরদারকরণ অব্যাহত রাখা।

গ. অভিভাবকদের দায়িত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

ঘ. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষক সমাজের আন্তরিক ভূমিকা রাখা।

ঙ. প্রচার মাধ্যমে যৌন হয়রানি বিষয়ক অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা:

ইসলামে হালাল ব্যবসা বাণিজ্যকে দ্বীনের অংশ হিসেবে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও কমনীয়তাসমূহের খেয়াল রেখে ব্যবসা করলে তার মর্তবা নিয়মিত আবেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্ তায়ালা ব্যবসা-বাণিজ্যকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।" এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ক্রয় বিক্রয় মুবাহ্ এবং হালাল। কেননা, শব্দটি আভিধানিকভাবে

---

৭৭. আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এর তাফসীরে ইবনে কাছীর, অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত (ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশকাল মার্চ/২০০৩) পৃ. ৩৯০-৩৯১

৭৮. ইমাম তিরমিযী, জামেআত তিরমিযী, সূত্র: মিশকাত।

৭৯. আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারী, খ. ৯ (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশকাল/২০০৪) পৃ. ৫৯৫

বোধগম্য ও যুক্তিসঙ্গত একটা অর্থ বোঝানোর জন্য রচিত। আর তা হলো, "উভয় পক্ষের রাজি বা সম্মত হওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তাবনা ও কবুলের মাধ্যমে মালের বদলে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া।"[৮০] কেননা, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সত্যবাদী ও আল্লাহ্‌র পথে জীবন বিসর্জনকারী শহীদের সঙ্গী হবে।"[৮১]

সাধারণত ৪টি পন্থায় বেচা-কেনা সম্পন্ন হতে পারে। যেমন- (১) দাম পরিশোধ করে পণ্য-দ্রব্য কেনা অর্থাৎ দাম এবং পণ্য-দ্রব্য উভয়টিকেই হাতে-হাতে লেনদেন সম্পন্ন করা। (২) আগে জিনিস গ্রহণ করা এবং পরে মূল্য পরিশোধ করা। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে 'ধার' বা নাসিয়া বলা হয়। (৩) আগে দাম দেয়া এবং পরে জিনিস গ্রহণ করা। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে 'বাইয়ে সালাম' বলা হয়। (৪) বিক্রেতা দাম নিল না এবং ক্রেতাও পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করল না অথচ লেনদেনের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল এই ধরণের লেনদেনকে 'বাইয়ুল ক্বালী বিল ক্বালী' বলা হয়। ইসলাম শেষোক্ত পদ্ধতিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। কেননা, এতে জিনিস ও দাম যথাক্রমে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট অজ্ঞাত থেকে যায় এবং পরবর্তী সময়ে ঝগড়া-বিবাদের চরম আশংকা থাকে। বাকি ৩টি পদ্ধতি কিছু সংখ্যক আবশ্যকীয় শর্ত সাপেক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ।"[৮২] কোন অসাধু ব্যবসায়ী উল্লিখিত পদ্ধতি না জেনে অবৈধ ও অধিক মুনাফার প্রলোভনে, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল খাদ্য, ওষুধ ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ করতে না পারে সে দিকে সজাগ নজরদারি প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা, ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবসা করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু।"[৮৩] অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।"[৮৪] তাই ভেজাল, জালিয়াতি ও সকল সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর এই হুকুম আমাদের মেনে চলতেই হবে।"[৮৫] আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মজুতদারি মারাত্মক অপরাধ। "খাদ্য-দ্রব্যের সাথে সর্ব সাধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট।"[৮৬] মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আটকে রেখে অস্বাভাবিকভাবে মুনাফা হাসিল করাকে 'ইহতিকার' বা মজুতদারি বলে। মজুতদারি করলে সমাজে কৃত্রিম সংকট, দুর্ভিক্ষ, অধিকার খর্ব ও অনাচার দেখা দেয়। এ জন্য ইসলামে মজুতদারিকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে এবং অসাধু মজুতদার ব্যবসায়ীকে একজন অভিশপ্ত ও পাপী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৮০. ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-যাসসাস (র.) এর আহকামুল কুরআন, খ. ২, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১) পৃ. ৩৯২

৮১. সুনানু ইবনু মাজাহ্, খ.১ (ভারত: রশিদীয়া কুতুবখানা, দিল্লী) পৃ.১৫৬/তিরমিযী খ. ১, পরিচ্ছেদ: ব্যবসায়ীগণ ও নবী করীম স. এর তাদেরকে এ নামে অভিষিক্ত করা প্রসঙ্গে। পৃ. ২৩০

৮২. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, (ঢাকা: খ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে/২০০৩), পৃ. ৯৩-৯৪

৮৩. আল-কুরআন, ৭:১৫৭

৮৪. আল-কুরআন, ২:৪২

৮৫. ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মা'রূফ, দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, মার্চ/২০১১) পৃ. ৫

৮৬. আল-হিদায়া, খ.৪, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৪), পৃ. ১৮৮

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পণ্য-দ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।"[৮৭] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "কেউ যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে তাহলে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না এবং তার সাথেও আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকে না। অপর হাদীসে তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি শহরের বাইরে থেকে মালামাল খরিদ করে শহরে এনে তা বিক্রি করে, সে রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং গুদামজাতকারী ব্যক্তি হয় অভিশপ্ত।"[৮৮]

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মারুফ এর বক্তব্যটি হুবহু উপস্থাপন করা হলো, "বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, অবৈধ সিন্ডিকেট বা অসৎ ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবসায়িক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হচ্ছে, খাদ্য, ওষুধ, নির্মাণ সামগ্রীসহ নানা ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল ভোগ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা সরকারি-বেসরকারি কোন অফিসে সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন এখন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষায় নকল, ভোটে কারচুপি, দলিল-দস্তাবেজে জালিয়াতি, শিক্ষাকে বাণিজ্য বানানো, অবৈধ দখলদারি, অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, অসামাজিক কাজে উৎসাহিত করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি সকল প্রকার দুর্নীতি ইসলামে হারাম। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বহুবার অন্যের অধিকার নষ্ট করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সহজ ও সঠিক পথ অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। আমরা প্রতি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় বলি, "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"[৮৯]

দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু পদক্ষেপ ও প্রস্তাবনা

দুর্নীতি প্রতিরোধে যুগে যুগে ইসলাম অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় যে সমস্ত পদক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

প্রথমত, প্রতিরোধমূলক।

দ্বিতীয়ত, শাস্তিমূলক।

তৃতীয়ত, বাস্তবভিত্তিক।

প্রথমত, প্রতিরোধমূলক: ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই উত্তম ব্যবস্থা। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, "Prevention is better than cure." অর্থাৎ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়ের চাইতে উত্তম।"[৯০] এজন্যে ইসলামে দুর্নীতি সংঘটনের পূর্বেই তার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে বলা হয়। তেমনি ইসলামের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন তাক্ওয়া বা আল্লাহ্ভীতি এবং আখিরাতের দৃঢ় চেতনা। কারণ পরকালের জবাবদিহিতার ব্যাপারে যে বিশ্বাস রাখে দুর্নীতির সুযোগ থাকলেও সে কখনো এ ধরণের অপকর্ম ও হারাম কাজে লিপ্ত হবে না।

---

৮৭. ইমাম মুসলিম, আল-সহীহ্, খ. ২, পৃ. ৩১; ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ১ দেওবন্দ, মাতবাউ আসাহ্ হিল মাতাবেআ, তা. বি.), পৃ. ১৫২

৮৮. আল-হিদায়া, প্রাগুক্ত, খ. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৫১৩-৫১৬

৮৯. ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মারুফ, দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ-২০১১) পৃ. ৪

৯০. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

ব্যক্তির মন-মানসিকতারয় পরিবর্তন:

যে সংগোপনে দুর্নীতি করুক না কেন, আল্লাহ্ তায়ালা তা দেখছেন। এই চিন্তা-চেতনা থাকা উচিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয়, গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট থেকে লিপিবদ্ধ করে।"[৯১] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা, এটি তোমাদের সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।"[৯২]

আর যারা একমাত্র দুনিয়াবি সুখ-শান্তি, লোভ-লালসা এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধাকে অধিক প্রাধান্য দেয় তাদের এহেন হীন মানসিকতাই তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ পরিত্যাগে বাধ্য করে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার সতর্কবাণী হচ্ছে, "আমি তো বহু জীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[৯৩]

ইবাদতের অনুশীলন:

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৯৪]এ আয়াতে 'ফাহ্শা' শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন-কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দকাজ মনে করে। যেমন: ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। এক কথায় 'ফাহ্শা' এবং মুনকার শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ অন্তর্ভুক্ত।

১. আখিরাতের চেতনাবোধের মাধ্যমে: মানুষ দুনিয়াতে দীর্ঘদিন ভোগ-বিলাসের জন্য দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করে। অথচ এ জীবন অতি সংক্ষিপ্ত এবং আখিরাতই হচেছ অনন্ত জীবন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[৯৫] এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "দুনিয়া মু'মিনদের জন্য জেলখানাস্বরূপ, আর কাফিরদের জন্য স্বর্গ।"[৯৬]

২. হালাল-হারামের উপলব্ধি: ইসলামে হালাল পথে উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং হারাম উপার্জন বর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "অতএব, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক।"[৯৭]

---

৯১. আল-কুরআন ৪৩:৮০।
৯২. আল-কুরআন, ৪৫: ২৯।
৯৩. আল-কুরআন, ৭: ১৭৯
৯৪. আল কুরআন, ২৯:৪৫
৯৫. আল-কুরআন, ৮৭:১৬-১৭
৯৬. ইমাম মুসলিম আস্-সহীহ্, খ. ২, (দেওবন্দ, মাতবাউ আসাহ্ হিল মাতাবেআ, তা. বি.), পৃ. ৪০৭
৯৭. আল-কুরআন, ১৬:১১৪।

৩. নিবর্তনমূলক পদ্ধতির অনুসরণ: সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এর মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের কেউ অন্যায় ও দুর্নীতি সংঘটিত হতে দেখলে সে যেন তা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হলে সে সদুপদেশ বা কথার মাধ্যমে প্রতিবিধান করবে। তাতেও সক্ষম না হলে, সে যেন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ।"[৯৮]

১. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা: আল্লাহ্ তায়ালার হক সংক্রান্ত ব্যাপারে অপরাধের জন্য অপরাধী তাওবা করলে তাঁর শাস্তি প্রদান করা ইসলামের নীতিমালা নয় বরং অপরাধী যদি তাঁর ভুল বুঝতে পারে, অনুশোচনা করে এবং খালিছ নিয়তে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে সে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।[৯৯]

২. উপদেশমূলক ব্যবস্থা: সমাজ থেকে যে কোন দুর্নীতি দূর করার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রথমেই যে পদক্ষেপটি নিতে হবে তা হচ্ছে মানুষকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আপনার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহক্ষান করুন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।"[১০০]

৩. দ্বিতীয়ত, শাস্তিমূলক: সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে উপরে বর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রত্যেকটিই প্রয়োগ করা যায়। এরপরও কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম সেক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বিধা না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন," যারা দেশে সীমালংঘন করেছে এবং তাতে বড় বেশি দুর্নীতি করেছে, তখন তাদের ওপর তোমার প্রভূ শাস্তির কষাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ করছেন।"[১০১] এ আয়াতগুলোর তাৎপর্য: যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল তারা নাফরমানি ও কুফরি করেছিল মিসরে। তাদের অহংকারই তাদের এই অপকর্মের উৎস। তোমার প্রতিপালক (হে মুহাম্মাদ (স.) অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তাদের গতিবিধির উপর এবং সৃষ্টির গতিবিধির উপর।[১০২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মহাপাপসমূহের মধ্যে অতি জঘন্যতম হলো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করা, পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"

তৃতীয়ত, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ: দুর্নীতি বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। দেশ, জাতি ও সমাজকে দুর্নীতির এই ভয়াবহ কবল থেকে উদ্ধার করা না গেলে, ভবিষ্যত অন্ধকার ও ধ্বংস অনিবার্য। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা নিশ্চিত করা গেলে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

১. জনগণের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী চেতনা, মন-মানসিকতা ও ইসলামি নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা। এ জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে লিফলেট, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

---

৯৮. ইমাম মুসলিম আস-সহীহ্, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

৯৯. আব্দুল কাদের আওদাহ্, আত্ তাশরীউল জানাইল ইসলাম, খ. ১, ১ম ভাগ (বৈরূত: মুয়াসসাতুল রিসালাহ্/১৯৯৮), পৃ. ৪৮৯-৫০৫/দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮

১০০. আল-কুরআন, ১৬:১২৫।

১০১. আল-কুরআন, ৮৯:১১-১৪।

১০২. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আবক্ষাস রা., তাফসীর ইবন্ আবক্ষাস, খ. ৩ (শেষ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭১

২. দেশের বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. দুর্নীতিবাজদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধান করা।

৪. দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা।

৫. দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন, পোস্টার ছাপানো, ওয়াজ মাহফিল ও মসজিদে জুমআর খুতবার আলোচনার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৭. যোগ্যকর্মচারী নিয়োগের সাথে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. ব্যবসায়ীদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাকওয়া, নৈতিকতা, সততা, আমানতদারিতা, কল্যাণকামিতা ও সামাজিক মমত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করা। সেই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠোর শাস্তি ও পরিণতির ভীতি অন্তরে লালন করা।

৯. যেহেতু সমাজে ব্যবসার নামে প্রতারণা ও ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যের ছড়াছড়ি চলছে, সেহেতু ব্যবসায়ী ঠিকাদারি লাইসেন্স প্রদানে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। যাতে কোন অসাধু ব্যবসায়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স না পায়। পেলেও কারো বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের বিদ্যমান ভেজাল বিরোধী বিশুদ্ধ খাদ্য সংশোধন আইন/২০০৫ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন /২০০৯ এর বাস্তবায়ন জোরদার করা। ভেজাল নিয়ন্ত্রণে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্থানে সৎ, বিশ্বস্ত, দক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত টিম গঠন করা। গঠিত এই টিমগুলো কর্তৃক যথারীতি মনিটরিং করা গেলে অসাধু ব্যবসায়ি, এর সাথে জড়িত দুষ্টচক্র ও সিন্ডিকেটের অপতৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য।

১১. ভেজাল নিরূপণে সহজপদ্ধতিতে নিরূপণযোগ্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও যন্ত্র আমদানি করে খাদ্যে ভেজাল রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খাদ্য দ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিত রাখার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত প্রস্তাবনা ও সমাজের সকল মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আওতায় আনা গেলে এবং সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ করা হলে দুর্নীতির অভিশাপ হতে রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মুক্তি পাবে।

গ্রন্থপঞ্জী

অনুবাদকবৃন্দ : আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা।

শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আব্দিল্লাহ্ আল-আজীম ওয়াল-হুসাইনী আল-আলুসী : *রূহুল মাআনী*, বৈরূত : দারুত সাদির

অনুবাদকবৃন্দ : আল্লামা ইবনে কাছীর রহ.এর *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত , ঢাকা, ইফাবা, প্রকাশকাল মার্চ/২০০৩

আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী র. : *তাফসীরে মাযহারী*, ঢাকা, ইফাবা প্রকাশকাল/২০০৪

আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাবী : *মা'আলিমুত-তানযীল*, আল-কুরআন : ২৪ :৩০ এর তাফসীর, বৈরূত : দারুল মা'আরেফা, ১৯৮৭

ইমাম কুরতুবী :আল-জামি'লি-আহ্কামিল কুরআন, রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩

ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম আবু বকরআহমদ বিন আলী আল-যাসসাস র. এর : *আহকামুল কুরআন*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১

মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) : মা'আরেফুল কুরআন, (হারামাইন শরীফাঈন বাদশাহ্ ফাহাদ, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প ,হি. ১৪১৩ ।

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ : তাফসীর ফী যীলালিল কুরআন, তা.বি.খ. ১৪।

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৩, খ. পৃ. ১১২-১১৩।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ্ ইবন্ ইসমাঈল আল-বুখারী : *সহীহ্ আল-বুখারী*, কলিকাতা, রশীদ হোসাইন এন্ড সন্স, ১৯৭৩।

ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ : *সহীহ্ মুসলিম*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়া আত্-তুরাস আল-আরাবী

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল আশ : *সুনানি আবি দাউদ*, কিতাবুল আশরিবা, দিল্লী

আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী : *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুল আশরিবা, দিল্লী।

আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন নাসাঈ : *সুনানু নাসাঈ*, কুতুবখানা রশিদিয়্যা, দিল্লী, ১৪১০ হিজরী।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াযীদ আল-কাযউঈনী : *সুনানু ইবনু মাজাহ্*, তাহকীক-মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল : *মুসনাদে আহমাদ*, দারুল হাদীস, মিসর-১৯৯৫।

ইমাম মালিক : *আল-মুয়াত্তা*, মিসরঃ দারু ইহইয়াত্ তুরাছিল আরাবিয়ি।

আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান :*সহীহ্ ইবনে হিব্বান*, বৈরূতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৩।

আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আলী আল-বায়হাকী : *আস্ সুনান আল-কুবরা* , দারুল কুতুবুল ইসলামী, বৈরূত, ১৯৯৩।

আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আলী আল-বায়হাকী : শু*আবুল ঈমান*, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ সায়ীদ যাগলূল, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১০ হি.।

ইমাম অলিউদ্দিন মুহাম্মদ : *মিশকাত আল-মাছাবীহ*, কলকাতা, এম বশির হাসান এন্ড সন্স।

আল- হাকিম : *আল-মুসতাদরাক*।

ইমাম দারু কুতনী : *আস সুনান*।

ইমাম দারেমী : *আস সুনান*, বৈরূত, দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১৪০৭।

ইমাম আব্দুর রাযযাক আস সানআনী : *মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক*, সম্পাদনা : হাবীবুর রহমান আল-আযামী, বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.

ইমাম শাফেয়ী : *কিতাবুল উম্ম*, বৈরূত, দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৩ হি.।

ইবনুল হুমাম : *ফাতহুল কাদীর*, বৈরূত, দারুল ফিক্র।

আলী আল-মুত্তাকী : *কানযুল উম্মাল*, বৈরূত, দারুল মা'আরিফা, ১৪১৫ হি. ।

আবূ আব্দুল্লাহ্ আন-নিশাপুরী : *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সাহিহাইন*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহন।

ইবন হাজার আসকালানী : *ফাতহুল বারী*, রিয়াদ : দারুল ইফতা, ১৪০১ হি. ।

ইমাম আবূ যাকারিয়্যাহ্ মহীউদ্দীন ইবনে শারফ আন নববী : *শারহু সহীহ্ লি মুসলিম।*

সম্পাদনা পরিষদ : ফাতওয়া ই আলমগীরী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৩৬

ইমাম আহমাদ আব্দুল হালীম ইবন্ তাইমিয়া : *মাজমুউল ফাতাওয়া*, (মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হিজরী-১৯৯৫ খ্রি.

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *আল-হিদায়া*, ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৪

ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী :*আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* , দারুল ফিক্র, দামিশ্ক, সিরিয়া, ১৪০৯/১৮৮৯

আব্দুর রহমান আল জাযায়িরী : *কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ্*, বৈরূত , দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্,

ইবনে হিশাম *: সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনুবাদ-আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩

আমর ইবনে হাযম : *আল-মুহাল্লা*, মিসর, আল-জামহুরিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ, ১৯৭০।

আশ-শাহওয়ী : *আল-হিসবাহ্ ফিল ইসলাম*, দারুল উরুবাহ্ প্রকাশনী।

ড. মুস্তফা আস্ সিবায়ী : *আল্- মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুনি*

আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ্ তাববারা :*ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, অনু. মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

আল্লামা তাকী ওছমানী :*তাকমালাতু ফতহিল মুলহিম*, (করাচি : দারুল উলূম, ১৯৯২

আল্লামা্ ইউসুফ আল-কারযাভী : *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪,

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী :*উমদাতুলকারী*, সাহারানপুর, ইউপি : যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০৩

ইমাম যাহাবী : *কিতাবুল কাবাইর*, বৈরূত : আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্

ইমাম মালিক :*আল-মুদাওয়ানাহ*, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ

ইমাম আত-তাবরানী *: আল-মুজামুস সগীর*, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫

ইবনে ইসমাঈল :*ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, ২৩৫ আর্টিকেল, মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল- মিসরিয়্যাহ, আল- কাহেরা : ১৯৬৯

ইবনে রুশদ্ আল-হাফীদ : *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ*, বৈরূত : মা'রিফাহ্, ১৯৭৮ খ্রি.

ইবনুল জাওযী :*যাম্মুল হাওয়া*

ইবনে কুদামা :*আল-মুগনী*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ, ১৪০১ হি

ইবনু নুজায়ম : *আল বাহরুর রা'ইক*

আব্দুল কাদের আওদাহ্ :*আত্ তাশরীউল জানাইল ইসলাম*, বৈরূত: মুয়াসসাতুল রিসালাহ্/১৯৯৮

ড. যাইদ ইবনে আব্দুল করীম : *আল-উফূ আনিল উকূবাতি ফিল ফিকহিল ইসলামী*, রিয়াদ দারুল আসিমাহ্, ১৪১০ হি.,

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী :*কাওকাবুদ দুররী*, ঢাকা: সুফী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ/ডিসে:/২০০৭

ড. আব্দুর রহমান ইবনে মু'আল্লা আল-লুয়াইহিক: *আল-ইরহাব ওয়ালগুল* , জমি'আহ আল - ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল - ইসলামিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৩

আল-ফীরুযাবাদী, : *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪১৩ হি./ ১৯৯১ খ্রি

ইব্রাহীম আহমাদ আল আনসারী আল-ওয়াকাফী : *তিলকা হুদূদাল্লাহ্*, পাকিস্তান : দারুল ইলম, ১৯৮৩ খ্রি.

এ,কে, নাজিবুল হক : *মন ও মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা-১৯৮৯

সুকুমার সাহা : *মাদকদ্রব্য, সমাজ ও আইন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১

আব্দুল মতিন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০, মাদল প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫।

মোঃ আবু তালেব : *ইয়াবা পরিচিতি ও পরিণতি*, ঢাকা-২০০০।

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : *বাংলাদেশে সামাজি সমস্যাঃ স্বরূপ ও সমাধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩

ড. রশীদুল আলম : *নীতিশাস্ত্র পরিচয়*, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, নবম সংস্করণ, ২০০২

ড. আমিনুল ইসলাম : *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

ড. সুধীর কুমার নন্দী : *নীতিবিদ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯১

ড. খলিফা আব্দুল হাকীম : ইসলামী ভাবধারা, অনুবাদঃ আব্দুল হাই, সাইয়েদ, ৩য় সংস্করণ, আল-হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪

ডঃ এস. আবদুল হামিদ, : সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, অনন্যা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০১০

ডঃ রশিদুল আলম, : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া ও ঢাকা, ১৯৮৬

ড. আব্দুল করিম জায়দান : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, (অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯

ড. মুহাম্মাদ শফিকুর : ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা-২০০৪

ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ছিদ্দিকী : আরবী প্রবাদ সাহিত্য, সাহাবীদের মাসাল, ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২য় সংস্করণ,মে/২০০৫

ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন : আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন/২০০৪

ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন : ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ঢাকাঃ খ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মে/২০০৩

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ,ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং

ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী : রাসূল মুহাম্মাদ স. এর সরকার কাঠামো, অনুবাদ-মুহাম্মাদ ইবরাহীম ভূঁইয়া, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দীন : ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মারুফ : দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ-২০১১

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী : কাওকাবুদ দুররী, সুফী প্রকাশন, ঢাকা ,প্রথম প্রকাশ/ডিসে:/২০০৭

শেখ আব্দুল ওয়াহাব : বিংশ শতাব্দির নীতিদর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬

স্যার সৈয়দ আমীর আলী : দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা

আব্দুল মতীন, : দর্শন সাহিত্য সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোছাইন : হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা স. সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, সম্পাদনায়-হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা, ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৮

ড. আব্দুল হাই ঢালী, : মুসলিম দর্শন-১৫।

আ.খ.ম, ইউনূস : মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

শাহ্জাহান, মুহাম্মাদ, : আল-গাযযালীর দর্শন, প্রকাশক, ফারহাত তাসনীম, রাজশাহী

গালিব আহসান খান :বিজ্ঞানের দর্শন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-২০০২

আ. ফ. ম. উবায়দুর রহমান : নীতিবিদ্যা, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এণ্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪

শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, : ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

ফজলুল করীম, : আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭

শেখ আব্দুল ওয়াহাব : বিংশ শতাব্দির নীতিদর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬

এ. এস. এম আব্দুল খালেক : প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, অন্যন্যা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ,২০০৩

শাহেদ আলী সম্পাদিত, : ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট, ১৯৭৬, পৃ. ১৪-১৫

মোঃ ইব্রাহীম খলিল : ইসলামের ভূমিকা, ওরিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ ,ঢাকা।

আল্লামা শিবলী নোমানী : আল-ফারুক,(অনু.মৌঃজাফর আলী খান), ১ম খণ্ড , লাহোর, পাকিস্তান, পৃ.১৬

মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ :তাবাকাত, দারু ইয়াহইয়া আততুরছিল আরবী, বৈরুত,লেবানন,১৯৯৬, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৯৩

ড. আব্দুল করিম জায়দান, : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, (অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ.৮২

হযরত আলী (রা.) :“প্রশাসনের মূলনীতি” (অনু.খালেদ চৌধুরী), ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ.২২

ড. রশীদুল আলম : নীতিশাস্ত্র পরিচয়,মেরিটকেয়ার পাবলিকেশন, ঢাকা,২০১১।

মো. আবদুল ওদুদ : প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, কাজল বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৯।

: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২

গাজী শামসুর রহমান : পারিবারিক আদালত আইন, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা: ১৯৯৮,

আলিমুজ্জামান চৌধুরী : বাংলাদেশে মুসলিম আইন, ইন্টারলাইন পাবলিশার্স, ঢাকা: ১৯৮৫,

কে, আলী : *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৯।

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা) : কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী স., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, খায়রুল প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৬।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস : সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তমন প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯৮।

A Tyler : *Street Drugs*, London-1957

A Huklety : *The doors of perception*, Chatto & Coindus, London, 1954

: *Narcotics Controll Bulletin No. 5*, Department of Narcoties Control, Ministry of Home affairs, Dhaka-1992

Bacher : *The Foundation of Health*, Meredith Publishing Company, New York

B. Klienmuntj : *Essintials of Abnormal Phycology*, Herper & Row Publishers, New York, 1947

R.A.P. A Rogers. : *Short History of Ethics*. Mc Millan and Co. Limited. St. Marthin`s Street . London . 1948.

John S. A Mackenzie,. : *Manual of Ethics*. Oxford University Press.Delhi, 1993

B.S Sanyal. , : *Ethics and Meta Ethics* , Vikas Publications, Delhi, Bombay, Bangalore, 1970,

Lillei William. : *An Introduction to ethics*. Allied Publishers Limited. Indian Edition. Culcuta. New Dilhi Mandras. Reprinted .1990

Abani Mohan Datta : *Problems of ethics*, Chitagong. 1967

Roger, N. Hancock : *Twentieth Century Ethics*, Columbia University Press, New York, 1947

Hilgard, Ernest, R : *Introduction to Phylosophy*, Harcourt, Brance world, Ine., New York, Burlingame, 3rd edition, 1962

Immanuel Kant : *The Fundamental Principles of the Metaphysic*, Zorn's Translation)

Harun Yahya : *The Moral Values of the Qur'an*, Goodword Books, New Dilhi, First Published, 1999, Reprinted-2002

Dr. Abdul Jalil Miah : *Islam and Cosmological Science*, Islamic Foundation Bangladesh, First Edition, Dhaka, 1986

Dr. Syed Abdul Latif : *Principles of Islamic Culture*, Good word Books, New Delhi, First Published 1961, Published by Good Word Books, 2002

Translated (from the Arabic) by Simon Van Den Bergh :*Averroes*, Tahafutal Tahafut, Printed at the University Press, Oxford, Published by Messrs, Luzac and Co London, 1955

Ruqaiyyah Waris Maqsood : *Living Islam: Treading the Path of the Ideal*, Goodword Books, New Delhi, First Published, 1998, Reprinted, 2002

Al Hajj A. D. Ajijola : *Basic Quranic Teaching*, Adam Publishers and Distributors, Delhi, India, First Revised Edition, 1999

H. John Hick :*The Catholic Encyclopedia*, Philosophy of Religion, Prentic Hall of India, Private Limited, New Delhi, Fourth Edition, 1993, p. 56.

Syed Amir Ali : *The Spirit of Islam*, Delhi, 1947, p. 178

William Lille : *An Introduction Ethics*, 3rd edition . London, Metheuen, 1957

Sidgwick : *The Methods of Ethics* ,7th edition, London : Macmillan, 1967

K.A Hakim : *Islamic Ideology*, third edition, 4th impression (Lahore 1980) introduction.

Abul Hashim :*The Creed of Islam*. The Revolationary carrector of Kalima ,IFB,Dhaka,1987

Ramnath Sharma : *Indian Social Problems* (Media Promoters Pvt. Ltd .

: "*Dowry: A survey of the Issues and the Literature In Werner Menski (ed) South Asian and the Dowry Problem* ,Gems no. 6, 1998

Rafiqul Huda Chowdhury and Nulufer Rahman Ahmed :*Female Status in Bangladesh*, BIDS, 1980, p. 26.

Mohammad Iqbal Siddiqi :*Penal law of Islam*, New Delhi, 1988

Asford, Lori S., Carl Haub, Mary M Kent, Nancy V Yinger :*Transmitions in World Population*

:*8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific* (Colombo 19-23 August, 2007,.

Sumaiya Khair :*Juvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review".*

Mostafa Kamal Majumder :*HIV/AIDS-Bangladesh: Bluprint to Avert AIDS Disaster*

Professor Muhammad Qutb :*The Concept of Islamic Education*

Muhammad Qutb, :*Islam-The Misunderstood Religion*, Kuwait International Islamic Federation of Student Organizations. 1401 A. H/1981 A.D.

Hoque, M Enamul : *Under-Aged Prison Inmates in Bangladesh: A Sample Situation of Youthful Offenders in GreaterDhaka,* Dhaka : Action Aid Bangladesh and Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association, 2008

:Encyclopedia Britanica (India) Pvt. Ltd and Impulse Marketing , (Special edition for South Asia, 2005

ইবনে মানযূর : *লিসানুল 'আরাব*, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি/১৪১৩

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান :*বাংলা-ইংরেজি-আরবী অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান *: তিন ভাষায় পকেট অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনা, ২০০১

ডক্টর মুহাম্মাদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত :*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩।

:সংসদ বাঙ্গালা অভিধান কলকাতা : সাহিত্য সংসদ , ১৯৮৭ . পৃ . ৩৩৯

:Benali-English Dictionary, Bangla Academy, Dhaka-2000.

Willian Karry : Dictionary of Bengali Language

A. S Hornby :*Oxford Advanced Learner's Dictionary* of Current English , Oxford University Press, 2000

Ashu Tosh Dev :*Students' Favorite Dictionary*, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986

:Shorter Oxfort English Dictionary, Vol-1, 15th Edition, A-m, New York. Oxford University Press, 1993.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৪

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৩২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জানু-মার্চ/১৯৯৩

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৭, ঢাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২০০৪, ঢাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ২০০০ ইং, ঢাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,মে সংখ্যা, ২০০৪ ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,৩১ সংখ্যা,জুন ১৯৯৮, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,৪২ তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,৬৮ সংখ্যা,জুন ২০০০, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্ত সংখ্যা ঃ ৮৫-৮৬, ২০০৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা : ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮২, জুন ঢাকা ।

মাসিক পৃথিবী, মার্চ- ১৯৯৯, ঢাকা।

মাসিক অগ্রপথিক, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-২০০৭, ঢাকা।

স্মরণিকা-১৯৯৩, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মরণিকা-২০০০, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মরণিকা-১৯৯৬, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সাপ্তাহিক রোববার, সংখ্যা-২১, এপ্রিল-২০০৪, ঢাকা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, মার্চ/২০১১

দৈনিক প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, সংখ্যা-৩৩৬, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা

প্রথম আলো, ২ জানুয়ারী, ২০১২,ঢাকা।

প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি-২০১২, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ২০মে, ২০০৯, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০০৪, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ১লা ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা।

মাসিক পৃথিবী, মার্চ- ১৯৯৯

দৈনিক প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০০৭, ঢাকা।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা।
দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ মার্চ, ২০১০, ঢাকা।
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, ঢাকা।
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ মে,২০১০, ঢাকা।
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১১ মে, খ্রি. ২০১০, ঢাকা।
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ ফেব্রুয়ারি-২০১২, ঢাকা।
দৈনিক জনজণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, ঢাকা।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা : ৩-৮-১৯৯৯ ইং।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা : ৩-৮-১৯৯৯ ইং।
দৈনিক জনজণ্ঠ, ২২ এপ্রিল, ১৯৯৮, ঢাকা।
দৈনিক সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫)
দৈনিক ইনকিলাব, ৯ জানুয়ারী ২০০৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা : ১২-১০-৯৬ ইং
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৩-১০-’৯৬ ইং।
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ০৭-০৮-২০০৮ ইং।
আজকালের খবর, ২ ফেব্রুয়ারি-২০১২, ঢাকা।
দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬, ঢাকা।
The Daily Star, 19 May, 2010.
Journal of the Faculty of Law. The Dhaka University Studies Part-F, Vol. 16 no. 2005
http://www.soundvision.com/info/life/porn/isporn.asp, accessed on 15th March 2012.
http://www.ajkalerkhabarbd.com/pages/details/2012/02/33536
http://www.who.int/whr/2005/en/index.html, accessed : 11 November 2008.
http://www.unfpa.org/about/report/2004/index.html, accessed : 11 November 2008.
http://www.unicef.org/publications.index_27262.html, accessed : 12 November 2008.
www.who.int/whr/2002/index.html Accessed : 13 November 2008.
http://www.icaap8.lk2008 accessed : 12 November
www.fbi.gov/stats-service/publicctions/terrorism-2002-2005